উপজাতি কৃষ্টি ও কৃষি

ড. বিভূতি ভূষণ সরকার

উপজাতি সংস্কৃতি গবেষণা কেন্দ্র
ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা

উপজাতি কৃষ্টি ও কৃষি

UPAJATI KRISHTI O KRISHI

TRIBAL CULTURE AND AGRICULTURE

ড. বিভূতি ভূষণ সরকার,

এম. এস-সি (এগ্রি.), পি- এইচ. ডি. (এগ্রি.)

উপ কৃষি-অধিকর্তা, আমবাসা-৭৯৯২৮৯

ধলাই ◻ ত্রিপুরা

উপজাতি সংস্কৃতি গবেষণা কেন্দ্র

ত্রিপুরা সরকার

আগরতলা

প্রকাশক ঃ
উপজাতি সংস্কৃতি গবেষণা কেন্দ্র
ত্রিপুরা সরকার
অগরতলা

© উপজাতি সংস্কৃতি গবেষণা কেন্দ্র

প্রচ্ছদ ঃ বাবলু মিত্র

কম্পিউটার সেটিং ও প্রিন্টিং ঃ
পারুল প্রকাশনী
১৬ আখাউড়া রোড,
আগরতলা

মূল্য ঃ একশত টাকা মাত্র

ভূমিকা

আদিম কাল থেকেই মানুষ বেচেঁ থাকার জন্য ও সমাজ গঠনের তাগিদে কৃষিকে বেছে নিয়েছিল । আদিম সমাজে এই কৃষি কাজের মধ্যে ছিল বিভিন্ন প্রথা ও বাধ্য বাধকতা যা ছিল পরিবেশগত এবং মনোগত । প্রবাহমান কাল থেকেই উপজাতীয় জীবন ধারায় জুমচাষ জীবন ধারনের মাধ্যমে এবং তার সাথে জড়িত ছিল নাচ, গান, উৎসব ইত্যাদির মতো সংস্কৃতি । জুম চাষের বিভিন্ন পর্যায়ে আছে নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান অর্থাৎ জুমচাষ এবং সংস্কৃতিকে কোন অবস্থাতেই আলাদা করা যায় না উপজাতি জীবনে ।

ডঃ বিভূতি ভূষণ সরকার বর্তমান বই খানিতে ত্রিপুরার বিভিন্ন উপজাতিদের কৃষি পদ্ধতি এবং তার সাথে জড়িত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পর্যালোচনার মাধ্যমে উপজাতিদের জীবন ধারার বিশেষ বিবরণ তুলে ধরেছেন যা ত্রিপুরার উপজাতিদের জীবন যাত্রার বিভিন্ন অজানা তথ্য পাঠক সমাজের কাছে উন্মুক্ত হল ।

আমি আশা রাখি বর্তমান বইখানি সমস্ত পাঠকবর্গ, গবেষণাকর্মী এবং সকল অংশের মানুষের কাছে খুবই আদরণীয় হবে । এই বইখানির জন্য আমরা লেখক ডঃ বিভূতি ভূষণ সরকার মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ।

জে. ডি. ত্রিপুরা
অধিকর্তা,
উপজাতি সাংস্কৃতিক গবেষণা কেন্দ্র
ত্রিপুরা সরকার
আগরতলা, ত্রিপুরা ।

ভূমিকা

বাঁচার প্রয়োজন থেকেই মানব সমাজে কৃষি বিদ্যার জন্ম। সেখান থেকেই সংস্কৃতির মূল বিষয়সহ অন্যান্য অনুষঙ্গগুলো বিভিন্ন পর্যায়ে প্রকাশ লাভ করেছে। ভারতীয় সংস্কৃতির মূল দুটি ধারা হল বৈদিক ও অবৈদিক। বৈজ্ঞানিক ও বস্তুবাদী দর্শন [illegible] মতে অবৈদিক ধারার তন্ত্রবিদ্যার প্রকৃতি বা নারী চেতনা থেকেই কৃষিবিদ্যার উদ্ভব। যেখানে অদৃশ্যের যাদুবিদ্যাকে (Magic) সঙ্গে রেখে মন্ত্রস্তোত্র শ্লোক বা গানের মাধ্যমে সমবেত উৎসব করে প্রকৃতির কাছে প্রার্থনা করেছে ফসল বা সম্পদ লাভের জন্য। সভ্যতার উন্মেষ পর্বে সারা পৃথিবী জুড়ে যেখানে গ্রীক, রোম থেকে শুরু করে মিশর (ইজিপ্ট), ব্যাবিলন, আসিরিয়া, উত্তর বোর্নিও, দক্ষিণ আফ্রিকা, মেক্সিকো, চীন ইত্যাদি দেশের এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের উপজাতি গোষ্ঠীর জীবনচর্চায় উপজাতির প্রবণতা নিয়ে এই যাদুবিদ্যার ব্যবহার হয়েছে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে। বিশিষ্ট মার্কসবাদী প্রাবন্ধিক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'Lokayata' গ্রন্থে এই বিষয়টি [illegible] উল্লেখ করেছেন,—

"The art of cultivation is regarded by all uncivilised peoples as depending in an even higher degree than other operation upon magical pow[ers] and procedures rather than on skill and manual labour.

চ. প্রকৃতির বিবিধ বাধাবিপত্তিকে অতিক্রমণের অভিলাষে এই যাদুবিদ্যার ক্রিয়াকৌশলে আদিম মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে অজ্ঞানতার পরিচয় থাকলেও সেখানে ও অনুভূতির টানাপোড়নে মানসিক শক্তির যোগান নিতে যথেষ্ট সহায়ক ছিল এবং আধুনিক কালেও অঞ্চল ও সম্প্রদায় বিশেষে আজো ইতস্তত অব্যাহত রয়েছে। আর এই যাদু বা তন্ত্রের কৃৎকৌশলের প্রকাশক হিসেবে মন্ত্রতন্ত্রের উচ্চারণ, অঙ্গসঞ্চালন ইত্যাদির মধ্য দিয়েই আজকের নৃত্যগীতের মতো সাংস্কৃতিক উপাদানগুলো জন্ম নিতে পারলো।

"Magic rests on ignorance. But it would be wrong to view it as merie ignorance. For 'it is also a guide to action, though a psychological one." *(Lokayata)*

উপজাতি মানুষের পরিচয় দিতে গিয়ে কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে যে বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন, তা হচ্ছে তাদের Creativity অর্থাৎ সৃষ্টিচেতনা। এই সঙ্ঘবদ্ধতা কোন্ ধর্মীয় চেতনা বা নীতি-নৈতিকতা-মহত্ত্বের জন্যে নয়, তা জীবনের প্রয়োজনে বাস্তবতাকে স্বীকার করে। অথচ, উৎপাদন কুশলতার এই সমষ্টিচেতনাকেই উন্নত বা অগ্রসর শ্রেণী খাটো করে দেখেছে উদ্বৃত্ত ফসল আর বহু জনের শ্রমের উপর কতিপয় মানুষের বাঁচার লক্ষ্যে। কিন্তু উৎপাদন-প্রক্রিয়ার যাদুবিদ্যা বা তান্ত্রিকতাকে বোঝানো হয়েছে কয়েকজন ব্যক্তিমানুষের অলৌকিক বা রহস্যাবৃত ক্ষমতা হিসেবে। আর সেখানেই জন্ম নিয়েছে কুসংস্কার এবং যাদুবিদ্যার বৈপরীত্যে ধর্মচেতনা।

মানুষের যাযাবরের জীবন নিয়ে স্থানান্তরে (Shifting) কৃষিকাজের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর বুকে প্রথম এই বিদ্যার সূচনা হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞগণ এ যাবৎ তদের অভিমত দিয়ে এসেছেন। সময়ের বিচারে যাকে নব্যপ্রস্তর যুগ অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব সাত হাজার বছরের বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ভাষা বা শব্দের ভিন্নতায় অঞ্চল বিশেষে এই আদিম চাষপদ্ধতিকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করতে আমরা দেখি। ত্রিপুরায় জুমচাষ, কক্‌বরক ভাষীদের কাছে 'হুক'। অবশ্য ত্রিপুরার উপজাতিদের মধ্যে 'জুম' শব্দটিও দীর্ঘসময় ধরে পরিচিত ও ব্যবহৃত। ভাষাতত্ত্বের বিচারে কারো কারোর মতে তা সংস্কৃত 'ঝম্প' শব্দের প্রাকৃত রূপ। আসামে তা হচ্ছে 'পোড়ু', অন্ধ্রদেশে, বিহার, ওড়িশা ও মধ্যপ্রদেশ ইত্যাদি রাজ্যে এবং বহির্ভারতে আমাজন-অববাহিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া, দক্ষিণ-পশ্চিম চীন প্রভৃতি দেশে যাকে বলা হয় Fire farming অথবা Slash and burn agriculture বাংলা ভাষান্তরে যাকে বলা যেতে পারে আগুনে পোড়ানো খণ্ডবিন্যস্ত চাষ।

আমাদের দেশে ১৯৭৫ সাল অবধি এই জুমচাষ বা স্থানান্তরে চাষাবাদ নিয়ে গবেষণাসহ এর বিকল্প চিন্তা, অর্থনৈতিক মূল্যায়ন এবং অবস্থানিক পরিসরে তার গুণগত মানোন্নয়ন নিয়ে কোনো উল্লেখনীয় কাজ এখনো হয়নি বলা যায়। পক্ষান্তরে নৃতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থনীতিক বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণই প্রাথমিকভাবে এই কৃষিকাজ নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন। যদিচ তাঁরা একে মাধ্যম করে উপজাতি মানুষের সমাজ-সংস্কৃতির ধারাকে অক্ষুণ্ণ বা অবিঘ্নিত রাখতে এই চাষপদ্ধতিকে সমর্থনই জানিয়ে এসেছেন। বস্তুত ১৯৭৫ সালের পরই ভারতের কৃষি গবেষণা পর্ষদ (ICAR) অর্থাৎ কৃষিবিজ্ঞানীগণ বিশেষত উত্তর পূর্বাঞ্চলে এই বিষয়ে গবেষণা শুরু করেন। আর, এই চাষপদ্ধতিতে মাটির ক্ষয়ক্ষতি, বনায়নে অনাবৃত্তি, প্রকৃতি-পরিবেশের ভারসাম্যে আঘাত, নিম্ন আয় ইত্যাদি বহুবিধ নঞর্থক বিষয় কৃষিজীবীদের এবং অ্যাকাডেমি স্তরে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাছে তুলে ধরার প্রয়াস করেন এবং এর বিকল্প হিসেবে মিশ্রপদ্ধতিতে কৃষি-উদ্যান-বনায়নের মাধ্যমে চারণভূমি (Agrohorti-Silvi Pastoral System) রচনার কথা বলেছেন। কিন্তু প্রযুক্তিগত এই পদ্ধতিকে ত্রিপুরায় আজো বাস্তবায়িত করতে আমরা সমর্থ হইনি।

উত্তর পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য উপজাতি সম্প্রদায়ের মতো ত্রিপুরার প্রধান উনিশটি উপজাতিভুক্ত মানুষের সংস্কৃতিও গড়ে উঠেছে কৃষি অর্থাৎ জুমচাষকে ভিত্তি করে বাঁচার উপকরণের সন্ধানে। ভারতের অন্যান্য রাজ্যে যেমন ওড়িশার জোয়াঙ বা সাওরাস উপজাতি, মধ্যপ্রদেশের ওয়ারলি উপজাতি, গুজরাটের ডুব্‌লা, কোটওয়ালীয়া এবং অন্ধ্র, বিহার, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান ইত্যাদি রাজ্যের বিভিন্ন উপজাতিদের জীবিকা হিসেবে কৃষিকাজ অর্থাৎ এই স্থানান্তরিত চাষাবাদ প্রচলিত থাকলেও তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে উৎপাদিত ফসলের সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক অনুপস্থিত। কেন না এইসব অঞ্চলের উপজাতিরা সামন্ত জমিদারদের অধিকৃত জমিতে কেবলমাত্র মজুরির বিনিময়ে

তাদের ঋতুকালীন বা সাময়িক শ্রম বিক্রি করে জীবনধারণ করে। অন্যসময় কোনো সরকারি অফিসে অথবা রেলস্টেশনে সাফাইয়ের কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকে। জীবিকার এই বিকল্প পথে ধারাবাহিকতা না থাকার সেখানে তাদের সাংস্কৃতিক বিষয়ে তেমন গুরুত্ব পেতে পারেনি।

ভারতের স্বাধীনতালাভের পূর্ববর্তী সময়কালে ত্রিপুরায় পর্যাপ্ত জুমচাষের মধ্য দিয়ে একদা তিল, কার্পাস, রুই ইত্যাদি উৎপাদিত কৃষিপণ্য অন্য রাজ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে রপ্তানি করা হতো। রাজ আমলে প্রকাশিত বিভিন্ন গেজেট ছাড়াও এই বিষয়ে নিয়মাবলি বা বিধিনিষেধ সংক্রান্ত পুস্তিকা আমরা দেখতে পাই। আজ থেকে ১০৮ বছর পূর্ব্বে মহারাজা রাধাকিশোরমাণিক্যের রাজত্বকালে অর্থাৎ ১৩০৪ ত্রিপুরাব্দে (১৩০১ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত একটি পুস্তিকা এখানে উল্লেখযোগ্য। রাজ্যে কৃষকেরা তাদের উৎপাদিত পণ্যের কতোখানি বিক্রি করবে এবং কতোখানি পণ্য রাজ্যের বাইরে যাবে, তার উপর রাজসরকারের নিয়ন্ত্রণ ছিল। আর এই নিয়ন্ত্রিত পণ্যকে বলা হতো 'টাক্নি'। রপ্তানির জন্যে রাজসরকারকে নির্ধারিত হারে রাজস্ব দিতে হতো। যেমন—(ক) তিল প্রতি মণ ১ (এক টাকা পাঁচ আনা) (খ) কার্পাস প্রতি মণ-১ (এক টাকা বারো আনা) (গ) রুই প্রতি মণ ॥ (চার টাকা ছয় আনা)।

কিন্তু অতীতে যেমন আজকের দিনেও উপজাতি সমাজের এক উল্লেখযোগ্য অংশে জুমচাষের গুরুত্ব কমে যায়নি। বিভিন্ন সময়ে এর পক্ষে বিপক্ষে বিচার বিশ্লেষণ 'সত্ত্বেও' সাম্প্রতিক কালে চাষাবাদের উপকরণ ও শস্য নির্বাচন বিষয়ে সীমিত ক্ষেত্রে কিছু সংযোজন ঘটলেও পদ্ধতির মূল ভিত্তি এ যাবৎ অপরিবর্তিতই রয়েছে। বরং শস্যসম্পদের ক্ষেত্রে আজো এমন কিছু অমূল্য উপাদান রয়েছে, যা কৃষিবিদ্যার স্বার্থে কেবল গবেষণার মাধ্যমে চিহ্নিত বা সনাক্তকরণের দাবি রাখে। দৃষ্টান্তস্বরূপ খাদ্যশস্যের শ্রেণীভুক্ত ধান্যজাতীয় শস্য ককবরক ভাষায় যাকে বলা হয় 'মাইক্রোউ' দানাবীজের মধ্যে 'সাবইব্রু' বা 'মামারি' ইত্যাদি গবেষণার পরিকাঠামোর অভাবে আজো লোকচক্ষুর অন্তরালে পড়ে রয়েছে। হয়তো এই দৈন্যে একদিন এই সম্পদগুলো বিলুপ্তই হয়ে যাবে।

স্নেহভাজন ড. বিভূতিভূষণ সরকার তাঁর রচিত 'ত্রিপুরার উপজাতি কৃষ্টি ও কৃষি' গ্রন্থটিতে এই সকল প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলোকেই লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস করেছেন। ত্রিপুরায় উপজাতি অধ্যুষিত প্রত্যন্ত অঞ্চলে তাঁর দীর্ঘ কর্মময় জীবনের অভিজ্ঞতার আন্তরিক প্রতিফলনই বইটির মূল ভিত্তি। উপজাতিদের 'হুক' বা জুমকৃষির অর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের প্রতি বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণ সহ সমস্যা থেকে উত্তরণের প্রস্তাব তিনি গ্রন্থটিতে সন্নিবেশিত করেছেন। শুধু কৃষিজীবিকার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গের কাছেই নয়, রাজ্যের তথা বহির্রাজ্যের কৃষিবিজ্ঞানী, গবেষক, সমাজ সংস্কৃতি কর্মী, ছাত্র-ছাত্রী সকলের কাছেই গ্রন্থটি সমাদৃত হবে বলে আশা করছি।

উজিরবাড়ি, ধবলকৃষ্ণ দেববর্মন।

আগরতলা

ঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ

ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান কেন্দ্র (শিলং), (লেম্বুছড়া)। কৃষি বিভাগ, উদ্যান ও মাটি সংরক্ষণ দপ্তর, উপজাতি কল্যাণ দপ্তর, ডাইরেক্টরেট অব ট্রাইব্যাল রিসার্চ, বন বিভাগ, প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তর, মৎস্য-দপ্তর, পঞ্চায়েত দপ্তর, গ্রামীণ উন্নয়ন দপ্তর, পি. জি. পি. দপ্তর, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর (ত্রিপুরা সরকার) উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ (খুম্‌লৌঙ্গ), আদিবাসী মহিলা সমিতি (আগরতলা), ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় (আগরতলা), কৃষি বিভাগ (পশ্চিমবঙ্গ সরকার), বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (পশ্চিমবঙ্গ)।

মুখবন্ধ

ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ১৯টি উপজাতি যেমন ত্রিপুরী, রিয়াং, নোয়াতিয়া, চাকমা, হালাম, জমাতিয়া, মগ, গারো, লুসাই, কুকি, উচই, মুন্ডা, ওরাং, ভিল, খাসিয়া, সাঁওতাল, লেপচা, ভুটিয়া এবং চাইমল সম্প্রদায় বসবাস করে। প্রাচীন কালে জুমচাষ ছিল উপজাতিদের জীবনজীবিকার প্রধান বৈশিষ্ট্য বর্তমানে ভুটিয়া এবং চাইমল উপজাতি জনগোষ্ঠী জুমচাষ করে না। বাকি ১৭টি উপজাতি জীবন জীবিকার জন্য ত্রিপুরারাজ্যে জুমচাষের সঙ্গে কমবেশি যুক্ত আছে। ত্রিপুরার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী ২১৬৭৭টি উপজাতি জুমিয়া পরিবার বনজ উদ্ভিদ শিকারী জীবন এবং জুম চাষের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। আবার ৩৩৩৭২টি উপজাতি পরিবার সমতল চাষবাস, পশুপালন, মৎস্যচাষ ইত্যাদির সঙ্গে তাদের চিরাচরিত কৃষ্টি রক্ষা করার জন্য আংশিক জুমচাষের ওপর নির্ভরশীল। চিরাচরিত জুমচাষের মাধ্যমে আজ জুমিয়া পরিবারগুলি সচ্ছল জীবন ধারণ করতে পারছে না। জুমের ফলনও বর্তমানে নিম্নমুখী। জুমচাষের বহু কুফল থাকা সত্ত্বেও ভারতবর্ষে জুমচাষ সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না। এর প্রধান কারণ জুম চাষ উপজাতি জুমিয়াদের সামাজিক, আর্থিক এবং কৃষ্টির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। পূর্ব্বের জুমিয়া পুনর্বাসন প্রকল্পে জুমচাষকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে জুমিয়াদের স্থায়ী চাষআবাদে আকৃষ্ট করা ততটা কৃতকার্য হয় নাই। ত্রিপুরায় বসবাসকারী বিভিন্ন উপজাতি সম্প্রদায়- গুলির জুমচাষ বা কৃষিব্যবস্থার মধ্যে সামাজিক, আর্থিক এবং কৃষ্টিগত পার্থক্য বিরাজমান। তাই ত্রিপুরার উপজাতি ভাইদের কৃষ্টি ও কৃষির বিভিন্ন তথ্য সংযোজন করে উপজাতি কৃষিব্যবস্থার অতীত ও বর্তমান সমস্যা এবং ভবিষ্যৎ উপজাতি কৃষি- ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে ত্রিপুরার উপজাতি কৃষ্টি ও কৃষিব্যবস্থার প্রতি আলোকপাত করার চেষ্টা করছি।

আজ থেকে প্রায় ন হাজার বছর আগে মানুষ যখন প্রথম কৃষি কাজ শুরু করে তখন থেকেই জুম চাষ বা স্থান পরিবর্তিত যাযাবর চাষ অর্থাৎ বনজঙ্গল কাটা এবং পোড়ানো পদ্ধতি অনুসরণ করে ফসল উৎপাদন শুরু করেছিল। ত্রিপুরার প্রত্যন্ত অঞ্চলে উপজাতি জনগোষ্ঠী বিশেষ করে ত্রিপুরী, রিয়াং, নোয়াতিয়া, জমাতিয়া, কুকি, হালাম, চাকমা, মগ, গারো, লুসাই উচইদের মধ্যে আজও জুমচাষ পরিলক্ষিত হয়। জুম কৃষির সঙ্গে ত্রিপুরার জুমিয়া উপজাতি গোষ্ঠীগুলির নাচ, গান, বিভিন্ন সামাজিক আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মোটকথা জুম কৃষিব্যবস্থা আজও প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী ত্রিপুরার উপজাতি সম্প্রদায়গুলির সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু। জুম চাষের বহু কুফল থাকা সত্ত্বেও কৃষ্টি এবং আর্থসামাজিক কারণে জুমিয়া কৃষক ভাইয়েরা এই মুহূর্তে জুম কৃষি ছাড়তে নারাজ। তাই জুমিয়া উপজাতি জুমচাষ না করে নির্দিষ্ট স্থানে স্থায়িভাবে বসবাস এবং উন্নত জুম-সহ টেকসই কৃষিজ, উদ্যান, বাগিচা ফসল,

যৌথ বনায়ন ব্যবস্থাপনা, পশুপালন, মৎস্যচাষ, রেশমচাষ, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প ইত্যাদির সুসংহত সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে উপজাতি কৃষ্টি ও কৃষিবিষয়ক বইটির উপস্থাপনা।

এই পুস্তক রচনায় উৎসাহদান এবং বিভিন্নভাবে সাহায্য করার জন্য আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ বিশিষ্ট লেখক ও সমাজসেবী শ্রীধবলকৃষ্ণ দেববর্মা, প্রাক্তন কৃষি অধিকর্তা, শ্রীসঞ্জীবকৃষ্ণ দেববর্মা, বনদপ্তরের শ্রীরোক্ষিম লিয়ানা লুসাই, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের শ্রী নিরঞ্জন চাকমা, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. মহাদেব চক্রবর্তী, শ্রীহারাধন মল্ল, ড. জগদীশ গণচৌধুরী, ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান কেন্দ্রের ড. আর কে. ধিমান, উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদের শ্রী বিধুভূষণ দেববর্মা, পশ্চিমবঙ্গের কৃষি বিভাগের কৃষি অধিকর্তা এবং পদাধিকার বলে সচিব ড. নিত্যানন্দ ত্রিবেদী, বিধানচন্দ্র কৃষিবিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. অসিত বোস, ড. তপন মাইতি, ত্রিপুরার কৃষিবিভাগের সর্বশ্রী রিজামোহন বংশী, বাবুল মগ, নমজ্যোত চাকমা, শ্রীনাথ বৈদ্য, অলোক ধর, সুভাষ সাংমা, রমেশ দেববর্মা, বাঁশিরাম রিয়াং, ট্রাইব্যাল রিসার্চ-এর অধিকর্তা শ্রীভগীরথ রিয়াং, শ্রীরতন কুমার আচার্য, শ্রীবিদ্যুৎকান্তি ধর, শ্রীঅমরেন্দ্র দেববর্মা, শ্রী অরুণদেববর্মা প্রমুখ মহোদয় গণের নিকট।

এ ছাড়া, যে-সকল হিতাকাঙ্ক্ষী জুমিয়া কৃষক ভাই বন্ধু-বান্ধব এবং সহকর্মীদের নিকট থেকে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ সাহায্য পেয়েছি তাঁদের সকলের নিকট আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

ড. বিভূতিভূষণ সরকার
ধলেশ্বর রোড নং-৫
পোঃ ধলেশ্বর - ৭৯৯০০৭
আগরতলা, ত্রিপুরা।

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
১।	ত্রিপুরী	১
২।	রিয়াং	১৫
৩।	জমাতিয়া	২৯
৪।	চাকমা	৪৩
৫।	হালাম	৫৩
৬।	মগ	৬০
৭।	গারো	৬৮
৮।	নোয়াতিয়া	৮৬
৯।	কুকি	৯৬
১০।	লুসাই	১০১
১১।	উচই	১০৮
১২।	ত্রিপুরার রাজার আমলে উপজাতি কৃষি ...	১১৬
১৩।	জুম চাষের সমস্যা	১২০
১৪।	জুমিয়া পরিকল্পনা প্রণয়ন	১২৯
১৫।	জুমিয়া প্রকল্প বাস্তবায়ন	১৩৬
১৬।	জুমিয়া প্রকল্পের অর্থনীতি	১৪৯

❑ **প্রথম অধ্যায়**

ত্রিপুরী

উত্তর-পূর্ব ভারতে অবস্থিত রাজ্যের মধ্যে আয়তনে ত্রিপুরা রাজ্য দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম। আয়তন মাত্র ১০,৪৯১·৬৯ বর্গকিলোমিটার। ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯টি উপজাতি জনগোষ্ঠী দেখা গেলেও ত্রিপুরা উপজাতি জনসম্প্রদায় সবচেয়ে বড় এবং সংখ্যায় বেশি। পৌরাণিক কাহিনী, লৌকিক উপাখ্যান ইত্যাদি অনুসারে ত্রিপুরীদের আদিস্থান এবং ত্রিপুরা রাজ্য সম্পর্কে নানা গল্প, মতবাদ থাকলেও প্রকৃত রহস্য আজও জানা যায়নি। "ত্রিপুরা" বা তিপ্রা অথবা তিপ্‌রা উপজাতির আদিস্থান সম্ভবত বড়োদের আদিস্থান মধ্য এশিয়া। সেখান থেকে ভারতবর্ষের বর্তমান এলাহাবাদের সন্নিকটে কোনো স্থানে প্রথম বসতি স্থাপন করে। তিপ্রা শব্দ 'তুই' = জল, ফ্ল = ফা = দেবী থেকে সম্ভবত সৃষ্ট। তাই ত্রিপুরা উপজাতি গোষ্ঠী গঙ্গার সন্তান বলে দাবিদার। সমুদ্রগুপ্তের সময়ে অর্থাৎ খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে ত্রিপুরা রাজ্যের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐ সময়ের শিলা উৎকীর্ণ লিপিতে দেখা যায়, তৎকালে ভারতবর্ষে ত্রিপুরা রাজ্যের খ্যাতি ও যশ ছিল। ঐ সময়ে ত্রিপুরায় উপজাতি রাজা রাজত্ব করতেন এবং তাঁদের ভারতীয় ক্ষত্রিয়বর্ণের মধ্যে গণ্য করা হত।

অন্য মতবাদ অনুসারে ত্রিপুরা রাজ্য হল "শিবরাজ্য" বা মহাদেবের রাজ্য, মহাদেবের অন্য নাম "ত্রিপুরারি" অথবা " ত্রিপুরেশ"। যে-সকল লোক শিবরাজ্যে বসবাস করত, তাদেরকে "ত্রিপুরী" এবং রাজ্যকে "ত্রিপুরা" বলা হত। কোনো কোনো ঐতিহাসিকদের মতে "ত্রিপুরা" শব্দের উৎপত্তি মাতা ত্রিপুরেশ্বরী বা ত্রিপুরাসুন্দরী থেকে। হান্টার সাহেবও এমন মতবাদ পোষণ করেছেন যে "ত্রিপুরা" নাম উদয়পুরের পবিত্র মন্দির, যা এখনও বিদ্যমান, তা থেকে এসেছে। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যায়, মহারাজ ধন্যমাণিক্য ১৫০১ সালে কার্তিক অমাবস্যা তিথিতে আরাকানের রসাঙ্গ থেকে নিয়ে আসা দেবীকে শ্রীশ্রী ত্রিপুরেশ্বরী নামকরণ করে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের অস্তিত্ব তার আগে থেকেই ছিল। তাই অন্যভাবে বলা যায়, ত্রিপুরা রাজ্যের নাম থেকে অধিষ্ঠিত দেবীর নাম ত্রিপুরেশ্বরী বা ত্রিপুরাসুন্দরী হয়েছে।

ত্রিপুরা ভাষায় "তুই" অর্থ জল এবং "প্রা" অর্থ নিকটে। এককালে ত্রিপুরারাজ্যের সীমানা গারো পাহাড় থেকে আরাকান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অর্থাৎ ত্রিপুরা রাজ্যের পাশেই ছিল বঙ্গোপসাগর। তাই জলের ধারে যে রাজ্য ছিল তাকে "ত্রিপুরা" বলা হত। এমনও শোনা যায় প্রাচীনকালে দ্রুহ্যু নামে এক রাজা কিরাতদেশে রাজ্য স্থাপন করেন। দ্রুহ্যুর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র "দৈত্য" কিরাত দেশের রাজা হন। মহারাজ দৈত্যের এক পুত্রের নাম ছিল "ত্রিপুর"। ত্রিপুররাজ ছিলেন অত্যাচারী, বীর যোদ্ধা। ফলে পার্বত্য অঞ্চলের অনেক রাজাকে পরাজিত করে বিশাল রাজ্য বিস্তার করেন। এক সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যের পরিধি ছিল সমগ্র কুকি রাজ্য, মণিপুর, কাছাড়, সমগ্র

লুসাই অঞ্চল এবং বাংলাদেশের শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম এবং নোয়াখালী অঞ্চল। অর্থাৎ এককালে ত্রিপুরা রাজ্যের সীমানা ব্রহ্মদেশ থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মহারাজ ত্রিপুর কিরাত রাজ্যের নাম পরিবর্তন করে নিজের নামে রাজ্যের নামকরণ করেন "ত্রিপুরা"।

মহারাজ ত্রিপুর নিরীহ প্রজাদের ওপর ভীষণ অত্যাচার করতেন। ফলে, প্রজারা দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনা করে অত্যাচারের অবসান কামনা করলেন। শোনা যায় শিবঠাকুর প্রজাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে ত্রিপুররাজকে ত্রিশূলের দ্বারা সংহার করেন। ঐ সময়ে ত্রিপুরের মহারাণী হীরাবতী ছিল নিঃসন্তান, তাই মহাদেবের প্রসাদে রাণী পুত্রবতী হলেন। পুত্রের নাম "ত্রিলোচন"। ত্রিপুরার মহারাজারা ছিলেন "চন্দ্রবংশ" জাত। কিন্তু মহাদেবের বংশজাত হওয়ায় চন্দ্র ধ্বজার সঙ্গে ত্রিশূল ধ্বজাও বহন করেছিল। মহাদেব রাজবংশের কুলদেবতা রূপে চতুর্দশ দেবতা বা চৌদ্দদেবতার পূজার বিধান দেন। এই চৌদ্দ দেবতা হল—হর, উমা, হরি, মা (লক্ষ্মী), বাণী (সরস্বতী), কুমার (কার্তিক), গণেশ, ব্রহ্মা, পৃথিবী, সমুদ্র, গঙ্গা, অগ্নি, কামদেব ও হিমালয়। এই চৌদ্দদেবতার পূজা ত্রিপুরারাজ্যে খার্চি পূজা রূপে প্রতি বছর পুরাতন আগরতলায় সম্পাদন করা হয়।

ত্রিপুরার ১০১ তম রাজা কুমার ছিলেন ধর্মপ্রাণ এবং শিবভক্ত। কুমার রাজ একবার তীর্থযাত্রায় বের হয়ে ছামবলে রাত্রি যাপনের সময় দেবাদিদেব মহাদেবের দর্শন লাভ করেন। পরবর্তী সময় ছামবলে (বর্তমান কৈলাশহর) এর মনু নদীর পাড়ে রাজধানী স্থাপন করেন। অন্যদিকে উত্তর ত্রিপুরা জেলার কৈলাশহর মহকুমায় ঊনকোটি তীর্থ অবস্থিত। প্রাচীনকালে কাশীকে বলা হত কোটিতীর্থ। রূপকথার বর্ণনা অনুসারে দেবাদিদেব মহাদেব স্বর্গের এককোটি দেবদেবীকে সঙ্গে নিয়ে কাশীর উদ্দেশ্যে রওনা হন। বর্তমান ঊনকোটি পাহাড়ে এসে সব দেবদেবী পৌঁছানোর পর রাত হয়ে যায়। তাই স্থির হয়, ঊনকোটি পাহাড়ে রাত্রি যাপন করে পরদিন প্রত্যূষে কাশীর উদ্দেশে যাত্রা করবেন। কিন্তু পরদিন ভোরে শিব ঠাকুর ব্যতীত সকল দেবদেবীর নিদ্রা ভঙ্গ না হওয়ায় মহাদেব একা কাশী চলে যান। বাকি ঊনকোটি দেবদেবী ঊনকোটি পাহাড়ে পাষাণ হয়ে যান। মহর্ষি কপিলদেব ঊনকোটি পাহাড়ে এসে তপস্যা করেছিলেন এমন কিংবদন্তীও প্রচলিত আছে।

তারপর ঐ স্থানে দীর্ঘদিন বহু রাজা পরপর শান্তিপূর্ণভাবে রাজত্ব করেন। কিন্তু ৪৯০ সনে রাজা "প্রতীত" এবং এক পাহাড়ী যুবতীকে কেন্দ্র করে কাছাড়ী রাজ্যের সঙ্গে ঝগড়া হয় এবং রাজধানী কৈলাশহর থেকে ধর্মনগরে জুরীনদীর পাড়ে স্থানান্তর করা হয়। রাজা জুজারুফা ৫৯০ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসেন এবং রাজধানী প্রথম রাঙ্গামাটি (বর্তমান উদয়পুর) এবং পরে বিশালগড়ে স্থাপন করেন। জুজারুফা প্রথম "ত্রিপুরাব্দ" প্রবর্তন করেন। জুজারুফা যে সনে প্রথম রাজ সিংহাসনে বসেন অর্থাৎ, ইংরেজী ৫৯০ সন থেকে ত্রিপুরাব্দ শুরু হয়।

আবার এমনও শোনা যায় ত্রিপুরী এবং কাছাড়ী উপজাতি জনগোষ্ঠী একই উৎস থেকে সৃষ্টি। কারণ, ত্রিপুরী এবং কাছাড়ী উপজাতির রীতিনীতি, ধর্ম এবং চেহারার মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়। ত্রিপুরার প্রাচীন রাজমালার মধ্যে এমন তথ্য পাওয়া যায় যে ত্রিপুরী এবং কাছাড়ীদের মধ্যে যোগসূত্র ছিল। আবার ত্রিপুরীরা বড়ো সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত এবং উত্তরবঙ্গ, কোচবিহার, আসাম এবং পার্বত্য ত্রিপুরায় বসবাস করতো এমনও মতবাদ আছে। বড়ো উপজাতি জনগোষ্ঠী, যারা ত্রিপুরায় এবং আসামের দক্ষিণ সীমান্তে বসবাস করে তাদেরকে ত্রিপুরী বলা হত। ড. সুনীতি কুমার চ্যাটার্জি ত্রিপুরার উপজাতিদের ইন্দো মঙ্গোলীয়ান অথবা কিরাত গ্রুপে শ্রেণীবদ্ধ করেন। কিন্তু ভাষাগত দিক পর্যালোচনায় তারা বড়োদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ত্রিপুরার রাজাদের সঙ্গে তখন বড়োদের বিবাহ অনুষ্ঠানও প্রচলিত ছিল। ত্রিপুরার রাজা কিরাত রাজকে পরাজিত করে কিরাত দেশ (বর্তমান আসাম) পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। ত্রিপুরীদের উৎস সম্পর্কে এমন মতবাদও প্রচলিত আছে যে তিপ্‌রা তিব্বত নামী থেকে এসেছে, তিপরা এবং বড়ো উভয় সম্প্রদায় একই উৎস থেকে সৃষ্টি হয়েছে। ত্রিপুরী এবং বড়োদের ভাষাগত দিকে কতকগুলি সামঞ্জস্য আজও পরিলক্ষিত হয়। তাই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে বড়ো, কাছাড়ী এবং ত্রিপুরার আদিপুরুষ অর্থাৎ উৎস একই ছিল কিন্তু প্রাচীন কালে যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে তাদের মধ্যে কিছু কিছু সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ভাষাগত পার্থক্য গড়ে উঠে এবং আলাদা উপজাতি হিসাবে পরিচিতি লাভ করে।

ত্রিপুরারাজ্যে ত্রিপুরীদের প্রধান জনবসতি পরিলক্ষিত হয় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সদর, বিশালগড় এবং খোয়াই মহকুমায়। ধলাই জেলার কমলপুর এবং গন্ডাছড়া মহকুমায়, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনীয়া, উদয়পুর অমরপুর ও সাব্রুম মহকুমায় বিক্ষিপ্তভাবে বসবাস করে। ত্রিপুরী উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে পুরাতন ত্রিপুরা, ত্রিপুরী দেবলস্কর্মণ, দেববর্মা ইত্যাদি পদবী পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া 'ঠাকুর' এবং 'কর্তা' উপাধি ও পুরাতন ত্রিপুরী গোষ্ঠীর অন্তর্গত এবং রাজপরিবারের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্যমান্য হয়।

ত্রিপুরী উপজাতিদের বিবাহ বর কনের অভিভাবকদের আলাপ আলোচনার মাধ্যমে স্থির হয়। বিয়ের আলাপ বর অথবা কনেপক্ষ ঘটকের মাধ্যমে পাঠায়। বর অথবা কনের পছন্দকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় না। পাত্রী নির্বাচনের জন্য মেয়ের গুণপনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল তুলোর বীজ আলাদা করা, সুতো কাটা, কাপড় বুনা ইত্যাদি। এ ছাড়া মেয়ের স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য এবং সাংসারিক কাজের নিপুণতা ইত্যাদিও বিচার্য বিষয়। অন্য দিকে ছেলের স্বভাব, চরিত্র, স্বাস্থ্য, বাঁশ বেতের কাজ ও সাংসারিক কাজ কর্মের নিপুণতা প্রধান বিচার্য হয়। ত্রিপুরী উপজাতি জুমিয়া মহিলাদের পড়নের পাছড়া (রিগনাই) এবং বক্ষাবরণী (রিসা) নিজেদের হস্তচালিত কোমর তাঁতের (থানতি) দ্বারা নিজেরাই প্রস্তুত করে থাকে। তাই তাঁত শিল্পে জ্ঞান থাকা মেয়ের বিয়ের জন্য

অত্যাবশ্যকীয় গুণ। জুমিয়া পরিবারে মেয়েদের ছোট বেলা থেকে জুমে উৎপাদিত তুলোর দ্বারা সুতো তৈরি করা এবং কোমর তাঁতের দ্বারা কাপড় তৈরির বিশেষ প্রশিক্ষণ বয়স্ক মহিলারা দিয়ে থাকেন। মোট কথা, যে জুমিয়া মেয়ে কাপড় বুনতে পারে না, তাদেরকে বলে "পংগি"। পংগি মেয়েদের বিয়ের বাজার ভাল হয় না।

প্রাচীনকাল থেকে ত্রিপুরী উপজাতিদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার বিবাহ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। বর্তমানেও প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী জুমিয়া পরিবারগুলি চিরাচরিত কাজের বিনিময়ে বিবাহ পদ্ধতি অনুসরণ করে।

এই বিবাহ পদ্ধতি অনুসারে ভাবী বরকে ভাবী কনের বাড়িতে গিয়ে বিয়ের আগে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কাজ করতে হয়। কাজের সময় সীমা সাধারণত কনেপক্ষ ঠিক করে দেয়। এই সময় সীমা এক বছর থেকে তিন বছর এমনকি তারও অধিক হতে পারে। তবে আজকাল স্বল্পমেয়াদী কাজের বিনিময়ে বিবাহ অর্থাৎ এক মাস থেকে পনের মাসের কাছাকাছি স্থির করা হয়। আবার ঘর জামাই পদ্ধতিতে বর চিরতরে তার নিজ বাড়ি ত্যাগ করে সারাজীবন শ্বশুরবাড়িতে বসবাস করে।

ত্রিপুরী উপজাতি সম্প্রদায়ের কাজের বিনিময়ে বিবাহ পদ্ধতির রীতি অনুসারে বিয়ের ঘটক (রাইবা) বর এবং কনেপক্ষের মধ্যে যোগাযোগ করে বিয়ের পূর্ব শর্তগুলি যেমন কাজে যোগ দেওয়ার তারিখ ইত্যাদি ঠিক করে। ভাবীবরকে ভাবী শ্বশুর বাড়িতে কাজে যোগ দেওয়ার দিন, ত্রিপুরী ধুতি (রাবরক) এবং সার্ট (কামচুলুই) পড়িয়ে সাজানো হয়। ভাবীবর সঙ্গে একটি গামছা (রিটুকু), একটি দা (তাক্কাল), বিছানাপত্র, ভাতখাওয়ার জন্য একটি থালা, লোটা, গেঞ্জি, আন্ডারওয়ার, হুক্কা ইত্যাদি নিত্য নিজ ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে কয়েকজন বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে ভাবীশ্বশুর বাড়িতে আসে। প্রথমে ভাবীশ্বশুরবাড়ির পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগত জানান হয়। পরের দিন ভাবীবর তার সহযোগীদের নিয়ে ভাবীশ্বশুরের বড় ঘরের মধ্যে বাঁশের বেড়া দিয়ে তার থাকার জন্য একটি কোঠা তৈরি করে। ঐ কোঠার মধ্যে শোয়ার জন্য বাঁশের একটি মাচা (সপাং) এবং কাপড়চোপড় রাখার জন্য বাঁশের টানা ইত্যাদি তৈরি করে বসবাসের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে নেয়। ভাবীশ্বশুর বাড়িতে ভাবি-বরের থাকার ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করে বন্ধু বান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনেরা নিজ বাড়িতে চলে আসে এবং ভাবীবর ঐ দিন থেকে ভাবী শ্বশুরবাড়িতে কাজ শুরু করে। ভাবী শ্বশুর বাড়ীতে বরকে দিয়ে সব ধরণের কাজ করানো হয় যেমন। জলতোলা, জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করা, গৃহপালিত পশুপাখির যত্ন পরিচর্যা, বাড়িঘর পরিষ্কার করা, জুমের জঙ্গল কাটা, বনজঙ্গল শুকানো, শুকনো বন-জঙ্গল পোড়ানো, বীজ বপন, আগাছা নিয়ন্ত্রণ, ফসল তোলা, এবং অন্যান্য কাজ যা সময়ে সময়ে করা প্রয়োজন হয় ইত্যাদি। এই বরকে ত্রিপুরী ভাষায় বলে "চামারী"। চামারীর কাজকর্ম, চালচলন, আচার-ব্যবহার

ইত্যাদি ভাবীকনে এবং শ্বশুরবাড়ির লোকজনেরা লক্ষ্য করে। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন কাজের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা এবং সামাজিক বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত ভাবীবর-কনের সঙ্গে কাজ করার সুবাদে মেলামেশার সুযোগ পেলেও একসঙ্গে নিরিবিলি স্থানে গল্পগুজব করার বা নিবিড় মেলামেশার সুযোগ, দিনে কিংবা রাত্রিতে দেওয়া হয় না।

কাজের সময়সীমা যদি ভাবী শ্বশুরবাড়ীর লোকজন এবং কনের সন্তুষ্টির মাধ্যমে অতিক্রম করতে ভাবীবর সক্ষম হয় তবে বরপক্ষ এবং কনেপক্ষ বিয়ের কথাবার্তা চালায়। প্রথমে বরপক্ষ কনের বাড়িতে যায় এবং বিয়ের কথাবার্তা বলে। এইক্ষেত্রেও ত্রিপুরী উপজাতিদের কতকগুলি সংস্কার আছে। যেমন, কনে অথবা বর অথবা বর-কনের পিতা-মাতা যাত্রার আগেরদিন রাত্রে যদি কচ্ছপ, হরিণ ইত্যাদি স্বপ্নে দেখে অথবা যাওয়ার সময় ভেড়া, ছাগল, বাছুর ইত্যাদির ডাক শোনে অথবা মৃতদেহ দেখে, তবে বিয়ের কথা বলার জন্য ঐ দিনের যাত্রা বাতিল করা হয়, বিয়ের পাকা কথা বলার জন্য বরপক্ষ ঘটককে সঙ্গে নিয়ে কনের বাড়িতে আসে। কনের পিতার পক্ষ থেকে কনে এবং বরের নামে দু'টি দেশী মদের পাত্র রাখা হয় দু'টি মাটির প্রদীপ জ্বালানো হয়। তারপর বিয়ের পাকা কথাবার্তা শুরু হয়। প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী ত্রিপুরী উপজাতি সম্প্রদায়ের কনের পিতা সাধারণত বরের পিতার কাছে কিছু পণ দাবী করে। যদি দাবী পূরণের শর্ত বরের পিতা কবুল করেন, তবেই পাকা বিয়ের কথা অগ্রসর হয়। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, পণ হিসাবে কনের পিতা যে টাকার দাবী করে তা বরের পিতার আর্থিক সঙ্গতির সঙ্গে মিলিয়ে করা হয়। যেমন কনের পিতা একশ এক টাকা, একটি শূকর এবং একান্ন বোতল মদ ইত্যাদি বিয়ের পণ হিসাবে দাবী করতে পারেন। দুই পক্ষ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বরের পণ স্থির করে এবং বিয়ের কথা পাকা করে। বিয়ের কথা পাকা হলে ভাবীকনে এসে উভয়পক্ষের গুরুজনদের প্রণাম করে, আশীর্বাদ গ্রহণ করে এবং গুরুজনদের স্নান করায়।

পরবর্তী নির্দিষ্ট দিনে বরপক্ষ আবার ঘটকের সঙ্গে কনের বাড়ি আসে। ঐ দিন কনেপক্ষ একটি চোলাই মদের পাত্র এবং মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে তার সঙ্গে একটি পিতলের থালার মধ্যে সামান্য মাটি, তুলো, তিল, ধান, দূর্বা ইত্যাদি রাখে। বরের পিতা নির্ধারিত পণের টাকা কনের মূল্য হিসাবে পিতলের থালায় রাখে। এই দিনই টাকা-পয়সা লেনদেনের পর বিয়ের দিন ধার্য করা হয়। সেই সঙ্গে গ্রামের পুরোহিত (ওচাই বা অচাই) কে কনেপক্ষ ডেকে এনে পান সুপারী প্রদান করে এবং বিয়ের দিনের পূজা ইত্যাদি সম্পাদনের জন্য অনুরোধ করে। তবে যে অচাই বিয়ের কাজ সম্পন্ন করবেন, তাঁর পক্ষে অবশ্যই বিবাহিত এবং সস্ত্রীক থাকা আবশ্যক। বিয়ের দিন বরযাত্রীসহ বরপক্ষ কনের বাড়িতে আসে। বরযাত্রিদের মধ্যে বরের বন্ধুবান্ধব, বরের পিতা এবং আত্মীয়স্বজনেরা প্রাধান্য পায়।

অন্যদিকে বিয়ের দিন কনের বাড়ির সামনে চারটি বাঁশ পোতা হয়। এই বাঁশগুলির সঙ্গে চারটি কলাপাতা বেঁধে দেওয়া হয়। পোতা বাঁশের ডগায় ৮টি বাঁশের কুঞ্চিও

খাড়াভাবে, আড়াআড়িভাবে এবং পার্শ্বভাবে বেঁধে দেওয়া হয়। এই বাঁশের কুঞ্চির ওপর একটি কাপড়ের টুকরো বাঁধা থাকে। নীচে একটি কলাপাতা মাটিতে পাতা থাকে। যখন বরযাত্রীদল কনের বাড়িতে পৌঁছায়, তখন বর-কনের পোশাক, অলংকার এবং অন্যান্য দ্রব্য-সামগ্রী কলা পাতার ওপর রাখে। যে দু'টি বাঁশ সম্মুখভাবে অবস্থান করে সেগুলির গোড়ায় দু'টি মাটির প্রদীপ জ্বালানো হয়। তারপর দুজন মহিলা ঘট থেকে সাতবার জল ছিটায় এবং সমবেত মহিলারা উলু ধ্বনি দেয়।

বিয়ের দিন কনের বাড়িতে "লাম্প্রা ওয়াথপ" পূজা করা হয়। সাধারণত অচাই (পুরোহিত) পূজার কার্য সম্পাদন করে। অচাইকে পূজার কাজে সাহায্য করার জন্য একজন যোগালী (বারুয়া) থাকে। পূজা উপলক্ষে চৌদ্দটি মোরগ উৎসর্গ করা হয়। এই চৌদ্দটি মুরগির মধ্যে দশটি বরপক্ষ থেকে এবং চারটি কনেপক্ষ থেকে দেওয়া হয়। অচাইকে বরপক্ষ থেকে একটি নূতন গামছা (রিটুকু) সম্প্রদান করা হয়। অচাই স্নান করে নূতন গামছা পড়ে এবং পূজার কাজ করে। "লাম্প্রা ওয়াথপ" পূজার প্রধান উদ্দেশ্য হল নবদম্পতির জন্য মঙ্গল কামনা করা। তারপর কনের ঘরের সামনে অচাই লংথরাই দেব দেবীর পূজা করে। লংথরাই দেব দেবীকে দুটি মুরগি উৎসর্গ করা হয়। তারপর অচাই কনের ঘরের এককোণে মাইলৌমা, খৌলৌমা দেবীদ্বয়ের পূজা করে, দুটি মোরগ উৎসর্গ করে। পূজার ক্রিয়াকর্মের জন্য অচাইকে বরপক্ষ থেকে এক বোতল এবং কনেপক্ষ থেকে আধ বোতল মদ প্রদান করা হয়। অচাই মদ পান করার পরে যে ব্যক্তি মদ প্রদান করেছিল সে অচাইকে নতজানু হয়ে পূজার ফলাফল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে এবং অচাই উত্তর দেয়।

বিয়ের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য বরপক্ষ থেকে একজন মহিলা এবং একজন পুরুষ লোক নিযুক্ত করা হয়। কনেপক্ষও অনুরূপ একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা নিযুক্ত করে। বিয়ের কাজ সম্পাদনের জন্য নিযুক্ত এই পুরুষলোককে বলে "আয়া" এবং মহিলাকে বলে "আয়াচুক"। আয়া এবং আয়াচুকের সঙ্গে দুই বালককে ও নিযুক্ত করা হয় যারা বর-কনের স্নানের জল মাটির কলসে করে সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। আয়া এবং আয়াচুক বিয়ের দিন কনের বাড়িতে আসার পর বর ও কনেপক্ষ থেকে চোলাই মদ প্রদান করা হয়। বিয়ের দিন বিবাহে উপস্থিত সকলকে পাকা কলা, খই, গুড় ইত্যাদির লাড্ডু খাওয়ানো হয় এবং বিবাহে উপস্থিত সকলের মাথায় সুগন্ধি তেল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ছেলে দুটি যে জলের কলস নিয়ে আসে তার একটি বরকে এবং একটি কনেকে স্নান করার জন্য দেওয়া হয়।

স্নানপর্ব শেষ হলে বর-কনেকে বিয়ের সাজে সাজানো হয়। বর ধুতি, পাঞ্জাবি পড়ে এবং মাথায় পাগড়ি বাঁধে। হাতের আঙ্গুলে একটি আংটি পড়ে এবং কাঁধে একটি চাদর রাখে। কনে হাতে বাজু এবং পায়ে খাড়ু পড়ে। হাতের আঙ্গুলে আংটি এবং মাথায় ওড়না দিয়ে ঘোমটা পড়ে।

বিয়ের বাসরের সামনে একটি ফুল গাছ পোতা থাকে এবং কনের পোশাক পড়া শেষ হলে একজন লোক কনেকে পিঠে করে ঐ ফুল গাছের সামনে নিয়ে আসে। ঐ লোকটির পিঠে থেকে কনে ফুল গাছের একটি ডাল ভাঙ্গে এবং পিঠে চড়ে পুনরায় ঘরে চলে যায়।

ত্রিপুরী উপজাতিদের বিয়ের বাসর সাধারণত খোলা উঠানে বাঁশ এবং বাঁশের কঞ্চি দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়। বিয়ের বাসর সাধারণত আট হাত লম্বা এবং ছয় হাত লম্বা করে তৈরি করা হয়। বিবাহ বাসরের দু'টি দরজা রাখা হয়, একটি উত্তর পাশে এবং অপরটি পশ্চিম পাশে। পশ্চিম পাশের দরজা দিয়ে বর কনে বিবাহ বাসরে প্রবেশ করে এবং উত্তর পাশের দরজা দিয়ে আসর থেকে বের হয়ে আসে। বিবাহ বাসরের মধ্যস্থলে মাটি দিয়ে সুসজ্জিত একটি সুন্দর বেদী তৈরি করা হয়। এই বেদীর চারকোণে চারটি বাঁশের খুঁটি পোতা হয়। এই বাঁশের খুঁটিগুলির ওপর কাপড়ের চাঁদোয়া স্তরে স্তরে ঝোলানো হয়। চারটি গাছ এবং বাঁশের খুঁটি গুলি মালা, আমের পাতা এবং আলোক সজ্জায় সুসজ্জিত করা হয়। বিবাহ বাসরের উত্তর-পশ্চিম কোণে বাঁশের একটি মাচা (সপাং) তৈরি করা হয়। এই মাচার ওপর বিয়ের উপহার সামগ্রী প্রদর্শন করার ব্যবস্থা করা হয়।

আয়াচুক বিয়ের সূতো কাটার পর বর বিবাহবেদীর ভিতর প্রবেশ করে এবং কাঠের পিঁড়ির উপর আসন গ্রহণ করে। তারপর কনেকে বরের পাশে পিঁড়িতে বসায়। কনের ঘোমটে একটি নূতন কাপড় পাতা হয় এবং কাপড়ের ওপর বরকে দেওয়ার জন্য বেশ কিছু ফুল রাখা হয়। এখন কনে এবং বরকে পিঁড়ির ওপর বসিয়ে বেদী থেকে বাইরে নিয়ে আসা হয়। কনে-বরের চার পাশে সাতবার পরিক্রমা করে। প্রতি বার পরিক্রমার পর কনে বরকে হাতজোড় করে নমস্কার করে এবং কোল থেকে ফুল নিয়ে বরের প্রতি ছিটায়। বরকে ফুল ছিটানোর সময় যে ফুলগুলি মাটিতে পড়ে তার থেকে একটি ফুল বরের মা গিলে খেয়ে নেয়। বরের মায়ের ফুল খাওয়ার পিছনে যুক্তি হল বর-কনের অমঙ্গলের জন্য কোনো অসৎ ব্যক্তি যেন কিছু করতে না পারে। এই সময়ে বরপক্ষ এবং কনেপক্ষের মধ্যে প্রতিযোগিতা পরিলক্ষিত হয়, বিশেষ করে বর এবং কনেকে পিঁড়িসহ যত বেশি ওপরে তুলে ধরা যায়। সাঁত পাকে বাঁধা অর্থাৎ সাত বার প্রদক্ষিণ পর্ব শেষ হওয়ার পর কনে এবং বর মালা বদল করে জীবনসাথী হয়ে যায়। মালা বদল পর্ব শেষ হওয়ার পর কন্যার পিতা অথবা অন্য কোনো গুরুজন দ্বারা কন্যা সম্প্রদান করার জন্য বরকনেকে আবার বিবাহ বাসরে নিয়ে আসা হয়। কন্যা সম্প্রদান পর্ব সমাপ্ত হলে বরের এবং কনের কাপড়ের শেষ প্রান্তে গিঁট দেওয়া হয়। এই অবস্থায় বর-কনে এক সঙ্গে হিতৈষী "লাম্প্রা ওয়াথপ" দেবীর কাছে হাঁটু গেঁড়ে বসে মাথা নুইয়ে আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। এই সময় অচাই (পুরোহিত) দেবীর পদধূলি এবং পূজার জল নবদম্পতির মাথায় ছিটিয়ে দেয় এবং

সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য আশীর্বাদ করে। তারপর আয়া এবং আয়াচুকগণ নবদম্পতিকে কনের ঘরে নিয়ে আসে। ঘরের মধ্যে নবদম্পতিকে একটি বাঁশের নূতন চাটাই বা মাদুর বা পাটির ওপর বসানো হয়। নবদম্পতির সামনে একটি মাটির প্রদীপ সরিষার তেলের সাহায্যে জ্বালানো হয়। একটি থালায় কিছু পরিমাণ মাটি, দূর্বা, তুলো, ধান ইত্যাদি রাখা হয়। অচাই এই সমস্ত আশীর্বাদ সামগ্রী নিয়ে বর-কনের মাথার চারপাশে তিনবার ঘুরিয়ে ছুড়ে ফেলে দেয়। এই পদ্ধতি পরপর তিনবার অনুসরণ করা হয়।

এরপর এক টুকরো কাঁচা হলুদ, শুঁটি (সুকুই), একটি রূপার আংটি, একটি হরতকী ইত্যাদি একটি নূতন পাতিলে রাখা হয়, বর কনের পাশা খেলার উদ্দেশ্যে। নবদম্পতি একসঙ্গে তাদের ডান হাত ঐ পাতিলে ঢুকায় এবং পাতিলের ভিতরের দ্রব্যসামগ্রী তুলে আনার চেষ্টা করে। এই ক্রিয়া পর পর তিনবার সম্পাদন করা হয়। এই আচার অনুষ্ঠান সমাপ্ত হলে নবদম্পতি, আয়া এবং আয়াচুক বাড়িতে তৈরী পিঠা খায়। আয়া এবং আয়াচুক পিঠা ব্যতীত বর-কনের পক্ষ থেকে চোলাই মদও প্রদান করা হয়। তারপর নবদম্পতি, আয়া এবং আয়াচুকের সঙ্গে এসে পিতা মাতা এবং অন্যান্য গুরুজনদের প্রণাম করে এবং আশীর্বাদ গ্রহণ করে। এই অনুষ্ঠানের পর নবদম্পতিকে কাপড়ের গিঁট খুলে দেওয়া হয়। এখন সকলে মিলেমিশে একসঙ্গে নৈশ ভোজ করে। তবে বিয়ের রাত্রে সাধারণত নবদম্পতিকে একসঙ্গে একই বিছানায় ঘুমাতে দেওয়া হয় না।

বিয়ের পরদিন সকালে বিয়ে বাড়ির উঠানে আর একটি অনুষ্ঠান পালন করা হয়। কয়েকজন লোক বর এবং কনে পক্ষ থেকে এক জাগায় জড়ো হয়। ঐ স্থানে দুই কলস চোলাই মদ বরপক্ষ থেকে এবং দুই কলস মদ কনেরপক্ষ থেকে তাদের সেবায় দেওয়া হয়। মদের মাটির কলসিগুলি বাহিরে কাঁচা হলুদের রস এবং চাউলের গুড়োর লেই দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়। উৎসর্গীকৃত চোলাই মদকে বলে "ছুকবা"। তবে এই অনুষ্ঠানে অবিবাহিত এবং বিবাহিতদের মধ্যে যাদের পিতা মাতা জীবিত তারা অংশ গ্রহণ করতে পারে না।

এছাড়া বরপক্ষ এবং কনেরপক্ষ থেকে দুই বোতল হিসাবে মোট চার বোতল চোলাই মদ অচাই (পুরোহিত) কে "সেমা" অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার জন্য দেওয়া হয়। সাধারণত একজন লোক প্রথমে মদ পাত্রের ওপর ঢাকনা দিয়ে অচাইকে প্রদান করে। অচাই ঐ মদ পান করার পর একই পদ্ধতিতে আরো দুটি পাত্র অচাই এর সেবায় দেওয়া হয়। অচাই সম্পূর্ণ মদ পান করার পর ঐ ব্যক্তি অচাইকে বিয়ের পূজা অর্চ্চনার ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। অচাই বিয়ের পূজার ফলাফল সম্পর্কে মন্তব্য করে এবং কোন প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলে আর একবার পূজা করে এবং নবদম্পতির মঙ্গল কামনা করে। এ ছাড়া-দেবী "লাম্প্রা ওয়াথপ" এর পূজায় উৎসর্গীকৃত মুরগির

মাছের রান্না করে আচাই ঐ তরকারি বর-কনের পিতা-মাতা এবং আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে বিতরণ করে। এরপর বর কনে তাদের পিতা-মাতাকে স্নান করায়। স্নানের পর্ব শেষ হলে একটি পিতলের থালায় কিছু ধান, দূর্বা, তুলো, তিল এবং মাটি ইত্যাদি রাখা হয়। নবদম্পতি তাদের গুরুজনদের প্রণাম করে এবং গুরুজনগণ পিতলের থালায় রাখা দ্রব্যসমূহের দ্বারা আশীর্বাদ করে।

তারপর একটি ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়। এই ভোজনে যদিও বিভিন্ন প্রকার তরকারী রান্না করা হয় তবুও শুকনো মাছের একটি তরকারি নবদম্পতিকে অবশ্যই নিজ হাতে সকলকে পরিবেশন করে থাকে। ভোজন পর্ব শেষ হলে নবদম্পতি সকলের হাত ধোয়ায়।

তারপর পাচক (সুয়ারীস) গণ ও খাওয়াদাওয়া করে। পাচকদের বর এবং কনে পক্ষ থেকে মদ প্রদান করা হয় এবং দম্পতি নিজ হাতে শুকনো মাছের তরকারি পরিবেশন করে।

বিয়ের পর তৃতীয় দিনে অথবা সপ্তম দিনে বর নববধূকে সঙ্গে নিয়ে নিজ বাড়িতে আসে। নবদম্পতিকে বাড়ি ঢোকার সময় নববধূর শ্বশুর-শাশুড়ি, আত্মীয়স্বজন এবং গ্রামবাসীরা মাঙ্গলিক ক্রিয়কলাপ করে বধূ বরণ করে। নবদম্পতিকে ঘরে নিয়ে যাওয়ার পর গুরুজনদের পদধূলা নেয়, পরিবর্তে গুরুজনেরা তূলো, ধান, দূর্বা, তিল ইত্যাদি দিয়ে আশীর্বাদ করেন।

ত্রিপুরী উপজাতি সম্প্রদায় হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী। তারা বিভিন্ন হিন্দু দেবদেবী যেমন কালী, লক্ষ্মী, কৃষ্ণ, মহাদেব ইত্যাদির পূজা করে। এ ছাড়া, উপজাতিদের নিজস্ব দেবতা যেমন গড়িয়া, "লাম্প্রা ওয়াথপ" ইত্যাদি এবং দেবী যেমন নাসসুমীতাই, হাইচুকমা ইত্যাদির পূজা করে থাকে।

ত্রিপুরারাজ্যের ত্রিপুরী উপজাতিদের দেবদেবীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

১। মীতাই কতর এবং মীতাই কতরমা ঃ মীতাই কতর দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং মীতাই কতরমা তাঁর সহধর্মিণী। এই দেবদেবী তুষ্ট হলে ধনসম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং সংসারের মঙ্গল হয়। পারিবারিক অথবা সামাজিক পূজা হিসাবে সমবেত ভাবে ত্রিপুরী উপজাতি এই দেবদেবীর পূজা করে। পূজার মধ্যে একটি হাঁস অথবা পাঁঠা উৎসর্গ করা হয়। এ ছাড়া, কলা, চাউল, সিঁন্দুর, পান, সুপারী ইত্যাদি এই পূজায় প্রয়োজন হয়। এই পূজার কাজ সাধারণত বাড়ির বাইরে সম্পাদন করা হয়।

২। আখাত্রা এবং বিখাত্রা ঃ আখাত্রা এবং বিখাত্রা হল মীতাই কীতীর এবং মীতাই কীতারমার দুই পুত্র। এদের এক সঙ্গে পূজা করা হয় এবং বলা হয় লাম্প্রা। এই দুই দেবতার পূজা ত্রিপুরী সম্প্রদায় যে কোন সামাজিক অথবা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের শুরুতে সম্পাদন করে থাকে।

৩। তুইমা ঃ জলের দেবী। পারিবারিক অথবা সামাজিক ভাবে তুইমার পূজা করা হয়। প্রধানত ছোঁয়াচে মহামারী রোগ যেমন কলেরা, বসন্ত ইত্যাদির হাত থেকে রক্ষা

পাওয়ার উদ্দেশ্যে। সাধারণত নদী বা ছড়ার মধ্যে জলদেবীর পূজা সম্পাদন করা হয়। ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের ধারণা জলের মাধ্যমে মানুষের বিভিন্ন মহামারী রোগ ছড়ায় তাই জলদেবী সন্তুষ্ট হলে রোগের হাত থেকে মুক্ত থাকতে পারবে। জলদেবীর পূজায় একটি পাঁঠা অথবা একটি মহিষ উৎসর্গ করা হয়।

৪। **স্যানগ্রাম ঃ** এই দেবতাকে জলদেবীর স্বামী হিসাবে গণ্য করা হয়। যদি পরিবারের কেউ বার বার অসুস্থ হয় তবে রোগ মুক্তির উদ্দেশ্যে স্যানগ্রাম দেবতার পূজা করা হয়। সাধারণত পারিবারিক পূজা হিসাবে বাড়ির উঠানে এই ঠাকুরের পূজায় দুটি মোরগ অথবা দুটি ডিম উৎসর্গ করা হয়।

৫। **মাইলৌমা এবং খৌলৌমা ঃ** মাইলৌমা ধানের দেবী এবং খৌলৌমা তূলার দেবী। এই দুই দেবী সন্তুষ্ট থাকলে ভাত কাপড়ের অভাব হয় না বলে ত্রিপুরীদের বিশ্বাস। এই দুই দেবীকে বাড়ি ঘরে ধনসম্পদ এবং সংসারের সমৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এক সঙ্গে পূজা করা হয়। এই পূজা পারিবারিক পূজা এবং পূজার সময় দুটি মোরগ উৎসর্গ করা হয়।

৬। **নকছুমৌতাই ঃ** এই দেবীকে বাড়ীর কর্ত্রী হিসাবে গণ্য করা হয়। পরিবারে কেউ অসুস্থ হলে আরোগ্য কামনা করে নাকছুমৌতাই দেবীর পূজা করা হয়। পূজার সময় একটি মুরগি অথবা একটি শূকর দেবীকে উৎসর্গ করা হয়। পূজার পরে রান্না করা মাংসও দেবীকে উৎসর্গ করা হয়। তারপর অচাই (পুরোহিত) এবং তার সাহায্যকারী (বারুয়া) পরিবারের সকলের সঙ্গে মাংস প্রসাদ খায়।

৭। **কালিয়া এবং গড়িয়া ঃ** কৃতকার্যের ঠাকুর। প্রতি বছর বৈশাখ মাসের প্রথম সপ্তাহে এই দুই ঠাকুরের যৌথভাবে অথবা এককভাবে পূজা করা হয়।

৮। **সাকলক মৌতাই ঃ** সুস্বাস্থ্যের ঠাকুর। মাঘ মাসের শেষ অথবা ফাল্গুন মাসে এই দেবতার পুজা করা হয়। বাড়ীর উঠানে বিভিন্ন প্রকার পিঠা তৈরি করে পূজায় উৎসর্গ করা হয়। পূজার দিন সন্ধ্যার সময় একটি পাঁঠা বাড়ির ভিতরে ঠাকুরের কাছে উৎসর্গ করা হয়।

উপরোক্ত ঠাকুরগুলিকে ত্রিপুরা উপজাতি হিতৈষী দেবদেবী হিসাবে পুজা করে। এ ছাড়া, ঈর্ষাপরায়ণ বা ক্ষতিকর দেবদেবীকে সন্তুষ্ট করার জন্য নানা ধরণের পূজা পার্বণ করে থাকে। ত্রিপুরী উপজাতিদের ঈর্ষাপরায়ণ দেবদেবীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

১। **থৌমনাইরক বনিরক ঃ** এই দুই দেবতাকে মৃত্যু খবরের বাহক হিসাবে গণ্য করা হয়। থৌমনাইরক দেবতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য একটি পাঁঠা অথবা ছাগী সঙ্গে দুটি মোরগ ছানা অথবা দুটি ডিম দিয়ে বাড়ির আঙ্গিনায় পূজা দেওয়া হয়। বনিরক দেবতার পূজা জঙ্গলে করা হয়। তার মেজাজ ঠিক রাখার জন্য দুটি মুরগি অথবা হাঁস উৎসর্গ করা হয়।

৪। **ছৌকাল জৌক ঃ** ছৌকাল জৌক দেবীকে ডাইনীদের অভিভাবক হিসাবে গণ্য করা হয়। অসুস্থতার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ছৌকাল জৌক দেবীর পূজা করা হয়। কাছিম এবং শুকরের রান্না করা মাংস দেবীকে উৎসর্গ করা হয়। এই দেবীর পূজা সাধারণত গ্রামের বাহিরে সম্পাদন করা হয়।

৬। **বুরাসা ঃ** এই দেবতাও রোগ মুক্তির জন্য পূজা করা হয়। ছোট শিশুর ঘন ঘন জ্বর এবং মাথায় কামাকাটি করলে ধরে নেওয়া হয় বুরাসা দেবতার কারণে রোগ হয়েছে। রোগমুক্তির জন্য দুটি কালো রঙের মুরগি এবং দুটি ডিম উৎসর্গ করে বুরাসা দেবতার পূজা গ্রামের বাইরে সম্পাদন করা হয়।

৭। **হাইচুকমা ঃ** হাইচুকমা দেবীকে বুরাসা দেবতার স্ত্রী হিসাবে মান্য করা হয়। এই দেবী পশুপাখি এবং অরণ্যের দেবীরূপে গণ্য হয়। ত্রিপুরী উপজাতি সম্প্রদায়ের কারোর গৃহপালিত পশু পাখি হারিয়ে গেলে ফিরে পাওয়ার জন্য হাইচুকমা দেবীর পূজার মানস করে থাকে। হারানো পশু-পাখি ফিরে পেলে মানস রক্ষা করার জন্য জঙ্গলে হাইচুকমা দেবীকে দুটি কালো রঙ্গের মোরগ অথবা একটি শূকর উৎসর্গ করে পূজা দেওয়া হয়।

৮। **সিরি জামদু এবং সিরি যাদু ঃ** সাধারণত বন্ধ্যা মহিলারা সন্তান কামনা করে এই ঠাকুরের পূজা করে থাকে।

উপরে বর্ণিত দেবদেবী ছাড়াও উত্তর এবং ধলাই জেলায় বসবাসকারী ত্রিপুরী উপজাতি সম্প্রদায় "লংথরাই মৌতাই" দেবতার পূজা করে। এ ছাড়া উত্তর পূর্ব ভারতে এবং বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী সমস্ত ত্রিপুরী উপজাতি সম্প্রদায় দক্ষিণ ত্রিপুরার অমরপুর মহকুমার ডম্বুরে পৌষ-সংক্রান্তি তিথিতে স্নান করা এবং পূজা দেওয়া মহাপুণ্য হিসাবে পালন করে। গরিব ত্রিপুরী উপজাতি যারা গয়া, কাশী গিয়ে পূর্ব পুরুষের পারলৌকিক কার্য সম্পাদনে অক্ষম, বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী সকল ত্রিপুরী সম্প্রদায় তাদের পূর্বপুরুষের মাথার এবং কপালের হাড় ডম্বুরে গোমতী নদীতে বিসর্জন দিয়ে তর্পণ করে এবং পূর্বপুরুষের আত্মার সদগতি কামনা করে থাকে। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, গোমতীর উৎস স্থলে পাথরের স্তূপ দেখলে মনে হয় একটি গরু হাঁ করে আছে এবং গরুর মুখ দিয়ে জল প্রবাহিত হয়ে নীচে আসছে। তাই গো-মুখ দিয়ে প্রবাহিত নদীর নাম গো-মতী বা গোমতী। গো-মুখের দক্ষিণ পাশে একটি বিশাল পাথরের ওপর দেবাদিদেব মহাদেবের পদচিহ্ন বিদ্যমান, এমন বিশ্বাস ত্রিপুরী উপজাতির মধ্যে দেখা যায় এবং অনাদিকাল থেকে ত্রিপুরার হিন্দু আদিবাসী সম্প্রদায় ডম্বুরে পূজা এবং পৌষ-পার্বণ উৎসব পালন করে আসছে।

জুম চাষ (Jhum cultivation) অথবা স্থান পরিবর্তিত চাষ (Shifting cultivation) অথবা কাটা এবং পোড়ানো (Slash and burn) পদ্ধতিতে চাষবাস

ত্রিপুরী উপজাতি সম্প্রদায় সাধারণত পাহাড়ের ঢালের বনজঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে, কাটা বনজঙ্গল শুকানোর পর আগুনে পুড়ে ঐ স্থানে একগুচ্ছ ফসলের বীজ যেমন ধান, তূলো, লংকা, ভুট্টা, মেস্তা, তিল, শাকসবজি ইত্যাদি বপন করা হয়। বিভিন্ন ফসল সংগ্রহ করার পর ঐ স্থান পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায়।

হান্টার সাহেবের মতে ১৮৩০ সালে ত্রিপুরারাজ্যে জুম চাষের প্রাধান্য ছিল। তৎকালে সমতল জমিতে চাষবাসের তেমন উল্লেখযোগ্য নজীর পাওয়া যায় না। ১৯০৮ সালের ইমপ্যারিক্যাল গেজেটের রিপোর্টও দেখা যায় স্থানান্তরিত চাষ পদ্ধতি অর্থাৎ জুম চাষ ছিল ত্রিপুরার সর্বত্র বিরাজমান, ঐ সময়ে জুম চাষের মাধ্যমে জুমিয়া উপজাতি পরিবারগুলি মোটামুটি খেয়ে পড়ে সচ্ছল জীবনধারণ করতো। যেহেতু জুমিয়া পরিবারগুলি স্থানান্তরিত বা যাযাবর চাষ পদ্ধতি অনুসরণ করতো তাই খুব বেশি ধনসম্পত্তি জমাতে পারতো না। মোট কথা, ঐ সময়ে জুমিয়া পরিবারগুলি ছিল, না দরিদ্র, না ধনী।

রাজার আমলে জুমিয়া পরিবার থেকে "ঘরচুক্তি " কর আদায় করা হত। যেহেতু জুমিয়া পরিবারগুলি জুমের জমির খোঁজে বাসস্থান পরিবর্তন করে। তাই পরিবারের কর্মক্ষম পুরুষদের হিসাব করে "ঘরচুক্তি" কর ধার্য করা হত। ঘরচুক্তি কর প্রদান করে জুমিয়া পরিবার গুলি বাজার আনুগত্য স্বীকার করতো।

ত্রিপুরী উপজাতি সম্প্রদায় প্রাচীনকালে জুমচাষ শুরু করার আগে মন্ত্রণাসভা করে পরিষদ গঠন করতো। এই পরিষদের কর্মকর্তারা গ্রামবাসীদের দ্বারা নির্বাচিত হত। পরিষদের প্রধান গ্রাম্য কর্তাকে বলা হত "সর্দার" বা "চৌধুরী"। পরিষদের সচিবকে বলা হত "কারবারী" এবং পরিষদের খবরাখবর আদান প্রদানের জন্য নিযুক্ত ব্যক্তিকে বলা হত "খান্ডাল"।

"সর্দার" বা "চৌধুরী" গ্রামের প্রধান হিসাবে পরিগণিত হয় এবং মুখপাত্র হিসাবে কাজ করে। সর্দার বা প্রধান পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে সর্বসম্মতিক্রমে আলাপ আলোচনা করে গ্রামের সামাজিক আইন তৈরি করতে পারেন। সাধারণত চৌধুরীর বাড়ি পরিষদের অফিস হিসাবে গণ্য হয়। কারবারী পরিষদের যাবতীয় তথ্য রক্ষণা-বেক্ষণের দায়িত্ব পান। খান্ডাল পরিষদের বিচার, মতামত ইত্যাদি গ্রামবাসীদের কাছে পৌঁছানোর দায়িত্ব বহন করে। মহিলারা সাধারণত পরিষদের সদস্য পদ থেকে বঞ্চিত হয়।

জুমচাষের সঙ্গে ত্রিপুরী উপজাতিদের নাচ-গান ইত্যাদি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। উদাহরণস্বরূপ, বলা যায় ভাদ্র-আশ্বিন মাসে জুম ধান বাড়িতে আনার পর ত্রিপুরী উপজাতি জুমিয়া পরিবারগুলি আনন্দে মেতে উঠে এবং নাচ-গান করে। একে বলে "মাইকাতাল"। মাইকাতাল নাচ-গানের সময় বাঁশি এবং সারিন্দার সুমধুর সুর বাজানো হয়। জুম ধান গোলাজাত করার পর "মমিতা" উৎসব

পালন করা হয় এবং উৎসবে ব্যবহৃত গানগুলিকে বলে মমিতা গান। "লেবাঙ বুমানি" নৃত্যও ত্রিপুরী উপজাতিদের খুব প্রিয়। লেবাঙ একটি পোকার নাম। বুমানি অর্থ মারা। লেবাঙ বুমানি নাচের মুখ্য উদ্দেশ্য হল যান্ত্রিক পদ্ধতিতে জুমের ক্ষতিকর পোকার ধ্বংস সাধন। প্রাচীনকালে জুমচাষে কীটনাশক ঔষধ ব্যবহার করা হত না। তার পরিবর্তে নাচ-গানের মাধ্যমে কায়দা করে জুম ফসলের ক্ষতিকর পোকার ধ্বংস সাধন করা হত। লেবাঙ পোকা দলবদ্ধ হয়ে পাহাড়ের ঢালে জুম ফসলে আক্রমণ করতো এবং ফসলের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করতো। ত্রিপুরী উপজাতি যুবকেরা দুটি বাঁশের কঞ্চির সাহায্যে সুমধুর সুরের সৃষ্টি করে পাহাড়ের ঢাল থেকে নীচের দিকে নেমে আসে। বাঁশের তৈরী সুরে আকৃষ্ট হয়ে জুম ফসল থেকে লেবাঙ পোকার ঝাঁক জুম ফসল ছেড়ে যুবকদের পিছু নেয় তখন ত্রিপুরী উপজাতি যুবতীরা দলবদ্ধ হয়ে পোকার ওপর নাচতে নাচতে নীচের দিকে নেমে আসে এবং যুবতীদের পায়ের চাপে পিষ্ট হয়ে অথবা হাতে ধরে পোকা মারে এবং পোকার সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখত। কালক্রমে এই ধরণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে জুম ফসলের লেবাঙ পোকা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ত্রিপুরী উপজাতিদের নৃত্যকলায় স্থান করে নেয় এবং বর্তমানেও লেবাঙ বুমানি নৃত্য ত্রিপুরী উপজাতিদের খুব প্রিয়। এই নৃত্যে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, টুইট্রেঙ্গ, ল্যাবাঙটি ইত্যাদি। ত্রিপুরী উপজাতি যুবক-যুবতীরা দলবদ্ধ হয়ে চিরাচরিত পোশাকে সুসজ্জিত হয়ে এখন মঞ্চে লেবাঙ বুমানি নৃত্য করে থাকে।

গড়িয়া পূজার নাচ-গান ত্রিপুরী উপজাতি সম্প্রদায় বৈশাখ মাসের প্রথম সপ্তাহে করে থাকে। গড়িয়া ঠাকুর সন্তুষ্ট হলে ত্রিপুরী উপজাতি সম্প্রদায়ের ধারণা জুম ফসল ভাল হবে এবং নূতনবর্ষে সুখ শান্তিতে জীবনধারণ করতে সক্ষম হবে। অনেক উপজাতি জুমিয়া চাষীভাই এখনও গড়িয়া পূজার পর জুম ফসল বপন/রোপণের কাজ শুরু করে। ত্রিপুরী উপজাতি লোকগীতির মধ্যে ও জুমচাষের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়, যেমন, জুম ধান রোপণের সময় গড়িয়া পূজার গান এবং জুম ধান গোলাজাত করার পর মমিতা গান ইত্যাদি।

ত্রিপুরী উপজাতি জুমিয়া পরিবারগুলিতে জুমচাষের ক্রিয়া কালে কিছু কিছু কুসংস্কার বিদ্যমান, যেমন, ত্রিপুরী উপজাতি জুমিয়া কৃষক জুম চাষের জমি নির্বাচনের সময় যদি দেখে হরিণ মাটি খায়, তবে ত্রিপুরীরা ঐ জমিতে জুম চাষ করা থেকে বিরত থাকে কারণ তাদের ধারণা, ঐ জমিতে জুম চাষ করা হলে জুমিয়া পরিবারে যে কোন প্রকার অঘটন ঘটবে। অন্যদিকে জুম ধান রোপণের দিন জুমিয়া চাষী "চাকুই" এক প্রকার তরকারি গ্রহণ করবে না। ঐ দিন সাবান ব্যবহার থেকেও বিরত থাকে। আবার মূল খাওয়া হয় এমন ফসল শিমুল আলু, কচু, ওল ইত্যাদি ঐ দিন রোপণ করা হলে জুম ধানের ফলন অধিক হবে এমন ধারণা পোষণ করা হয়। যদি কোন ত্রিপুরী উপজাতি স্বপ্নে দেখে হাতি তার ঘরের দিকে আসছে তবে তাদের ধারণা ঐ বছর

জুম ফসল ভাল হবে। প্রথম জুম ধান কাটার সময় জুমিয়া চাষী খালি পেটে কয়েক গোছা ধানের ছড়া সংগ্রহ করে ঘরের কোণে ঝুলিয়ে দেয় এবং ধূপ ধূনা দিয়ে পূজা করে।

ত্রিপুরী উপজাতিদের দেবদেবীর মধ্যে লক্ষ্য করলে দেখা যায় জুম ফসলে দেবদেবী বিদ্যমান। যেমন ধানের দেবীকে বলে "মাইলৌমা" তুলোর দেবীকে বলে "খৌলৌমা"। ফসলের দেবদেবীদ্বয়ের পূজা একসঙ্গে করা হয়। এই দু-দেবীকে সন্তুষ্ট করার জন্য পূজার সময় দুটি মোরগ উৎসর্গ করা হয়।

জুম ধানের বিভিন্ন জাত জুমিয়া উপজাতি ভাইয়েরা বিভিন্ন ভাবে ব্যবহারের জন্য চাষ করে। যেমন জুম ধান জাত চিনাল, বেতি, কাঞ্চলী, সাদা গেলং (গেলং কুফুর) বিজং গ্রিমা, নেপাল, লাল গেলং (গেলং কাচাক) ইত্যাদি প্রধানত ভাত খাওয়ার জন্য চাষ করা হয়। অন্যদিকে মাইমি গুরজা, মাইমি ওয়াটক, মাইমি কচাকহা, মাইমি ওকহাম, মাইমি গুড়িয়া ইত্যাদি পিঠা, পায়েস, দেশী মদ যেমন আরাক, লাঙ্গী ইত্যাদি তৈরির জন্য বহুল ব্যবহৃত হয়, আবার মাইমি নক খাম, মাইমি কসম্ জাত পিঠা পায়েস, দেশীমদ তৈরি এবং ঔষধি হিসাবে বহুল ব্যবহৃত হয়। মাইমি নক খাম ধান "লংকাপুরা" হিসাবেও পরিচিত কারন এই ধানের বাহিরের রঙ সাদা কিন্তু চাউলের রঙ কালো আবার মাইমি কসম্ জাতের ধান এবং চাউল উভয়ের রঙ কালো। এইগুলি অর্শ এবং ভগন্দর রোগের প্রতিকারক বলে দাবী করা হয়।

মাইক্রোউ নামক এক প্রকার দানা শস্য ধলাই জেলার জুম ফসলে বর্তমানে চাষ করতে দেখা যায়। আখকে স্থানীয় জুমিয়া উপজাতিরা বলে "ক্রোউ" এবং "মাই" অর্থ ধান। জুমে চাষ করা "মাই ক্রোউ" গাছ দেখতে অনেকটা আখের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বীজ ও গমের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। স্থানীয় জুমিয়া উপজাতিদের মতানুসারে প্রাচীনকালে জুমে ধানের পরিবর্তে "মাইক্রোউ" অধিক চাষ হত। এই দানাশস্য বর্তমানেও জুমিয়া উপজাতি সিদ্ধ করে খায়। গুঁড়ো করে রুটি তৈরি করে। পিঠা, পায়েস এবং দেশী মদ তৈরিতেও বহুল ব্যবহার করে থাকে।

❐ দ্বিতীয় অধ্যায়

রিয়াং

ত্রিপুরা রাজ্যে রিয়াং উপজাতির জনসংখ্যা উপজাতি সম্প্রদায়গুলির মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। রিয়াং উপজাতি ত্রিপুরা ব্যতীত বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং ভারতবর্ষের মিজোরামেও বসবাস করে। উপজাতি জনগোষ্ঠীগুলি সাধারণত অনুন্নত, কিন্তু রিয়াং উপজাতি এখনও আদিম কৃষি (জুমচাষ), বন, পশুপালন এবং শিকারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, শিক্ষিতের হার নগণ্য, বেশির ভাগ জনসংখ্যা গভীর অরণ্যে, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এমন প্রত্যন্ত জনগোষ্ঠী অঞ্চলে বসবাস করে। তাই ত্রিপুরারাজ্যে রিয়াং উপজাতি জনগোষ্ঠী আদিম উপজাতি হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

রিয়াং উপজাতি জনগোষ্ঠী সাধারণত অন্যান্য উপজাতিদের থেকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে পৃথক পৃথক পাড়ায় বসবাস করতে পছন্দ করে। রিয়াংদের পাড়াগুলিকে বলা হয় ''কামি''। রিয়াং পাড়ার নামকরণ সাধারণত পাড়ার প্রতিষ্ঠাতা অথবা পাড়ার প্রধান অথবা পাড়ার নিকটবর্তী ছড়া, পাহাড় ইত্যাদির নাম অনুসারে সকলের নিকট পরিচিতি লাভ করে। রিয়াং সম্প্রদায় বাসস্থান নির্বাচন করার সময় সমতল, মাঝারি ধরণের উঁচু পাহাড়, পর্যাপ্ত বাঁশবন সংলগ্ন এলাকা, আশপাশে চলমান জলের উৎস যেমন ছড়া, ঝর্ণা, পাহাড়ী জলের ধারা বিদ্যমান, অথচ হিংস্র বন্যপ্রাণী, সাপ, পোকামাকড় এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক শত্রুর কবলমুক্ত এমন স্থান প্রাধান্য পায়। রিয়াং সম্প্রদায় এক স্থানে দীর্ঘদিন বসবাস করে না। কয়েক বছর পর পর জুমের জমির খোঁজে অথবা পাড়ায় কোন রোগশোক দেখা দিলে রিয়াং উপজাতি বাসস্থান পরিবর্তন করে। এই ভাবে স্থান পরিবর্তন করাকে বলে ''ফুরং'' অর্থাৎ ''নাই'', অর্থাৎ নির্দিষ্ট স্থানে তাদের অস্তিত্ব নাই।

রিয়াং উপজাতি বাঁশের মাচার উপর ঘর তৈরি করে বসবাস করে। এই মাচা মাটির ওপর প্রায় ১৫ ফুট উঁচু করা হয়। মাচার ওপর যে ঘর তৈরী করা হয় তাকে বলে টংঘর। ঘরের চারপাশে বাঁশের বেড়া এবং ওপরে ছন, বাঁশপাতা ইত্যাদি দিয়ে ছাউনি দেওয়া হয়। রিয়াংদের টংঘরের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল ঘরের সামনে ও পিছনে বারান্দার ব্যবস্থা। সামনের বারান্দায় ছাউনি থাকলেও তিনপাশ খোলামেলা কিন্তু পিছনের বারান্দায় আংশিক ছাউনি থাকলেও বেড়া থাকে না। টংঘরের চার কোণে চারটি শক্ত গাছের খুঁটি থাকে। ছাউনির জন্য বাঁশের টানা এবং গাছের ভীম, বাঁশের বেতের সাহায্যে শক্ত ভাবে বাঁধা থাকে। ঘর বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দুই চাল-বিশিষ্ট হয়। প্রতিটি টং ঘরের সামনে ও পিছনে দুটি খোলা দরজা থাকে। প্রয়োজনে দরজা বন্ধ করার জন্য বাঁশের বেড়া দিয়ে তৈরি একটি পাল্লা বিদ্যমান। সামনের বারান্দার মধ্যস্থলে টংঘরে উঠার জন্য একটি গাছের শক্ত গুড়ির উপর ধাপ কেটে সিঁড়ির

ব্যবস্থা থাকে। রিয়াংরা মূল ঘরের মধ্যে কোন প্রকার বেড়া দিয়ে কোঠা তৈরি করে না। একই ঘরের উত্তর-পশ্চিম কোণের অংশ রান্না করার জন্য ব্যবহৃত হয়। পিছনের খোলা বারান্দা জিনিস পত্র শুকানোর জন্য বহুল ব্যবহার করা হয়। রিয়াংদের টংঘরের মাচার নীচে শুকর, ছাগল, মুরগি ইত্যাদি গৃহপালিত পশুপাখি প্রায়ই বিচরণ করে থাকে।

ত্রিপুরার প্রত্যন্ত অঞ্চলের রিয়াং আদিবাসীদের মধ্যে এখনও বনজঙ্গল থেকে বাঁশের কচি চারা (করুল), কচু, লতি, কচুর শাক, বনবেগুন, বেতের কচি ডগা, বুনো কলার মোচা, আলিয়া, বুনোমাশরুম, ঢেঁকির শাক, বুনো আলু এবং বনের ফল মূল ইত্যাদি সংগ্রহ করে খাওয়ার অভ্যাস বিদ্যমান। বনজঙ্গল থেকে এইগুলি সংগ্রহ করার জন্য রিয়াংদের লোহার তাক্কাল এবং বাঁশের তৈরী খাঁচা বা খাড়া ব্যবহার করে থাকে। তাক্কালের সাহায্যে কাটা, কুচানো, গর্তকরা ইত্যাদি কাজ সম্পাদন করে এবং বাঁশের তৈরি খাড়া বা খাঁচা দড়ির সাহায্যে মাথায় ঝুলিয়ে এবং পিঠের ওপর করে পরিবহণের জন্য বহুল ব্যবহৃত হয়।

মাছ রিয়াংদের খুবই প্রিয়, স্থানীয় নদী, ছড়া, ডোবা, জলাভুমি থেকে ফাঁদ পেতে অথবা বিষাক্ত গাছ গাছড়ার সাহায্যে মাছ ধরার অভ্যাস পরিলক্ষিত হয়। রিয়াংরা মাছ ধরার জন্য পলো, ঢেডা এবং জাল ইত্যাদিও ব্যবহার করে থাকে। এ ছাড়া, রিয়াংরা কুছিয়া, কাঁকড়া, শামুক (ঘুগলি), পাহাড়ি কাছিম ইত্যাদি সংগ্রহ করে খায়। বুনো পশু-পাখি বিশেষ করে শূকর, হরিণ, খরগোস, সজারু, বনমোরগ, পাতিহাঁস ইত্যাদি শিকার করে মাংসের জন্য। রিয়াং সম্প্রদায়ের মধ্যে শূকর, মুরগি, বিড়াল এবং কুকুর পোষার অভ্যাস অধিক পরিলক্ষিত হয়। কোনো কোনো বাড়িতে টিয়া, তোতা, ময়না ইত্যাদি শখের পাখিও পুষতে দেখা যায়।

শূকরের মাংস রিয়াংদের খুবই প্রিয়। যে রিয়াং বাড়িতে যতবেশি সংখ্যক শূকর থাকে, তাকে ততবেশি ধনশালী ব্যক্তি হিসাবে গণ্য করা হয় এবং সমাজে সম্মানও বেশি পায়। রিয়াংরা সাধারণত অধিক সংখ্যায় মোরগ ও মুরগি পুষে থাকে এ ছাড়া, দুই চারটি ছাগলও রিয়াংরা পুষে থাকে। মুরগি এবং ছাগল পূজা-পার্বণে ঠাকুরের কাছে উৎসর্গ করার চিরাচরিত রেওয়াজ রিয়াংদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। প্রতিটি রিয়াং বাড়িতে ২-১টি শিকারী কুকুর এবং বিড়াল দেখা যায়। কুকুর এবং বিড়াল মাংসের জন্য ব্যবহার করা হয় না। বাড়ি পাহারার জন্য এবং নির্জন পাহাড়ি রাস্তায় সঙ্গী হিসাবে শিকারী কুকুর ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে বিড়াল শুধুমাত্র ইঁদুর শিকারের জন্য পোষা হয়।

রিয়াং সম্প্রদায় বংশপরম্পরায় মদ পানে অভ্যস্ত। দেশীয় পদ্ধতিতে ভাত থেকে তৈরী চোলাই মদ রিয়াংদের খুবই প্রিয়। নাচ, গান, পূজা পার্বন, জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ প্রায় সকল আচার অনুষ্ঠানে রিয়াং পরিবারের আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা, ছেলে মেয়ে সকলের মধ্যে মদ পানের রেওয়াজ বিদ্যমান। রিয়াং বাড়িতে অতিথি এবং

আত্মীয়স্বজনদের অভ্যর্থনা এবং সেবা যত্নের জন্য মদ উপাদেয়। মোট কথা মদ ছাড়া রিয়াংদের সামাজিক এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান পূর্ণতা লাভ করে না। এমনকি ঠাকুর দেবতাকেও মদ উৎসর্গ করে সন্তুষ্ট করার রেওয়াজ রিয়াংদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। রিয়াং রমণীরা চোলাই মদ তৈরিতে খুবই পারদর্শী। মদ ব্যতীত রিয়াংরা তামাক সেবনেও অভ্যস্ত। রিয়াংরা বাড়ির আশেপাশে তামাক চাষ করে এবং তামাক পাতা, ডাঁটা ইত্যাদি শুকিয়ে মাতগুড়ের সঙ্গে মিশিয়ে বাঁশের তৈরী বিশেষ ধরণের হুক্কার সাহায্যে তামাক সেবন করে। আজকাল অবশ্য রিয়াং পরিবারে বাজারের তৈরি বিড়ি, সিগারেট ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

রিয়াং মেয়েরা যখন যৌবনে পা দেয় এবং একসঙ্গে দু কলস জল আনতে সক্ষম হয় তখন ধরে নেওয়া হয় বিয়ের বয়স হয়েছে। বিয়ের ব্যাপারে ছেলেদের বয়স স্বাভাবিকভাবে মেয়েদের বয়স অপেক্ষা কয়েক বছর বেশি থাকে। রিয়াং সম্প্রদায় বাল্যবিবাহ পছন্দ করে না। তবে বয়স্ক লোক, বিধবা, বিপত্নীক, বিবাহ-বিচ্ছেদের পর স্ত্রী, পুরষ সকলে পছন্দ মত বিবাহ করতে পারে। রিয়াংদের মধ্যে যে-সকল বিবাহ পদ্ধতি দেখা যায় সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কাজের বিনিময়ে বিবাহ অর্থাৎ "চামারাই কামি"। এই পদ্ধতি অনুযায়ী বর কনের বাপের বাড়িতে কয়েক বছর কায়িক পরিশ্রম করে। আজকাল অবশ্য কাজের বিনিময়ে বিবাহ পদ্ধতির বিকল্প হিসাবে বর কনের মূল্য বাবদ পণ দিয়ে বিবাহ করে থাকে। রিয়াং মেয়েরা যেহেতু খুব পরিশ্রমী এবং জুমচাষ, কৃষিকাজ থেকে শুরু করে বাড়িঘরের সমস্ত কাজ করে থাকে তাই প্রত্যন্ত অঞ্চলে এখনও বর অপেক্ষা কনের মূল্য অধিক এবং রিয়াং মহিলাদের পরিবারের মেরুদণ্ড হিসাবে গণ্য করা হয়। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষিত চাকুরিজীবী রিয়াং, বর বিয়ের যৌতুক হিসাব সাইকেল, ঘড়ি, রেডিও, টি. ভি., মোটর সাইকেল, বাসনপত্র, আসবাবপত্র এবং বিছানা ইত্যাদি দাবী করে কনের পিতার কাছ থেকে উল্টো আদায় করতে দেখা যায়। রিয়াংদের বিয়ে শুধুমাত্র বর-কনের আনন্দ উৎসব নয়, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী সকলে বিয়ের আনন্দ উৎসবে মেতে উঠে। বিয়ের মূল অনুষ্ঠান সূর্য উদয়ের আগে কনের বাড়িতে শুরু হয়। বিয়ের দিন বিয়ে বাড়ি উৎসবে মেতে উঠে। সকলে ভূরিভোজ এবং আকণ্ঠ মদ্যপানে, গল্পগুজবে, হাসি ঠাট্টায় আনন্দ উপভোগ করে। বিয়ের দিন প্রত্যূষে বরের বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনেরা গান গায়, বাঁশী বাজায় এবং অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র বাজায়। এই সময় নিমন্ত্রিত গ্রামবাসীরা ও বিয়ের আনন্দ উপভোগ করার জন্য কনের বাড়িতে ভীড় করে। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, রিয়াংদের বিয়ের মধ্যে বর কনে কখনও একসঙ্গে মুখোমুখী হয় না। কনে বিয়ের সময় বর থেকে দূরে থাকে। ওঝাই বা পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণ করে বিয়ের কাজ সম্পাদন করে। রিয়াং বিয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বর-কনের আত্মারবন্ধন এবং পিতামাতা ও গুরুজনদের আশীর্বাদ গ্রহণ করা।

প্রাচীনকালে রিয়াং উপজাতি পাড়ায় অবিবাহিত যুবকদের জন্য বহু শয্যাবিশিষ্ট

একটি শয়নাগার নির্মাণ করা হত। এই বিশ্রামাগার ''ডুয়াইংনক'' যুবকদের আড্ডার স্থান হিসাবে কাজ করত এবং পাড়ার সকল যুবক একসঙ্গে ঐ শয়নাগারে শয়ন করত এবং একজন বয়স্কের তত্ত্বাবধানে থাকতো অবিবাহিত যুবকেরা। যুবকেরা গল্পগুজব, গান, বাজনা, খেলাধূলা ইত্যাদির মধ্যে বিশ্রামাগারে সময় কাটাতো এবং প্রয়োজনে গ্রামরক্ষী বাহিনীর কাজ সম্পাদন করতো। তবে আজকাল এই ডুয়াইংনক দেখা যায় না।

রিয়াং নৃত্যকলার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, মেয়েদের শরীরের ভারসাম্য বজায় রেখে মাথায় একটি বোতলের ওপর একটি কেরোসিনের বাতি জ্বালিয়ে মাটির কলসির ওপর দাঁড়িয়ে হাতে থালা, বাঁশের তৈরি ডালা ইত্যাদি দিয়ে বিভিন্ন কলাকৌশল প্রদর্শন করা। এছাড়া রিয়াং নৃত্য ও গানের মধ্যে দেখা যায়, বুনো সব্জি সংগ্রহ করা, বন্য পশু-পাখি শিকার করা, জুম কাটা, জুম বপন, জুমের আগাছা নিয়ন্ত্রণ, জুমফসল বন্যশূকর, বুনো হাতি ও অন্যান্য কৃষিশত্রুর হাত থেকে রক্ষা করা, ফসল তোলা, ফসল মাড়াই ঝাড়াই ইত্যাদি।

রিয়াং মেয়েরা কাপড় বোনার কাজে খুবই পারদর্শী। মেয়েরা জুমের তুলো সংগ্রহ করা, তুলোর বীজ আঁশ থেকে আলাদা করা, সুতা পাকানো, সুতা রঙ করা, নক্সা করা এবং পরিবারের সকলের কাপড় বোনার কোমর তাঁতের দ্বারা নিজেদের হাতেই করে থাকে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে রিয়াং মেয়েদের কাপড় বোনার নিপুণতা আজও ভাল বর পাওয়ার জন্য অত্যাবশ্যকীয় গুণ হিসাবে গণ্য হয়। প্রত্যন্ত অঞ্চলে পাঁচ-ছয় বছর বয়স পর্যন্ত রিয়াং ছেলেমেয়েরা উলঙ্গ ঘোরাফেরা করে। দশ-বার বয়স পর্যন্ত রিয়াং ছেলেরা লেঙটি বা কটি বস্ত্র পড়ে এবং মেয়েরা কোমরের চারপাশে জড়িয়ে ''রিতুক''পরিধান করে। তবে আজকাল ছেলেমেয়েরা প্যান্ট এবং জামা পরে স্কুলে যায়। রিয়াং যুবক এবং বয়স্ক পুরুষেরা কোমরের চার পাশে জড়িয়ে হাঁটুর ওপর পর্যন্ত কাপড় পরে, গায়ে সাদা গেঞ্জি মাথায় একটি সাদা গামছা বাঁধে। শিক্ষিত রিয়াং যুবকেরা বর্তমানে ফুলপ্যান্ট এবং রঙ বেরঙের সার্ট, গেঞ্জি পরিধান করে। রিয়াং যুবতী এবং মহিলারা কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত জড়িয়ে হাতে বোনা পাছড়া ''রিনাই'' অথবা ''র‍্যানাই'' এবং বুকের ওপর জড়িয়ে পিঠে গিট দিয়ে সুনক্সাপূর্ণ কারুকার্য খচিত ''আরসা'' পরে। তবে আজকাল বেশির ভাগ যুবতী আরসার পরিবর্তে বাজারের রেডিমেড ব্লাউজ পরিধান করে বয়স্ক মহিলাদের এখনও রিনাই এবং আরসা পরতে দেখা যায়।

প্রাচীনকালে রিয়াং পুরুষ এবং মেয়েরা অলংকার পরতো তবে আজকাল শুধুমাত্র মেয়েরা অলংকার পরিধান করে। প্রাচীনকালে কাঠ, বাঁশ, জন্তুজানোয়ারের দাঁত, শিং, হাঁড় ইত্যাদির অলংকার ব্যবহার করতো। পরবর্তী সময়ে রূপার অথবা অন্যান্য ধাতু নির্মিত অলংকার পুরাতন প্রাকৃতিক অলংকারগুলিকে অপসারিত করে। রিয়াং মেয়েরা কানের ওপর, মধ্য এবং নীচে তিন স্থানে দুল পরিধান করে। গলায় রূপার অথবা

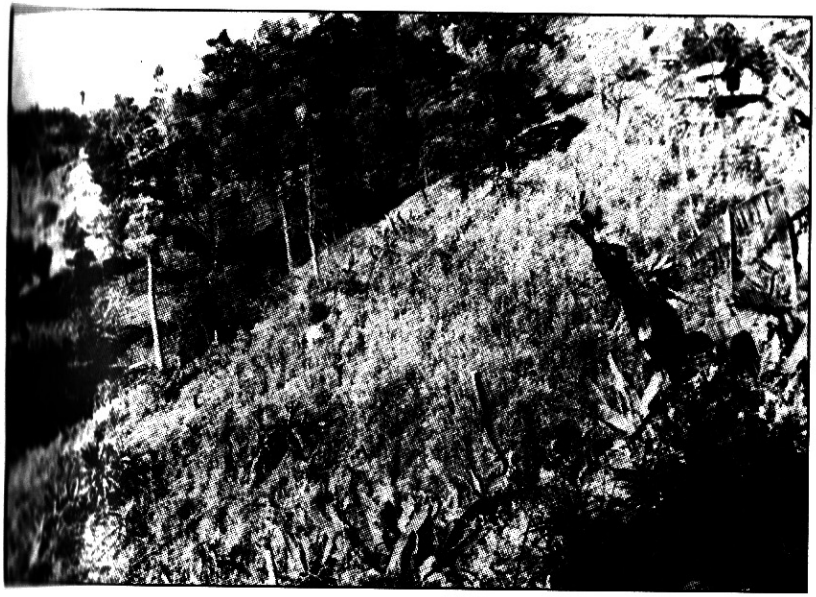

পাহাড়ের ঢালে জুমের টংঘর (গাইরিং)

ত্রিপুরী উপজাতির পূজা

ধাতব টাকার হার পরিধান করে। এছাড়া অনেকে গলায় পুঁতির মালাও পরিধান করে। হাতে রূপার বাজু, চুড়ি, বালা ইত্যাদি এবং পায়ের গোড়ালির ওপর খাড়ু পড়ে। মেয়েরা চুলের মধ্যে সজারুর কাঁটা ব্যবহার করে চুল বাঁধে।

রোগ-শোকের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য রিয়াং সম্প্রদায় আজও পূজা পার্বণ এবং তন্ত্রমন্ত্রের ওপর বিশ্বাসী। রিয়াংদের দেবদেবীর পূজা পার্বণের জন্য নির্দিষ্ট কোনো মন্দির বা স্থান নেই। তবে নদী অথবা ছড়ার পাড়ে, স্নানের ঘাটে, জুম প্লটে, দুই রাস্তার সংযোগ স্থলে, টংঘরে ওঠার সিঁড়ির নীচে, গোলাঘরে, দুই পাহাড়ের সংযোগ স্থলের সরু গলা চিপায়, বড় বট, অশ্বত্থ গাছের তলায় রিয়াংরা বিভিন্ন পূজার কাজ নিষ্ঠা ও ভক্তি সহকারে সম্পাদন করে। রিয়াংদের দেবদেবীর তেমন বিশেষ প্রতিকৃতি বা মূর্তি না থাকলেও কাঁচা মুলি বাঁশের খণ্ড পুঁতে বাঁশপাতা, ফুল ইত্যাদি দিয়ে দেবদেবীর প্রতিকৃতি তৈরি করা হয়। পূজার সময় ফল, ফুল, পাতা, মদ, ক্ষারজল, তূলা, ধান, সরিষা, হলুদ, হাঁস মুরগির ডিম, শূকর, মোরগ, হাঁস, পাঠা, মহিষ ইত্যাদি দেবদেবীকে তুষ্ট করার জন্য উৎসর্গ করা হয়। রিয়াংদের পুরোহিত "আকাই" অথবা "ওঝাই"। তিনি রিয়াংদের হিতাকাঙ্ক্ষী, বন্ধু, গুরু এবং সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনায় সাদা পূজা পার্বনের কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পাদন করে থাকেন। রিয়াংদের বিভিন্ন দেবদেবীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—বুরাহা (বনদেবতা), হাইচুক্‌মা (বনদেবী), লংদ্রাই মৗতাই (হাতির দেবতা), বিলাওরি মৗতাই (বাঘের দেবতা), বিনাইগার মৗতাই (ভাল্লুকের দেবতা), তুইবুমা মৗতাই (গঙ্গাদেবী), মাইনুকমা (ধানের দেবী), মাই কাছমমা (ধান বীজের দেবী), খৌনুকুমা (তূলোর দেবী) , লাম্প্রা (ভালবাসা এবং বিবাহের দেবতা), এছাড়া রিয়াং পাড়াকে অমঙ্গলের হাত থেকে রক্ষা করা এবং সমৃদ্ধির জন্য ফাল্গুন চৈত্র মাসে কের পূজা, বৈশাখের প্রথম সপ্তাহে বাবা গড়িয়া ঠাকুরের পূজা, আশ্বিন-কার্তিক মাসের পূর্ণিমায় কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা করা হয়। দীপাবলির সময় উদয়পুরে ত্রিপুরাসুন্দরীর পূজায়, পৌষ-সংক্রান্তিতে গোমতী নদীর তীর্থমুখে স্নান পর্ব এবং বর্ষাকালে পুরাতন আগরতলায় চৌদ্দদেবতার পূজায় রিয়াং সম্প্রদায় স্বতস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহণ করে।

প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী রিয়াং, উপজাতি সম্প্রদায় খাদ্য উপযোগী বিভিন্ন বুনো উদ্ভিদ শিকারী জীবনযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য এখনও আদিম চিরাচরিত জুম চাষ পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল। জুমচাষকে রিয়াং ভাষায় বলে তাংমি। জুম চাষ পদ্ধতিতে প্রধান কাজগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ (১) জমি নির্বাচন, (২) নির্বাচিত জমির বন জঙ্গল কাটা (৩) কাটা বন জঙ্গল নির্বাচিত জমির মধ্যে শুকনো বনজঙ্গল পোড়ানো (৫) পোড়ানোর পর পরিত্যক্ত বন জঙ্গল পরিষ্কার করা (৬) বীজ বপন (৭) আগাছা নিয়ন্ত্রণ (৮) জুম ফসল পাহারা দেওয়া (৯) আচারপূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান সহ ফসল তোলা (১০) ফসল মাড়াই, ঝাড়াই এবং শুকনো (১১) মজুদ করা (১২) বাজারজাতকরণ।

জুমচাষের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল টাক্কাল (Chopper)

কাস্তে (Sickle) এবং স্থানীয়ভাবে তৈরি বিশেষ ধরণের বাঁশের ঝুড়ি (Bamboo busket) "তুইলাঙ্গা", "নাওখাই", "ডিংউরা" ইত্যাদি। জুমের জমি নির্বাচনের জন্য সাধারণত বর্ষার পর থেকেই জুমিয়ারা পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায়। প্রাথমিক ভাবে বাছাইকৃত এলাকার চারপাশে কিছুদূর পর পর বাঁশের খুঁটি পুঁতে তার মাথায় আড়াআড়ি দুই টুকরো বাঁশ বেঁধে ক্রস চিহ্ন তৈরি করে এবং নির্বাচিত জমির স্বত্ব অন্যদের অবহিত করে। জুমের জমি নির্বাচন এবং জায়গা দখলের এই চিরাচরিত পদ্ধতি পর্বত সন্তানরা নির্বিচারে মেনে চলে। জুম চাষের জন্য জমি নির্বাচন পর্ব সাধারণত অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে শেষ করা হয়। রিয়াং উপজাতি সম্প্রদায় জুম চাষের জমি নির্বাচনের সময় যে-সকল বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেয় তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বাঁশবন অথবা গভীর জঙ্গল। একস্থানে একবছর জুম চাষ করার পর ঐ জমি কয়েক বছর ফাঁকা ফেলে রাখা হয়। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, জুম চাষের জমির খোঁজে রিয়াং উপজাতি পরিবারগুলি প্রায়ই অন্যত্র বাসস্থান পরিবর্তন করে থাকে। এই জন্য জুমচাষের অন্যনাম স্থান পরিবর্তিত চাষ (Shifting cultivation)। কয়েক বছর পর ঐ স্থান আবার বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ হয় এবং যে কোনো উপজাতি পরিবার ঐ স্থানে পুনরায় জুম চাষ করতে পারে। নির্দিষ্ট জমিতে দুবার জুম চাষের মধ্যবর্তী সময় অর্থাৎ বছরগুলি হিসাব করে জুম চক্র (Jhuming Cycle) নির্ণয় করা হয়। নির্দিষ্ট জমির জুম চক্র যতবেশি হয় জুম ফসল তত বেশি ভাল হয়। আগে নির্দিষ্ট জমির জুম চক্র ১০-১৫ বছর ছিল কিন্তু বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য জুমচক্র কমে যাচ্ছে। ফলে, জুমের ফলন আগের মত পাওয়া যাচ্ছে না।

জুমের জমি নির্বাচনের সময় রিয়াং সম্প্রদায় ভাবী শুভাশুভ পর্যবেক্ষণ করে থাকে। এই কাজের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত জুমের জমির অল্প পরিমাণ জঙ্গল পরিষ্কার করে একটি বাঁশের টুকরো লম্বালম্বি চিড়ে দুটি ফালি করা হয়। এই বাঁশের ফালি দুটি একসঙ্গে ধরে উপর থেকে মাটিতে ছেড়ে দেওয়া হয় যদি বাঁশের একটি ফালি উপুড় হয়ে এবং অপরটি চিৎ হয়ে মাটিতে অবস্থান করে তবে ঐ স্থান জুম চাষের জন্য শুভ ধরে নেওয়া হয়। এই পদ্ধতি পর পর তিন বার অনুসরণ করা হয়। যদি কোনো প্রকার সন্দেহ হয় তবে ঐ স্থানে রিয়াং সম্প্রদায় জুম চাষে বিরত থাকে। এ ছাড়াও প্রাথমিক ভাবে নির্বাচিত জুমের জমি থেকে একটি মাটির দলা বাড়ি নিয়ে আসা হয়। জুমচাষী, বিশেষ করে বাড়ির কর্তা রাত্রিবেলায় পরিষ্কার কাপড় পরিধান করে একটা বালিশের নীচে সংগৃহীত মাটি রেখে ঘুমাবে। যদি রাত্রে জুমচাষী মহিষ, গবাধিপশু, বিবাহ উৎসব, পরিষ্কার জল, মাছ ধরার দৃশ্য ইত্যাদি স্বপ্নে দেখে তবে ঐ স্থানে জুম চাষ লাভজনক হবে বলে ধারণা করা হয়। অন্যদিকে উলঙ্গ মহিলা, আগুন, পুলিশ অথবা ভিক্ষুক ইত্যাদি যদি স্বপ্নে দেখে তবে ঐ স্থানে জুম চাষে সম্ভাব্য লোকসান হবে এমন ধারণা পোষণ করা হয়। আবার জুমচাষের জমি নির্বাচনের সময় যদি কেউ দেখে হরিণ বনের মাটি খায় তবে ঐ জমিতে জুম চাষ করবে না। কারণ,

জুমিয়াদের ধারণা ঐ জমিতে জুম চাষ করা হলে ঐ জুমিয়া পরিবারে যে কোন প্রকার অঘটন ঘটবে। এছাড়াও যদি নির্বাচিত জমিতে গভীর এবং সরু সুড়ঙ্গ বিদ্যমান থাকে অথবা অজগর সাপ মারা গিয়ে থাকে অথবা ডাইনি এবং দুষ্ট আত্মার আনাগোনা আছে এমন সন্দেহ হয়, তবে ঐ স্থান রিয়াং উপজাতি জুমচাষের জন্য নির্বাচন করে না। জুমের জমি নির্বাচনে এই ধরণের আচার-অনুষ্ঠানগুলিকে রিয়াং ভাষায় বলা হয় ''ভক ওখা কাইম্মি''।

সুষ্ঠুভাবে জুমচাষের জমি নির্বাচনের পর্ব শেষ হলে শুরু হয় ঐ স্থানের ঝোপঝাড়, বাঁশ, ছোট থেকে মাঝারি আকারের গাছ ইত্যাদি কেটে, ভুপাতিত করা এবং প্রায় এক মাস সময় পর্যন্ত কাটা গাছ, বাঁশ, ঝোপঝাড়, বুনো কলাগাছ। ইত্যাদি উত্তম ভাবে শুকানো হয়। জুমচাষের জমিতে খুব বড় গাছগুলি প্রয়োজন ব্যতীত কাটা হয় না, স্থানে স্থানে দুই চারটি বড়গাছ জুমের জমিতে রেখে দেওয়া হয়। কাটা বনজঙ্গল ভাল ভাবে শুকানোর পর সন্ধ্যা সময় জুমে আগুন দেওয়া হয়। জুমে আগুন দেওয়ার পর পরিত্যক্ত গাছের কান্ড, গুঁড়ি, যেগুলি সম্পূর্ণ পোড়া যায় না সেগুলি স্থানে স্থানে স্তূপীকৃত করে প্রয়োজনে আগুনে পোড়ানো হয়। মাটির মধ্যে পড়ে থাকা ছাই সারের কাজ করে। জুম চাষে জুমিয়া চাষীভাইয়েরা অন্য কোনোপ্রকার সার ব্যবহার করতো না।

রিয়াং উপজাতি সম্প্রদায় জুমের আগুন দেওয়ার আগে বনদেবতা ''বুরাহা'' এবং বনদেবী ''হাইছুকমা''র পূজা করে থাকে। এ ছাড়া, ধানের দেবতা ''মাইনুকমা''র পূজা'ও এই সময়ে সম্পাদন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে একটি হাতপাখা, সামান্য পরিমাণ তিলের তেল, তুলো এবং একটি বাঁশের তৈরি ছোট খাঁচা ''মাইছাম'' শুকনো কাটা বনজঙ্গলের মধ্যে ছুড়ে উৎসর্গ করা হয়। রিয়াং উপজাতি জুমিয়াদের ধারণা এইগুলি উৎসর্গ করা হলে ধরিত্রীমা আগুনের তেজ থেকে পরিত্রাণ পায়। উপজাতি সম্প্রদায় জুমের জমিতে একসঙ্গে বিভিন্ন ধরণের ফসলের বীজ বপন করে থাকে। জুমের মিশ্র ফসলগুলির মধ্যে প্রধান ফসল হল ধান (মাই)। জুমের ধানের বিভিন্ন জাতগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল---লাল গেলং, বেতি, সাদা গেলং গারো মালতি, মাইমি কপ্রুর, ডিলং মৌচক, মাইমি গুড়িয়া, মধুমালতি, কিসকী বাদাম, তারুকামাই, মাখুমাইমাকাল, রেনডিল, কাজলী, চিনাল, মাইদানী, বাতিরা, বিনি, কফরুক, আম্রিকা, মাইগুড়ি ইত্যাদি। জুম ধানের বীজের পরিমাণ একর প্রতি ২৫-৩০ কিলোগ্রাম বপন করা হয়। সরু এবং ছোট আকৃতির ধান পরিমাণে কম এবং মোটা ও বড় আকৃতির ধান পরিমাণে বেশি প্রয়োজন হয়। জুমের অন্যান্য ফসল গুলির মধ্যে আছে বেগুন (ফানতাও), সিম (কাছাই), বরবটী (সাবাই), মেস্তা (মেস্তা), তুলা (খৌ), কচু (ইয়াকচু) কুমড়ো (মুইতাও), শশা (শশা), ঢ্যাঁড়স (মুরিশা),ভুট্টা (মকানডা), লংকা (মার্চাল), চাল কুমড়া (খাকলু), তিল (সিপিং) ইত্যাদি।

জুম চাষের জন্য নির্বাচিত জমির বনজঙ্গল কেটে পোড়ানোর পর মাটিতে কোনো প্রকার লাঙল, মই, কোদাল ইত্যাদি ব্যবহার করা হয় না। লৌহ নির্মিত 'টাক্কাল'

যার অগ্রভাগ এবং পাশের এক ধার ধারালো, এমন হাতিয়ারের সাহায্যে মাটির মধ্যে প্রায় ৫ সেমি. গভীর এবং প্রায় ২০ সেমি. পরপর ছোট গর্ত করে চৈত্র-বৈশাখ মাসে জুম ফসলের মিশ্র বীজ এক সঙ্গে বপন করা হয়। জুমের বীজ বপনের সময় একই লাইনে পর পর পুরুষ মহিলা বেশ কয়েক জন দাঁড়ায়। প্রত্যেকের সঙ্গে একটি ''টাক্কাল'' এবং কোমড়ের বাম পাশে একটি ছোট বাঁশের খাঁচা বাঁধা থাকে, এই খাঁচার মধ্যে জুম ফসলের বিভিন্ন বীজ নির্দিষ্ট অনুপাতে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। রিয়াং ভাষায় পুরুষ এবং মহিলারা যে বাঁশের খাঁচা ব্যবহার করে সেগুলিকে বলে যথাক্রমে ''কাইসনি'' এবং ''ছিমপাই''। ডান হাতে টাক্কালের অগ্রভাগ মাটিতে ঢুকিয়ে যে গর্ত করা হয় তার মধ্যে বাম হাতের সাহায্যে কোমরে বাঁধা বাঁশের খাঁচা থেকে মিশ্র জুম ফসলের বীজ ৩-৪টি প্রতি গর্তে বপন করা হয় এবং পায়ের সাহায্যে হালকা ভাবে মাটি চাপা দেওয়া হয়। এই ভাবে সুশৃঙ্খল সারিবদ্ধ ভাবে জুম বীজ বপনের সময় প্রত্যেকে যার যার সামনের জায়গায় বীজ বপনের সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের উপর থেকে নীচে নামে এবং পুনরায় নীচ থেকে উপরের দিকে ওঠে। এই পদ্ধতির অনুসরণ চলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত নির্দিষ্ট জুমের এলাকায় বীজ বপনের কাজ শেষ না হয়। রিয়াং সম্প্রদায়ের মধ্যে সোম, বুধ এবং বৃহস্পতিবার জুম বীজ বপন শুরু করার শুভদিন এবং আশাব্যঞ্জক দিন হিসাবে গণ্য হয়। এ ছাড়াও, জুমের জমির মধ্যে যেন কোনো প্রকার অশুভ আত্মা, ডাইনি ইত্যাদি প্রবেশ করে ফসলের ক্ষতি করতে না পারে তার জন্য জমির দক্ষিণ-পূর্ব কোণে এক টুকরো কাঁচা হলুদ রোপণ জুম রোপণের কাজের বিশেষ অঙ্গ হিসাবে রিয়াং সম্প্রদায় পালন করে থাকে। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন জুম চাষে স্বল্প মেয়াদী ধান (চিনাল) অল্প পরিমাণে চৈত্র মাসের মধ্যে বপন করে একে বলে ''হাখা'' বা ছোট জুম। পরবর্তী সময়ে বৈশাখের প্রথম পক্ষকালে যে জুম ফসল বপন করা হয় তাকে বলে ''হুকতর'' বা বড় জুম। ''হাখা'' র ফসল বর্ষাকালে ঘরে তোলা হয়। এই সময় জুমিয়াদের অভাব অনটন বেশি হয় তাই জুমের টংঘরে ছোট জুমের ফসল খেয়ে জুমিয়া পরিবার পরবর্তী সময় বড় জুম (হুকতর) ফসল ঘরে তোলে।

জুমে বীজ বপনের তিন সপ্তাহের মধ্যে চারা গজিয়ে মাটির ওপর উঠে আসে। এই সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রাক মৌসুমি বৃষ্টি শুরু হয়, ফলে জুমের ফসলের সাথে সাথে বিভিন্ন ধরনের বুনো লতা, ঘাস, বাঁশ ইত্যাদি আগাছা পর্যাপ্ত পরিমাণে গজায়। তাই প্রয়োজন অনুসারে তিন-চার বার জুমে আগাছা বাছাই করে নিয়ন্ত্রণ করা অত্যাবশ্যকীয় করণীয়। রিয়াং ভাষায় প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ বার আগাছা নিয়ন্ত্রণ কার্য সম্পাদন করাকে যথাক্রমে হাগরা তাংমী, মিয়াণ্ড তাংমী, কারমানী এবং খুলমাওমী বলা হয়। জুমের আগাছা নিয়ন্ত্রণের কাজে পুরুষ, মহিলা, যুবক যুবতী সকলে অংশ গ্রহণ করে এবং বেশ আনন্দ উল্লাসের মধ্যে কাজ সম্পাদন করে। জুমে

জুমিয়া নৃত্য

শেষ বারের মত আগাছা নিয়ন্ত্রণ ভাদ্র-আশ্বিন মাসের মধ্যে করা হয়। জুম বপনের পর ফসলের রক্ষণাবেক্ষণ করার উদ্দেশ্যে পাহারার ব্যবস্থা ও এই সময়ে করা হয়। জুম ফসল পর্যবেক্ষণ করার উদ্দেশ্যে পাহারার ব্যবস্থা ও এই সময়ে করা হয়। জুম ফসল পর্যবেক্ষণ করার লক্ষ্যে দুই চালবিশিষ্ট বাঁশের মাচার উপর একটি টংঘর বাঁশের বেড়া এবং ছনের ছাউনি দিয়ে তৈরি করা হয়। জুমের জমির মধ্যে বিভিন্ন স্থানে কিছু সংখ্যক আধ চিড়া বাঁশ পুঁতে একটি দড়ির সাহায্যে সংযোগ করে টং ঘরে বসে পাহারাদার প্রয়োজন অনুসারে দড়ি টেনে টেনে শব্দ করে এবং পাখি ও বন্যপ্রাণী তাড়ায়। এই সময়ে বনদেবতা (বুরাহা), বনদেবী (হাইছুকমা), ধানের দেবী (মাইনুকমা, তুলোরদেবী (খৌনুকমা), গঙ্গাদেবী (তুইমা) ইত্যাদি সকল দেবদেবীর পূজা করা হয় বিশেষ করে জুম ফসল রক্ষণাবেক্ষণ এবং ভাল ফলনের জন্য। জুমের সমস্ত ফসল একসঙ্গে পরিপক্ক হয় না। আষাঢ় থেকে আশ্বিন-কার্তিক মাস পর্যন্ত ফসল তোলার কাজ চলে। কুষ্মাণ্ড গোত্রের ফসল যেমন শশা, চিনার, মারমা ইত্যাদি আষাঢ় মাস থেকে সংগ্রহ করা হয়। ধান শ্রাবণ-ভাদ্র নাগাদ পাকে। যে কোন নূতন ফসল তোলার পর দেবদেবীকে উৎসর্গ না করে রিয়াং সম্প্রদায় গ্রহণ করে না। জুম ধান কাটার একটি বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় হল কাস্তের সাহায্যে ধানের ছড়ার প্রায় পাঁচ সেমি. নীচে কেটে পিঠে ঝুলানো বিশেষ ধরণের বাঁশের খাঁচায় সংগ্রহ করা হয়। ফসল তোলার পর জুমের টংঘরে অল্প সময়ের জন্য মজুদ করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে জুমের জমির মধ্যেই ধান মাড়াই এবং ঝাড়াইয়ের ব্যবস্থা করা হয়। তারপর বসতবাড়ির আশপাশে গ্রামের মধ্যে গোলাঘরে (মাইনৌক) জুম ধান মজুদ করা হয়। অথবা বাঁশের তৈরি ঢোলের মধ্যে আগামীদিনের জন্য সঞ্চয় করা হয়। রিয়াং সম্প্রদায় যদিও জুম চাষে সমষ্টিগত ভাবে শ্রম প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করে থাকে কিন্তু জুমের ফসল সকলের মধ্যে ভাগ বণ্টন করা হয় না। সমষ্টিগত ভাবে জুম চাষ শ্রম প্রদানকারীকে কোন প্রকার খাওয়ার বা টাকা পয়সা দেওয়া হত না। প্রয়োজনে বিড়ি, তামাক, পান ইত্যাদি সরবরাহ করা হত। অর্থাৎ আগে জুম চাষে শ্রম বিক্রি হত না, শুধুমাত্র বিনিময় হতো। কিন্তু আজকাল বড় জুমচাষীদের দৈনিক হাজিরায় শ্রমিক নিযুক্ত করে জুম চাষ করতে দেখা যায়। আগেকার দিনে জুম চাষে যৌথ শ্রম আদান প্রদানের দ্বারা বিভিন্ন ধরণের গান, গল্প, হাস্যকৌতুক ইত্যাদির মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ করতো।

ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯৮৭ সনের হিসাব অনুসারে রিয়াং উপজাতি জুমিয়ার পরিসংখ্যান নিম্নরূপ ঃ

সম্পূর্ণ জুমিয়া অথবা গোঁড়া জুমিয়া পরিবারের সংখ্যা	= ৬,৩৫৬
অংশিক জুমিয়া পরিবারের সংখ্যা	= ৭,৪৪৫
মোট জুমিয়া পরিবারের সংখ্যা	= ১৩,৮০১

জুমিয়া জনসংখ্যা ঃ

(ক) পুরুষ	=	২৫,৩৪৪
(খ) মহিলা	=	২৪,৪৯৬
(গ) শিশু	=	২৪,০৫১
মোট (ক) + (খ) + (গ)	=	৭৩,৮৯১

এ ছাড়া, বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যের সমতলে বসবাসকারী অল্প সংখ্যক রিয়াং উপজাতি সম্প্রদায় জুম চাষের ওপর নির্ভরশীল নয়। আজকাল সমতলে বসবাসে অভ্যস্ত অনেক রিয়াং পরিবার লাঙ্গল, পাওয়ার টিলার ইত্যাদির দ্বারা জমি চাষ করে থাকে। অনেকে জমিতে রাসায়নিক সার, ফসলের রোগ পোকার ঔষধ এবং উন্নত কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করতে সক্ষম। ত্রিপুরার রাজ্যে প্রায় ১০০ বছর আগে লাঙ্গল দ্বারা চাষ আবাদ শুরু হলেও বেশির ভাগ জুমিয়া লাঙ্গল দ্বারা চাষ আবাদের বিপক্ষে কারণ তাদের মতে জুম চাষ পদ্ধতি খুব সহজ এবং সরল। সমতল চাষে নানা ধরণের কৃষি যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়, কিন্তু জুম চাষে ব্যবহৃত কৃষি যন্ত্রপাতির সংখ্যা খুবই কম। জুম চাষে গরু, মহিষ ইত্যাদির প্রয়োজন নেই, কিন্তু লাঙ্গল চাষে গরু, মহিষ ইত্যাদিকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে মাঠে চাষের কাজে ব্যবহার করার উপযোগী করে তোলা জুমিয়া উপজাতিদের পক্ষে কষ্ট সাধ্য ব্যাপার। তা ছাড়া, জুমচাষের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট জমি থেকে জুমিয়া পরিবারের প্রয়োজনীয় সারাবছরের সমস্ত ফসল তোলা সম্ভব। কিন্তু সমতলে লাঙ্গল দ্বারা চাষ আবাদের মাধ্যমে নির্দিষ্ট জমি থেকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে একটি মাত্র ফসল এক বারে তোলা হয়। অন্যদিকে সমতল চাষ আবাদে বর্ষা এবং শীতের সময় কাদার মধ্যে ধানের চারা রোপণ, আগাছা নিয়ন্ত্রণ, সার, রোগ-পোকার ঔষধ ব্যবহার ইত্যাদি কাজে উপজাতি জুমিয়ারা অভ্যস্ত নয় এবং এই ধরণের কাজ করতে তারা পছন্দ করে না। জুম চাষ পদ্ধতির মাধ্যমে জুমিয়া পরিবারগুলি খাদ্যশস্য, ডালশস্য, তৈলবীজ, তন্তুজাতীয় ফসল, শাকসবজি, মশলা, কন্দজাতীয় ফসল ইত্যাদির সুনির্দিষ্ট বপন রোপণ প্রক্রিয়ার সমন্বয় সাধন করে যা বিজ্ঞানসম্মত চাষ পদ্ধতি বলা চলে। কারণ, গভীর এবং অগভীর মূলযুক্ত ফসল, দীর্ঘমেয়াদী এবং স্বল্পমেয়াদী, মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির সহায়ক এমন ফসল চাষের সুশৃঙ্খল সমন্বয় সাধন এবং সারা বছর জুমিয়া পরিবার নির্দিষ্ট জমি থেকে খাদ্যের সংস্থান এবং কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে জুম চাষের সুদূরপ্রসারী কুফল, বিশেষ করে বনায়ন ধ্বংস, ভূমিক্ষয়, উদ্ভিদ খাদ্যের অপচয়, বন্যা, খরা ইত্যাদি সমস্যা এড়ানোর জন্য জুমচাষের বিকল্প টেকসই চাষবাষ, পশুপালন, মৎস্যচাষ ইত্যাদির মাধ্যমে জুমিয়া পুনর্বাসনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে।

উত্তর-পূর্ব ভারতে জুম চাষ খ্রিস্টপূর্ব ৭০০০ বৎসর আগে মানুষ যখন পাথরে অস্ত্র ব্যবহার করে শিকারী জীবন যাপন থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ অথবা উৎপাদন শুরু

করে সেই সময় থেকে চলে আসছে। গোঁড়া জুমিয়া (Hard core) পরিবারগুলিকে পুনর্বাসন প্রকল্পের মাধ্যমে স্থায়ী টেকসই চাষ আবাদে অভ্যস্ত করা খুবই কষ্ট সাধ্য ব্যাপার। কারণ, জুমচাষ জুমিয়া পরিবারে জীবনধারা, কৃষ্টি এবং সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। বেশির ভাগ গোঁড়া জুমিয়া তাঁদের সামাজিক রীতিনীতি এবং জীবন ধারা থেকে নড়তে নারাজ, এমনকি গোঁড়া জুমিয়ারা খোলাখুলি ভাবে কথাবার্তা বলতেও নারাজ। তারা নগদ অর্থ ব্যতীত অন্যান্য কৃষি উৎপাদন সহায়ক সামগ্রী ও প্রযুক্তি গ্রহণে ও অনিচ্ছুক। তাই জুম চাষকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে শুধুমাত্র কৃষি, উদ্যান, বাগিচা ফসল, পশুপালন, মৎস্যচাষ, ক্ষুদ্রশিল্প, কুটির শিল্পের মাধ্যমে গোঁড়া জুমিয়া পরিবারগুলিকে পুনর্বাসন করা সুষ্ঠুভাবে সম্ভবপর হয় নাই। বর্তমানে প্রয়োজন প্রকৃত গোঁড়া জুমিয়া পরিবারগুলিকে সঠিক ভাবে সনাক্ত করা এবং জুমিয়া পাড়ায় অর্থাৎ জুমিয়ারা বর্তমানে যে স্থানে বসবাস করে সেখানের স্থানীয় সম্পদের সমীক্ষা করে জুমিয়াদের নিজস্ব আবাসস্থলে নিজস্ব সামাজিক রীতিনীতি, কৃষ্টি বজায় রেখে স্থায়ী ভাবে বসবাসের লক্ষ্যে জুমিয়াদের সঙ্গে সরাসরি আলাপ আলোচনাক্রমে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

জুমিয়াদের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সামগ্রিক পরিকল্পনাকে এলাকা ভিত্তিক ক্ষুদ্র পরিকল্পনায় (Minor Planning) বিভক্ত করা আবশ্যক। ক্ষুদ্র পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় জুমিয়া পাড়া অথবা গ্রামের সম্পদের সমীক্ষা করা, বিশেষ করে গ্রামের ভৌগোলিক অবস্থান, যোগাযোগ ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, স্কুল, হাট-বাজার, নদী, ছড়া, এলাকার মাটির গঠন, গ্রন্থন, বর্তমান ফসল বিশেষ করে উদ্যান-বাগিচা ফসল, বনায়ন, জুম ফসলের এলাকা, জুমিয়া পরিবারের গৃহপালিত পশুপাখির সংখ্যা ইত্যাদির পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে জুমিয়া পাড়ায় জুমিয়া পরিবারগুলি আগামীদিনে কি ভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে চায় তাদের মতামত যাচাই এবং প্রাধান্য দিয়ে বাস্তবসম্মত প্রকল্প প্রণয়ন করে জুমিয়াদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে স্থির করা এবং সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। জুমচাষ যেহেতু এই মুহূর্তে জুমিয়া পরিবারগুলি ছাড়তে নারাজ তাই বিক্ষিপ্তভাবে জুমচাষ না করে বর্তমানে যৌথ অথবা সংঘবদ্ধ ভাবে জুমচাষ পদ্ধতি আরো কিছুদিন অর্থাৎ জুমিয়া পরিবারগুলি যতদিন বিজ্ঞানসম্মত টেকসই চাষ আবাদে অভ্যস্ত হয় ততদিন চালানো যেতে পারে। বর্তমানে উত্তর ত্রিপুরা জেলার রিয়াং সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায় বিক্ষিপ্ত ভাবে জুমচাষ না করে পাড়ার সকলে মিলেমিশে একটি নির্দিষ্ট স্থানে সমবেত ভাবে জুম চাষ করে। এই পদ্ধতিতে জুমিয়া পাড়ার সকলকে জনসংখ্যার ওপর নির্ভর করে ০.৫ — ১.৪ হেক্টর জায়গা জুমচাষের জন্য বরাদ্দ করা হয়। সমবেত বা যৌথ জুমচাষ পদ্ধতির সুবিধা হল সকলের আলাদা মালিকানা স্বত্ব থাকলেও জুমচাষের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম যৌথভাবে সম্পাদন করা সম্ভবপর হয়। বিশেষ করে জুম ফসলের কৃষিশত্রু রোগ-পোকা, ইঁদুর, বন্যপ্রাণীর হাত থেকে ফসল রক্ষা করার ব্যাপারে অধিক সুফল পাওয়া

যায়। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, যৌথ জুমচাষের এলাকায় একই জমিতে প্রথম বছর জুমচাষের পর দ্বিতীয় বছর ধান, শাকসব্জি এবং অন্যান্য ফসল লাভজনক ভাবে চাষ করা যায়। কারণ, এই ক্ষেত্রে উন্নত কৃষি প্রযুক্তি যেমন সার প্রয়োগ এবং জুমফসলের কৃষিশত্রু নিয়ন্ত্রণের জন্য জুমিয়ারা দলেবলে আগ্রহ প্রকাশ করে। তাই বর্তমানে গোঁড়া জুমিয়াদের জন্য পরিবারের লোকসংখ্যা হিসাব করে প্রতি পরিবার পিছু নির্দিষ্ট জুমের এলাকাও চিহ্নিত করে পরিকল্পনায় সংস্থান রাখা প্রয়োজন। যতদিন গোঁড়া জুমিয়া পরিবারগুলি স্থায়ী টেকসই চাষ আবাদে অভ্যস্ত না হয় ততদিন উন্নত পদ্ধতিতে জুম চাষের ব্যবস্থা প্রকল্পে রাখা হলে প্রত্যন্ত অঞ্চলের গোঁড়া জুমিয়া পরিবারগুলি অনাহার অথবা অর্ধাহারের হাত থেকে মুক্তি পাবে।

বাঁশ উপজাতি জুমিয়াদের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। জুমিয়ার হাতের টাক্কাল এবং বাঁশ জীবন নির্বাহের প্রধান সহায়। বাঁশকরুল অভাবের দিনে খাদ্য হিসাবে বহুল ব্যবহৃত হয়। জুমিয়াদের কাছে বাঁশ আর্থিক ফসল (Cash crop) হিসাবে সমাদৃত। কারণ বাঁশ বিক্রি করে অনেক জুমিয়া প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করে থাকে। এ ছাড়া, বাঁশ লাকড়ী হিসাবে, ঘরবাড়ি তৈরি শিল্প কারখানায়, কারুশিল্পে ইত্যাদিতে বহুমুখী ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। বাঁশ ব্যতীত জুমিয়া পরিবার জল ছাড়া মাছের ন্যায় অবস্থার সম্মুখীন হয়। তাই জুমিয়াদের জন্য প্রকল্প প্রণয়নের সময় প্রয়োজনীয় পরিমাণ এলাকায় বাঁশ বাগান গড়ে তোলার এবং সংরক্ষণের ওপর অবশ্য গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক।

রিয়াং সম্প্রদায় প্রাচীনকালে ফল চাষের প্রতি অনীহা প্রকাশ করত, কারণ তাদের ধারণা ছিল আম, কাঁঠাল, জাম, তেঁতুল ইত্যাদি গাছ বড় হয়ে ফল ধরার সময় হলে ফলের বাগানে দুষ্ট প্রেতাত্মা ঘুরে বেড়ায় এবং অশুভ শক্তি পাড়ার অমঙ্গল সাধন করে। এছাড়া জুমিয়া পুনর্বাসন প্রকল্পে দীর্ঘমেয়াদী ফসল বিশেষ করে উদ্যান ও বাগিচা ফসল অন্তর্ভুক্ত করা হলে ও দেখা যায় গাছ রোপণের পর প্রায় ৭-৮ বছর সময় নেয় গাছ ফলবতী হতে। এই দীর্ঘ সময় জুমিয়া পরিবারগুলি আর্থিক অসঙ্গতির কারণে বাগান ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। তাই দীর্ঘমেয়াদী উদ্যান ও বাগিচা ফসল বিশেষ করে নারিকেল, সুপারী, আম, কাঁঠাল, লিচু, সপেদা ইত্যাদির চারা প্রচুর পরিমাণে জুমিয়াদের মধ্যে বিতরণ করা হলে ও তেমন উল্লেখযোগ্য কৃতকার্য পরিলক্ষিত হয় নাই। তাই এই সকল গাছ ফলবতী না হওয়া পর্যন্ত স্বল্পমেয়াদী উদ্যান ফসল; যেমন—আনারস, কলা, পেঁপে, লেবু ইত্যাদি এবং বিভিন্ন কৃষিজ ফসলের সংস্থানও জুমিয়াদের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় ধরা আবশ্যক, যেন জুমিয়া পরিবার পুনর্বাসনের এক দুই বছর পর থেকে নিয়মিত আয়ের সংস্থান পায়। বর্তমানে রিয়াং সম্প্রদায় উদ্যান ফসল বিশেষ করে কলা, পেঁপে, আনারস, কাঁঠাল, পেয়ারা, লিচু, সুপারি, নারিকেল, বেল, কমলালেবু, ইত্যাদি চাষে কিছুটা অভ্যস্ত হয়েছে।

প্রত্যন্ত অঞ্চলে রিয়াং পুরুষ

প্রত্যন্ত অঞ্চলে রিয়াং রমনী

মদ তৈরির সরঞ্জাম

বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে উপজাতি জুমিয়াদের পুনর্বাসনের এবং সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে উপজাতি কল্যাণ দপ্তর, ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ, বনবিভাগ, কৃষি-বিভাগ, উদ্যান ও মাটি সংরক্ষণ দপ্তর, পশুপালন দপ্তর, মৎস্য দপ্তর, শিল্পদপ্তর, সমবায় দপ্তর, আদিম জনজাতি পুনর্বাসন দপ্তর, ত্রিপুরা ফরেস্ট ডেভেলাপমেন্ট কর্পোরেশন, ত্রিপুরা রিহেবিলেটেশন প্ল্যান্টেশন কর্পোরেশন, টি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের প্রকল্প বাস্তবায়নে নিয়োজিত আছে। জুমিয়াদের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়নের সমস্যাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ—

১ নূতন বৃত্তি, পেশা গ্রহণে জুমিয়াদের অনীহা।

২ শিক্ষার অভাব

৩ প্রশিক্ষণের অভাব

৪ জুমিয়া প্রকল্পগুলির ভৌগোলিক অবস্থান এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব।

৫ সমবায়ের ঋণ ফেরত দেওয়ার অক্ষমতা।

৬ জুমিয়া প্রকল্পের আর্থিক সহায়তা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রকল্প এলাকা ছেড়ে নূতন প্রকল্পের খোঁজে অথবা জুমের জমির খোঁজে অন্যত্র সরে যাওয়া।

জুমিয়া প্রকল্পগুলি সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়নের জন্য যে-সকল বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ—

১ প্রকল্প প্রণয়নের আগে জুমিয়াদের পছন্দ অপছন্দ যাচাই করা এবং জুমিয়াদের সঙ্গে আলাপ আলোচনাক্রমে তাদের পছন্দমত স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি হয় এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২ জল বিভাজিকা প্রকল্পভিত্তিক এলাকার সার্বিক উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩ বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে আরো নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করা। বিক্ষিপ্ত ভাবে প্রতিটি দপ্তর প্রকল্প বাস্তবায়ন করলেও, সুষ্ঠ সমন্বয়ের অভাবে প্রকল্প সঠিক পথে পরিচালিত হয় না।

৪ জুমিয়াদের কুসংস্কার দূরীকরণ এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্প্রসারণের ওপর আরও অধিক জোড় দেওয়া প্রয়োজন।

৫ দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প প্রণয়ন করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে প্রথম অবস্থায় যেন প্রকল্প থেকে অন্যান্য পেশার মাধ্যমে আয় করা সম্ভব হয়। যেমন—চা, রবার, কমলা, নারিকেল, সুপারি ইত্যাদি বাগানের সঙ্গে স্বল্পমেয়াদী ফসল যেমন—কলা, আনারস, পেঁপে, সবজি এবং অন্যান্য কৃষিজ ফসল চাষের ব্যবস্থা করা।

৬ জুমিয়াদের উৎপাদিত ফসলের বাজারজাত করণের সমস্যা দূরীকরণ।

৭ উন্নত জাতের মুরগি, শূকর, ইত্যাদি পালনে আকৃষ্ট করা, কারণ জুমিয়ারা দেশী মুরগি ও শূকর পালনে অভ্যস্ত।

৮। তাঁত শিল্প এবং অন্যান্য কুটির শিল্পে উন্নতমানের প্রশিক্ষণ দেওয়া যা জুমিয়াদের সামাজিক ও কৃষ্টির অঙ্গ।

৯। মৎস্যচাষ, মাশরুম চাষ মৌমাছি পালন ইত্যাদি আনুষাঙ্গিক আয়ের সম্ভাব্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১০। বর্তমানে ৯৫ শতাংশ জুমিয়া প্রকল্পে তাদের প্রধান আয়ের জন্য দিন মজুরীর ওপর নির্ভরশীল। প্রকল্পে সারা বছর স্থায়ী কাজের সংস্থান রাখা আবশ্যক।

১১। বনসৃষ্টি এবং সামাজিক বনায়নে জুমিয়াদের আরো বেশি করে আকৃষ্ট করা।

১২। বর্তমানে জুমিয়াদের বেশির ভাগ ফসল বৃষ্টিনির্ভর তাই জলসেচ ব্যবস্থার ওপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

১৩। প্রকল্পে স্থায়ী আয়ের উৎস এবং সঞ্চয়ের ওপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

১৪। পুরাতন জুমিয়া প্রকল্পগুলির সমীক্ষা করে অর্থনৈতিক বুনিয়াদ শক্ত করার জন্য প্রয়োজন ভিত্তিক সহায়ক সামগ্রীর যোগান দিয়ে পুনরুজ্জীবিত করা প্রয়োজন।

১৫। জুমিয়াদের অবসর বিনোদনের জন্য খেলাধূলা, তাদের চিরাচরিত নাচ গান ইত্যাদির ব্যবস্থা করা এবং রেডিও, টি. ভি. ইত্যাদি সরবরাহ করা উচিত।

১৬। জুমিয়া উপজাতিদের স্বনির্ভর কর্মসংস্থান, বিশেষ করে—দর্জি, কামার, ছুতার, রিক্সাচালক, অটোচালক এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির মধ্যে আকৃষ্ট করা।

তৃতীয় অধ্যায়

জমাতিয়া

জমাতিয়া ত্রিপুরার উনিশটি উপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে অন্যতম, প্রধানত দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার উদয়পুর এবং অমরপুর মহকুমায়, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার খোয়াই এবং সদর মহকুমায় অধিক সংখ্যায় বসবাস করে। উপজাতি জনসংখ্যার মধ্যে জমাতিয়া সম্প্রদায় তৃতীয় স্থানে রয়েছে। "জমাতিয়া" শব্দের অর্থ নিয়ে নানা ধরণের মতবাদ প্রচলিত আছে। উর্দু শব্দ "জমাত" এবং বাংলা শব্দ "জমায়েত" এর অর্থ হল একত্রিত হওয়া। ত্রিপুরা রাজ্যে এই উপজাতি জনগোষ্ঠী নির্দিষ্ট এলাকায় একত্রিত বা জমায়েত হয়ে বসবাস করতো বলে "জমাতিয়া" আখ্যা দেওয়া হয় এবং জমাতিয়া উপজাতি সম্প্রদায় হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। অবার এমনও তথ্য পাওয়া যায় যে জমাতিয়া সম্প্রদায় ত্রিপুরার মহারাজদের আমলে ত্রিপুরার সৈন্যবাহিনীতে বহুল কাজ করত। "জমাত" মানে সংঘবদ্ধ দল অথবা "জমাত" কে ঐ সময়ে "জমাতিয়া" উপাধি দেওয়া হয়। অন্য একটি মতবাদ অনুসারে "জমা" শব্দের অর্থ কর থেকে মুক্তি। যেহেতু জমাতিয়া সম্প্রদায় ত্রিপুরার সৈন্যবাহিনীতে কাজ করত, তাদের থেকে কোন খাজনা কর বা রাজস্ব আদায় করা হত না। হান্টার সাহেবের মতে, জমাতিয়া পাহাড়ি যোদ্ধাদের মধ্যে অধিক পারদর্শী ছিল এবং রক্তক্ষয়ী রাজদ্রোহী হিসাবেও চিহ্নিত ছিল। নায়ক জমাতিয়াদের ভাষ্য অনুসারে পূবনারায়ণ নামে এক সাহসী অলীক জমাতিয়া বীর "বিয়াক গনৈং" গড়িয়া ঠাকুরের প্রতিকৃতি কুকিদেশ থেকে এনে রাজাকে উপহার দেন। রাজা সন্তুষ্ট হয়ে আদেশ করে সকলে একটি নির্দিষ্ট স্থানে জমায়েত হয়ে যেন এই ঠাকুরের পূজা করেন। তারপর থেকে ত্রিপুরার উপজাতিদের মধ্যে যে সম্প্রদায় এক জায়গায় সমবেত হয়ে বা জমায়েত হয়ে গাড়িয়া ঠাকুরের পূজা করে। সেই সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর জমাতিয়া আখ্যা দেওয়া হয়।

ত্রিপুরা রাজ্যের ১৯০১ সালের জনগণনা রিপোর্টে দেখা যায় ত্রিপুরার আদিবাসীদের দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন, পুরাণ তিপরা এবং জমাতিয়া। এডওয়ার্ড টুইট ডালটনের মতে ত্রিপুরার উপজাতিরা চারটি ভাগে বিভক্ত। যেমন—রাজবংশী, নোয়াতিয়া, জমাতিয়া এবং রিয়াং। উমেশ সাইগলের মতানুসারে সৈন্যবাহিনীতে জমাতিয়াদের বীরত্বপনার জন্য তৎকালীন ত্রিপুরা মহারাজ ঘরচুক্তি কর থেকে অব্যাহতি দিয়ে উদয়পুর মহকুমায় বসতি স্থাপন করার সুযোগ দিয়েছিলেন। ফলে, জমাতিয়া সম্প্রদায় যদিও ত্রিপুরী উপজাতি জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল, তবুও ধীরে ধীরে নিজস্ব রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিকাঠামো গঠন করে এবং ত্রিপুরার অন্যান্য উপজাতি থেকে স্বতন্ত্রতা বজায় রাখে। কৈলাশচন্দ্র সিংহের রাজমালায়ও দেখা যায় ত্রিপুরার উপজাতি বা ত্রিপুরাগণ প্রধানত ৪টি গ্রুপে বিভক্ত ছিল; যেমন—(১) তিপরা (২) জমাতিয়া (৩) নোয়াতিয়া (৪) রিয়াং।

ঠাকুর নগেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা মহাশয়ের মতানুসারে তৎকালে ত্রিপুরা মহারাজ সৈন্যদের মাসিক বেতন না দিয়ে রাজধানীর আশপাশে জমি বিতরণ করে তার মধ্যে চাষ আবাদ এবং বসবাস করার সুযোগ দিত। জমাতিয়ারা যেহেতু সৈন্যবাহিনীর প্রধান দায়িত্বে থাকত, তাদেরকে রাঙামাটি (বর্তমান উদয়পুর, মহারাজ উদয়মাণিক্যের রাজধানী) এবং অমরপুর, (মহারাজ অমরমাণিক্যের রাজধানী) এর আশপাশে বসবাস করার সুযোগ করে দিয়েছিল। ফলে আজও উদয়পুর এবং অমরপুর মহকুমায় জমাতিয়াদের সংখ্যাধিক্য পরিলক্ষিত হয়। সৌমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা মহাশয়ের ১৯৩১ সনের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ত্রিপুরী ক্ষত্রিয়গণ সে সময়ে পাঁচটি গ্রুপে বিভক্তি ছিল। যেমন—(১) পুরাণ ত্রিপুরা (২) দেশী ত্রিপুরা (৩) জমাতিয়া (৪) রিয়াং (৫) নোয়াতিয়া। এই পাঁচটি গ্রুপকে ক্ষত্রিয় বর্ণ হিসাবে গণ্য করা হত।

জমাতিয়া ভাষা ত্রিপুরী ভাষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। শারীরিক গঠন এবং চেহারার মধ্যেও যথেষ্ট মিল দেখা যায়। তাই উপরোক্ত আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে জমাতিয়া সম্প্রদায় প্রাচীন ত্রিপুরার সৈন্যবাহিনী থেকে সৃষ্টি হয়েছে। ত্রিপুরার উপজাতি গোষ্ঠীগুলির মধ্যে জমাতিয়া সম্প্রদায় প্রথম স্থায়িভাবে এক জায়গায় বসতি স্থাপন এবং সমতলে চাষবাস শুরু করে। জমাতিয়া উপজাতি ধর্মপ্রাণ, সুসংহত, সুশৃঙ্খল, একতাবদ্ধ, সাহসী এবং কৃষিকাজে পারদর্শী।

প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ সুভাষ চট্টোপাধ্যায়ের মতে, ত্রিপুরারাজ্যে বসবাস কারী আটটি উপজাতি গোষ্ঠী; যেমন—(১) ত্রিপুরী (২) রিয়াং (৩) জমাতিয়া (৪) নোয়াতিয়া (৫) রূপিনী (৬) কলই (৭) উলচই এবং (৮) মুড়াসিং একই গ্রুপের অধীন।

এই আটটি উপজাতি ককবরক ভাষায় কথা বলে। ১৯৭১ সনের জনগণনা অনুসারে ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ৩,৬০,৬৫৪ জন উপজাতি অর্থাৎ মোট উপজাতি জনসংখ্যার মধ্যে ৭৯.৯৭% ককবরক ভাষায় কথা বলে। ককবরক ভাষা ১৯৬০ সালের ১৩ আগস্ট গেজেট অব ইন্ডিয়া পার্ট-টু, সেকশান ওয়ান-এ উপজাতি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে এবং বর্তমানে ত্রিপুরার দুটি সরকারী ভাষার মধ্যে অন্যতম। ককবরক ভাষা বড়ো শাখায় তিব্বত-বার্মা ভাষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যদি ও ত্রিপুরা রাজ্যের ৮টি উপজাতি গোষ্ঠী ককবরক ভাষায় কথা বলে, ধ্বনিবিজ্ঞানীদের মতে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে একই শব্দ উচ্চারণের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। ককবরক ভাষার নিজস্ব কোন বর্ণমালা নেই। বর্তমানে বাংলা বর্ণমালা ব্যবহার করে ককবরক ভাষা লেখা হয়।

প্রাচীনকালে জমাতিয়া মহিলারা কোমর-তাঁতে তৈরি বক্ষাবরণী (রিসা) এবং কোমর থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ঢাকা পাছড়া ব্যবহার করতো। কোনো কোনো মহিলাকে পাছড়া এবং কালো রঙের গেঞ্জি পড়তে দেখা যেত। আজকাল আধুনিক জমাতিয়া মেয়েদেরকে ব্লাউস, ওড়না এবং পাছড়া পড়তে দেখা যায়। আগেকার দিনে জুমের তুলো সংগ্রহ করে, বীজ আলাদা করতো, হাত চরকার সাহায্যে সুতা কাটতো, বনের

ফল সংগ্রহ করে সুতা রঙ করতো এবং সেই সুতা দিয়ে রকমারি সুন্দর নক্সা করা বক্ষাবরণী, পাছড়া ইত্যাদি মেয়েরা কোমরতাঁতের সাহায্যে তৈরি করে পরিধান করতো। কিন্তু বর্তমানে মেয়েরা বাজার থেকে রঙিন সুতা ক্রয় করে পাছড়া, বিছানার চাদর ইত্যাদি তৈরি করে। শহর অঞ্চলে অনেক জমাতিয়া মহিলা বাঙ্গালীদের ন্যায় শাড়ি অথবা পাছড়া এবং বাজার থেকে ক্রয় করা ব্লাউস, বক্ষাবরণী, ওড়না ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে। আধুনিক যুবতীরা সেলোয়ার কামিজ এবং ওড়না পড়ে। বিশেষ করে কলেজে এবং শহরে দেখা যায়।

জমাতিয়া পুরুষেরা আগে মার্কিন কাপড় হাঁটু পর্যন্ত উঁচু করে পড়তো। তবে আজকাল বয়স্ক পুরুষেরা মিলের তৈরি ধূতি, গেঞ্জি এবং জামা পড়ে এবং আধুনিক যুবকেরা বেশীর ভাগ ফুলপেন্ট এবং সার্ট পড়ে। গ্রামাঞ্চলে কৃষিকাজের সময় পুরুষেরা "কাচুলি বরক" এক ধরণের জামা পড়ে থাকে।

সমতলের জমাতিয়া পাড়ায় বেশির ভাগ ঘর মাটির দেওয়াল দিয়ে তৈরি। মাটির দেওয়ালের ওপর ছনের ছাউনি থাকে। তবে আজকাল মাটির দেওয়ালের উপর টিনের ছাউনি অধিক পরিলক্ষিত হয়। ঘরগুলি আয়তাকার, দরজা এবং জানলার সংখ্যা কম।

জমাতিয়া সমাজে পিতা পরিবারের কর্তা এবং পিতার পরিচয় প্রাধান্য পায়। জমাতিয়া মহিলারা সংসারের যাবতীয় কাজ কর্মে পুরুষদের অপেক্ষা অধিক পরিশ্রম করে। বাড়িঘরে রান্নাবান্না, জল আনা, লাকড়ি আনা, গৃহপালিত পশুপাখির লালন-পালন, বাসনপত্র ধোয়া, কাপড় ধোয়া, দেশি মদ তৈরি করা। কোমর তাঁত দিয়ে কাপড় বুনা, বাড়িঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা, বাচ্চা রাখা ইত্যাদি সকল কাজের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকাজে এবং জুম চাষেও বিভিন্ন কাজ যেমন বীজ/চারা রোপণ, আগাছা নিয়ন্ত্রণ, ফসল তোলা, মাড়াই, ঝাড়াই, হাট বাজার করা ইত্যাদি সকল কাজে পুরুষকে যথাসম্ভব সাহায্য করে থাকে। তাই জমাতিয়া পরিবারে মহিলারা অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে শক্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জমাতিয়া মহিলারা যদি ও কাজে কর্মে পুরুষের সমকক্ষ তথাপিও তাদের পরিচয় স্বামীর পরিচয়ে সমাজে স্বীকৃতি লাভ করে।

সমজাতির মধ্যে বিবাহ প্রথা বহুল প্রচলিত এবং এক বিবাহ প্রথা অর্থাৎ এক স্ত্রীর সঙ্গে সারাজীবন সংসার করা জমাতিয়া সমাজের চিরাচরিত নিয়ম। তবে নিঃসন্তান স্ত্রী বা বন্ধ্যা স্ত্রী, বিবাহবিচ্ছেদ এবং প্রথম স্ত্রী মারা গেলে দ্বিতীয় বিবাহের প্রচলন আছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী জমাতিয়াদের মধ্যে কনের বয়স বরের বয়স অপেক্ষা বেশি অর্থাৎ কনের বয়স ১৫-১৮ বরের বয়স ১২-১৬ বছর এর মধ্যে পিতামাতারা বিয়ের ব্যবস্থা করে থাকেন। গ্রামাঞ্চলে কনের গুণপনার মধ্যে দেখা হয় সুস্বাস্থ্য, কৃষি এবং বাড়িঘরের যাবতীয় কাজ কর্ম সুনিপুণতার সঙ্গে সম্পাদন করার ক্ষমতা ইত্যাদি। তবে আজকাল শিক্ষিত জমাতিয়া সমাজে দেখা যায়, ছেলের বয়স

২০-২৫ এবং মেয়ের বয়স ১৫-২০ এর মধ্যে বেশির ভাগ বিবাহ সম্পাদন করা হয় অর্থাৎ শিক্ষিত সমাজে বরের বয়স কনের বয়স অপেক্ষা সাধারণত বেশি হয়। ভাদ্র ও পৌষ এবং চৈত্র মাস ব্যতীত বছরের অন্য যে কোন মাসে জমাতিয়াদের বিবাহ হতে পারে। তবে পঞ্জিকা দেখে শুভবিবাহের দিন ধার্য করা হয়। বিঁয়ের কাজ দিনের বেলায় সকালের দিকে সুসম্পন্ন করা হয়। জমাতিয়া সম্প্রদায়ের বিয়েবাড়িতে দুটি বাঁশের আসর তৈরি করা হয়। একটি আসরে চতুর্দশ দেবতার পূজা করা হয় এবং অন্যটিতে বিয়ের লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান সম্পাদন করা হয়।

জমাতিয়া সমাজে প্রত্যন্ত অঞ্চলে এখনও কাজের বিনিময়ে বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে। এই পদ্ধতি অনুসারে বর বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে আলাদা ঘরে বসবাস করবে এবং কম পক্ষে দুই বছর শশুরের জমিতে চাষবাষ করবে। বর্তমানে আধুনিক শিক্ষিত জমাতিয়া সমাজে বর শশুরবাড়িতে বন্ধুবান্ধব সঙ্গে নিয়ে বিয়ের কাজ সম্পাদন করে এবং পরদিন নববধু সঙ্গে নিয়ে বাড়িতে ফিরে আসে। জমাতিয়া সমাজে বিয়ের সময় বরপক্ষ থেকে টাকা নেওয়াকে ঘৃণ্য চোখে দেখা হয়। জমাতিয়া সমাজ ব্যবস্থায় রক্তের সম্পর্ক আছে এমন পরিবারের মধ্যে বিবাহ তিন প্রজন্ম পর্যন্ত নিষিদ্ধ। একই গোষ্ঠী বা স্যান্তয়-এর মধ্যে ও বিবাহ উৎসাহিত করা হয় না। কারণ একই স্যান্তয়ের সকলে একই পিতা মাতা থেকে উদ্ভূত, এমন ধারণা জমাতিয়া সমাজে বিদ্যমান। অন্যদিকে ছোট এবং বড় ভাইয়ের বিধবা পত্নী, নিজ স্ত্রীর বড়বোনকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ তবে নিজ স্ত্রীর ছোটবোন (শালিকে) বিবাহ করা চলে। বিপত্নীক পুরুষ অথবা স্বামীহারা বিধবা শুধুমাত্র বিধবা অথবা বিপত্নীক পুরুষকে বিবাহ করিতে পারে।

জমাতিয়া সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদ গ্রহণযোগ্য। পাগলামি, পুরুষত্বহীনতা, বন্ধ্যাত্ব, ব্যভিচার, অবৈধ যৌন সম্পর্ক এবং স্বামী স্ত্রীর ঝগড়াঝাটি ইত্যাদি কারণে "ময়াল" সর্দারের নিকট বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন করতে পারে। আবেদনকারী ফিস হিসাবে ১২০ টাকা, ৬টি আধুলি, ৬টি সিকি, ৬টি দুই আনা, ৬টি আনা ময়াল সর্দারের নিকট অবশ্যই জমা দিবে।

জমাতিয়া সমাজে বিবাহবিচ্ছেদ মামলায় স্বামী সন্তানদের জন্য দাবী করে না। ফলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ছোট ছেলেমেয়ে মায়ের সঙ্গে থাকে। জমাতিয়া সামাজিক নিয়ম অনুযায়ী যদি কোন ব্যক্তি সন্তানসহ বিবাহবিচ্ছেদ প্রাপ্ত অথবা বিধবা মহিলাকে বিবাহ করে, তবে পূর্বের সন্তানগণ পালক পিতাকে "বাবা" বলে সম্বোধন করলেও পালক পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়।

জমাতিয়া সমাজে মদ্যপান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গ্রামাঞ্চলে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রায় বাড়িতে মদ তৈরির সরঞ্জাম বিদ্যমান। জমাতিয়া মহিলারা দেশি মদ তৈরিতে খুবই পারদর্শী। জমাতিয়াদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান গুলিতে লক্ষ্য করলে দেখা যায়

ওচাই (পুরোহিত) দুষ্ট আত্মাগুলিকে শান্ত রাখার উদ্দেশ্যে মদ উৎসর্গ করে। এমনও দেখা যায়, জমাতিয়া সমাজে পুরোহিতের (ওচাই) এর পারিশ্রমিক টাকা পয়সার পরিবর্তে মদের দ্বারা সম্পাদন করা হয়। গ্রামীণ সর্দারের (চোকদিরীর) নিকট কোন প্রকার বিচার প্রার্থনা করার সময় মদ ফিস হিসাবে জমা দেওয়া হয়। এ ছড়া, বাড়িতে অতিথিকে আপ্যায়নের সবচেয়ে প্রিয় বস্তু মদ। নানা ধরণের শারীরিক অসুস্থতা দূরীকরণের জন্য জমাতিয়া সমাজ মদ ঔষধ হিসাবেও গ্রহণ করে থাকে। বাচ্চা প্রসবের পর মাকে মদ এবং ঈষৎ উষ্ণ গরম জল সেবন করানো হয়। জমাতিয়া সম্প্রদায়ের রোগের দেবতা "বুরাসা" ঠাকুরকে মদ সম্প্রদান করে ওচাই সন্তুষ্ট করে থাকে।

জমাতিয়া পরিবারে দুই ধরণের মদ প্রস্তুত করা হয়। পাতিত এবং পরিশ্রুত মদ যা বোতলে সংরক্ষণ করে রাখা হয়, সেগুলিকে বলে "ছোক" অথবা "আরক"। "পানচুয়া" অর্থাৎ অপরিশ্রুত মদ যা মাটির হাঁড়িতে রাখা হয় এবং বাঁশের পাইপের সাহায্যে পান করা হয়।

সামাজিক অনুষ্ঠানে সংঘবদ্ধ ভাবে মদ পানের আসরে উপস্থিত সকলকে সমপরিমাণ মদ বণ্টনের ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়। "ছোক" বা "আরক" মদ পানের সময় আসরে উপস্থিত সকলকে প্রথমে এক কাপ পরিমাণ সমভাবে বণ্টন করা হয়। তারপর দ্বিতীয় বার বণ্টনের সময় অতিরিক্ত পরিমাণ অবশিষ্ট মদের সঙ্গে সমভাবে বণ্টন করা হয়। যদি বাড়ির কর্তা অতিরিক্ত মদের যোগান দিতে অসমর্থ হয় তবে অবশিষ্ট মদ পড়ে থাকবে কেউ স্পর্শ করবে না। একই মদ পানের আসরে পুরুষ এবং মহিলা উপস্থিত থাকলে প্রথম পুরুষেরা বয়ঃক্রম অনুসারে পর পর মদপান শুরু করবে তারপর মহিলারা মদপান শুরু করবে। জমাতিয়া সমাজে দেখা যায় মদ পানের আসরে প্রথম প্রধান ব্যক্তি মদের পাত্র হাতে নিয়ে প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে হাতজোড় করে অভিবাদন করে এবং অন্যরা সমস্বরে সমর্থন এবং মদপানের সম্মতি জ্ঞাপন করে। "পানচুয়া" অর্থাৎ অপরিশ্রুত মদ মাটির পাত্র থেকে বাঁশের পাইপের সাহায্যে পানের সময়ও সমবণ্টনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই আসরে একজন নিয়ন্ত্রকের কাজ করে এবং প্রত্যেকে বয়ঃক্রম অনুসারে সমপরিমাণ মদ পানের সুযোগ দেয়।

জমাতিয়া সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকার পূজা-পার্বণ, লোকাচার, আনন্দ উৎসবে, পশুপাখি—ঠাকুর দেবতা, প্রেতাত্মাকে উৎসর্গ করার রেওয়াজ বিদ্যমান।

গড়িয়া পূজা জমাতিয়া সম্প্রদায়ের খুবই প্রিয়, জমাতিয়াদের সামাজিক এবং ধর্মীয় জীবন উপলব্ধি করার জন্য গড়িয়াপূজা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রত্যেক বছর মহাবিষু সংক্রান্তি অর্থাৎ চৈত্র মাসের শেষ তারিখে গড়িয়া পূজা শুরু হয়। পূজা চলে সাতদিন সাতরাত্র। যে দিন পূজা শুরু হয় সেইদিনকে জমাতিয়া সম্প্রদায় বলে

"বুইসো"। গড়িয়া পুরুষ ঠাকুর এবং তুষ্টিতে ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় এমন ধারণা জমাতিয়া সমাজে বিদ্যমান। গড়িয়া পূজার জন্য নির্দিষ্ট কোন স্থান নেই। খোলা আকাশের নীচে পূজার কাজ সম্পাদন করা হয়। সময়ে সময়ে পূজার স্থান গ্রামবাসীদের ইচ্ছা অনুসারে স্থানান্তরিত করা হয়। গড়িয়া পূজার স্থান বার্ষিক হদা কনফারেন্সে জনসাধারণকে অবহিত করা হয়। প্রাচীনকালে জমাতিয়া সম্প্রদায় শুধুমাত্র একটি গড়িয়া ঠাকুরের প্রতিকৃতির পূজা করতো, কিন্তু পরবর্তী সময়ে পুবনারায়ণ কুকি-দেশ থেকে একটি নূতন গড়িয়া ঠাকুরের প্রতিকৃতি নিয়ে আসেন। ঐ সময় থেকে তাদের নিজস্ব প্রাচীন গড়িয়া ঠাকুর বড় ভাই অথবা বড় গড়িয়া নামে পরিচিত লাভ করে। অন্যদিকে পুবনারায়ণ (পুব নারা) দ্বারা আনীত নুতন গড়িয়া ঠাকুরকে ছোট ভাই বা ছোট গড়িয়া হিসাবে পূজা করা হয়।

বড় গড়িয়া ঠাকুরের প্রতিকৃতি বাঁশের একটি খণ্ড দিয়ে তৈরি করা হয় এবং ছোট গড়িয়া ঠাকুরের প্রতিকৃতি ত্রিস্তর যুক্ত বাঁশের প্রতিকৃতি। ছোট ঠাকুরের বাঁশের স্তরগুলিকে ঠাকুরের উপাঙ্গ হিসাবে মান্য করা হয়। গড়িয়া পূজার সময় যে শোভাযাত্রা বের করা হয় তার মধ্যে শুধুমাত্র বড়ভাই অংশগ্রহণ করে। ছোট ভাইকে পূজা মণ্ডপ থেকে বের করা হয় না। জমাতিয়া সমাজে গড়িয়া পূজা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য পূজা নির্বাহীগণও হদার বার্ষিক কনফরেন্সে মনোনীত হন। গড়িয়া পূজা সম্পাদনের জন্য দুইজন খেরফাং নিযুক্ত হন। একজন খেরফাং বড় গড়িয়া ঠাকুর এবং অন্যজন ছোট গড়িয়া ঠাকুরের জন্য নির্দিষ্ট থাকে। খেরফাংগণ বংশানুক্রমিক ভাবে মনোনীত হয়। জমাতিয়াদের সামাজিক বার্ষিক গড়িয়া পূজা খেরফাংগণের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়। ওনারা গড়িয়া ঠাকুরের প্রতিকৃতির দায়িত্বে থাকেন এবং পূজার সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী ও খেরফাং এর বাড়িতে সংরক্ষিত করা হয়। এ ছাড়া, পূজার জন্য পুরোহিত হদার বার্ষিক কনফারেন্সে মনোনীত হয়। গড়িয়া ঠাকুরের প্রতিকৃতি বহন করার জন্য "মাউতে ব্যালন্যায়", পূজার ঢোল বাজানোর জন্য "দোরিয়া", পূজার সহযোগী "বোগলা" এবং পূজার দ্রব্যসামগ্রী রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য "ভাণ্ডারী" ইত্যাদিও মনোনীত করা হয়।

গড়িয়া ঠাকুরের প্রতিকৃতি তৈরি করার জন্য ছয় জন লোক পার্শ্ববর্তী বনে গিয়ে তিনটি নিখুঁত বাঁশ সংগ্রহ করে। নিখুঁত বাঁশ বাছাই করার জন্য যে পূজা অর্চনা করা হয় তাকে বলে "পাঠকরমুঙ্গ"। তারপর কোন প্রকার দাগবিহীন নিখুঁত একটি বাঁশকে ভোগ নিবেদন করে, শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ করে এক কোপে কেটে গোড়া থেকে আলাদা করা হয়। এই বাঁশটিকে বলে "ওয়াটে ফাং রাজা"। অন্য দুটি বাঁশকে সাধারণ ভাবে কেটে সংগ্রহ করা হয়। তারপর বাঁশের গড়িয়া ঠাকুরের প্রতিকৃতি তৈরি করে সাদা রঙের সূতো এবং কাপড় দিয়ে জড়িয়ে ঢেকে দেওয়া হয়।

গড়িয়া পূজার মণ্ডপ খোলা আকাশের নীচে তৈরি করা হয়। পূজার মণ্ডপ ও

বাঁশ দিয়ে তৈরি করা হয় এবং হাতে বোনা সুন্দর কাপড়, ধুতি ইত্যাদি দিয়ে সাজানো হয়।

ঠাকুরকে ভোগ প্রদান করা হয় এবং সকাল ৮টা থেকে ৯টা পর্যন্ত প্রায় এক ঘণ্টা ধরে পূজা চলে। এরপর হদা কর্তৃক প্রদত্ত মানসী মহিষ এবং পাঁঠা ঠাকুরকে উৎসর্গ করে বলি দেওয়া হয়। তারপর অন্যান্য ব্রতীদের মানসী মহিষ ও পাঁঠা একে একে ঠাকুরকে উৎসর্গ করা হয়। উৎসর্গীকৃত মহিষের সঙ্গে অবশ্যই একটি নূতন ন্যাকড়া কাপড়ও গড়িয়া ঠাকুরের কাছে উৎসর্গ করা হয়।

পূজা শেষ হওয়ার পর গড়িয়া পূজার কর্মকর্তাগণ একটি পৃথক ঘরে বিশ্রাম এবং আহার করেন। পূজার কর্মকর্তাগণের আহারের ব্যাপারে ও কতকগুলি নিয়মবিধি মেনে চলা হয়। পূজারীদের আহার তৈরিতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার এবং শুদ্ধতার উপর কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং পূজারীদের আহারের সময় অন্যান্য জনসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ। এই ভাবে সাতদিন নিয়ম এবং বিধিনিষেধ মানা হয়। আহারের পর সকলে হাত মুখ ধৌত করে এবং নিজ নিজ স্থানে আসন গ্রহণ করে, পান সুপারি এবং তামাক সেবন করে। এক্ষেত্রে পুরোহিতকে সম্মানপূর্বক পদক্ষেপ অনুসারে প্রথম পান সুপারি এবং তামাক সেবনের সুযোগ দেওয়া হয়। তারপর পূজা নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তাগণ এক ঘণ্টা বিশ্রাম গ্রহণ করে। বিকেল প্রায় ৩টার সময় ওনারা গড়িয়া ঠাকুরকে নিয়ে নির্দিষ্টী কৃত গ্রামে যায়। কিন্তু যদি কোনো গ্রামে অশুদ্ধি, ভক্তির অভাব অথবা ভক্তগণের আত্মশুদ্ধির কোনো প্রকার অভাব বা ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় তবে গড়িয়া ঠাকুরের শোভাযাত্রা ঐ গ্রাম বর্জন করে।

বাবা গড়িয়া ঠাকুরের গ্রামে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীরা অন্তরিক ভাবে স্বাগত জানায় এবং সক্রিয় ভাবে পূজার অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে। গ্রামের মধ্যে প্রত্যেক বাড়ির মালিক যথাসাধ্য চেষ্টা করে ঠাকুরের সঙ্গে অনুগামীদের সন্তুষ্ট করতে। এভাবে গড়িয়া ঠাকুরের প্রতিকৃতি বহন করে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি এবং গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রতি বাড়িতে ঠাকুর আসার পর ৫-১০ মিনিট নাচ-গানও করা হয়। সবশেষে গৃহকর্তাকে আশীর্বাদ করে পরবর্তী বাড়িতে ঠাকুর নিয়ে যাওয়া হয়। এই উৎসব ক্রমাগত সাতদিন সাত রাত চলে। এই সময় গড়িয়া ঠাকুরের সহযোগীদের ঠাকুরের বন্ধু হিসাবে গণ্য করা হয়। "বগ্গাগণ" অর্থাৎ সহযোগিগণ দর্শকের সঙ্গে হাস্যকৌতুক করে এবং পূজা উৎসবকে প্রাণবন্ত করে। বগ্গাগণ হাস্যকৌতুক ব্যতীত বিভিন্ন প্রেম-সংক্রান্ত গানও গায়। বগ্গাদের নেতাকে বলা হয় "মোহন্ত"। বগ্গা কর্তৃক হাস্যকৌতুক, ঠাট্টা, ইয়ার্কি, তামাশা ইত্যাদি অবশ্যই দর্শকগণ হাল্কাভাবে গ্রহণ করে।

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, যদি কোনো দর্শক কোনো মোহন্তকে কোনো রোগমুক্তির জন্য অনুরোধ করে, তবে মোহন্ত সামান্য পূজার জল মন্ত্র উচ্চারণ করে রোগীকে

প্রদান করেন। জমাতিয়া সম্প্রদায়ের রোগীদের বিশ্বাস তারা বাবা গড়িয়ার আশীর্বাদে আরোগ্য লাভ করবে।

পূজার সাতদিন, সাতরাত খুব ধূমধাম ও আনন্দ উৎসবের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত করার পর ঠাকুরের প্রতিকৃতি পুনরায় খেরফাং-এর বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। তারপর পূজার আনুসঙ্গিক আরো কিছু কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়। সবশেষে পুরোহিত গড়িয়া পূজার কর্মকর্তাদের মধ্যে যে কোনো এক জনকে সার্বিক পূজার ফলাফল ব্যক্ত করেন। ঠাকুর বিসর্জনের আগে ঠাকুরের প্রতিকৃতি থেকে সমস্ত বস্ত্র খুলে নেওয়া হয়। এই সময় পূজার যাত্রীগণ এবং গড়িয়া ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ ঠাকুরের বস্ত্রের টুক্‌রো সংগ্রহ করে এবং ঠাকুরের আশীর্বাদস্বরূপ রক্ষা করে। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, বৈশাখ মাসের সাত তারিখে গড়িয়া ঠাকুরের বিসর্জন জমাতিয়া সম্প্রদায়ের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ দিন। ঐ দিন সেনা পূজা, ধানের দেবী "মাইলুঙ্গমা" এবং তুলো ফসলের দেবী "খৌলুঙ্গমা"র পূজা ইত্যাদি অনুষ্ঠান ও সম্পাদন করা হয়।

জমাতিয়া সমাজে এমন ধারণা বিদ্যমান যে বাবা গড়িয়া ঠাকুরকে নাচ, গান, পূজা অর্চনা ইত্যাদির মাধ্যমে সন্তুষ্ট করতে পারলে নূতন বছরে সুখ শান্তিতে জীবন ধারণ করতে সক্ষম হবে। গড়িয়া উৎসব জমাতিয়া সম্প্রদায় ব্যতীত ত্রিপুরারাজ্যে বসবাসকারী ত্রিপুরী, রিয়াং এবং নোয়াতিয়াদের মধ্যে পালন করতে দেখা যায়। প্রত্যন্ত অঞ্চলের অনেক উপজাতি গড়িয়া পূজার পর জুম বীজ বপনের কাজ শুরু করে। কারণ, গড়িয়া ঠাকুর সন্তুষ্ট হলে জুম ফসলের ফলন অধিক হবে এমন ধারণা গোঁড়া জুমিয়াদের মধ্যে আজ ও বিদ্যমান। প্রবীন উপজাতিদের ভাষ্য অনুসারে গড়িয়া ঠাকুর হল বাবা মহাদেব এবং পার্শ্ববর্তী বাঙ্গালীদের চড়ক পূজার সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ। স্থানীয় বাঙালীদের চড়ক পূজার আগে চৈত্র মাসে বাড়ি বাড়ি গিয়ে শিবদুর্গা, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদির নাটক, নাচ গান দেখানো হয় এবং বিনিময়ে ধান, চাউল, টাকা-পয়সা সংগ্রহ করে চৈত্র মাসের শেষ তারিখে মহাদেব ঠাকুরের পূজা করে বড় একটি চড়ক গাছে ঠাকুরকে চড়ানো হয়। স্থানীয় ত্রিপুরার বাঙ্গালীদের ও ধারণা মহাদেব ঠাকুর সন্তুষ্ট হলে নতুন বছর সুখ-শান্তিতে অতিবাহিত করতে পারবে।

জমাতিয়া সমাজে লাম্প্রা পূজা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, নূতন বাড়িঘরে প্রবেশ ইত্যাদি সকল কাজের আগে লাম্প্রা পূজা করা হয়। মোটকথা সকল শুভ কাজের আগে লাম্প্রা পূজা অত্যাবশ্যকীয় করণীয়। এই পূজা পুরোহিত দ্বারা সম্পাদন করা হয়। পূজার দক্ষিণা হিসাবে পুরোহিতকে কোনো প্রকার টাকা-পয়সা দেওয়া হয় না কিন্তু বিনিময়ে মদের বোতল (ছোক) সম্প্রদান করা হয়।

জমাতিয়া উপজাতি সম্প্রদায়ের প্রতি ঘরে মাইলুঙ্গমা এবং খৌলুঙ্গমা দুই দেবীর পূজা করা হয়। মাইলুঙ্গমা হল ধানের দেবী এবং খৌলুঙ্গমা হল তুলোর দেবী। মাই-লুঙ্গমা এবং খৌলুঙ্গমা দেবীদ্বয়ের এক সঙ্গে পূজা করা হয়। জুম ফসল প্রথম ঘরে

তোলার পর দুটি মাটির ঘট নতুন জুমের চাউল দ্বারা ভর্তি করা হয়। ঘটের ঘাড়ে জুমের তুলো থেকে তৈরি সুতা জড়িয়ে দেওয়া হয়। ঘট দুটি চাউলের পিটুলি দিয়ে চিত্রিত করা হয়, অনেক সময় সিঁদুর দিয়ে স্বস্তিকা চিহ্ন ঘটের উপর দেওয়া হয়। ঘট দুটির ভিতর কয়েকটি ডিম্বাকৃতি পাথর সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে চাউলের সঙ্গে ঘটের মধ্যে রাখা হয়। তারপর ঘরের মধ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্থানে ঘট দুটি স্থাপন করে ফুল, দিয়ে পূজা করা হয় এবং প্রদীপ জ্বালানো হয়। এই ঘটগুলিকে বলে রন্দক। এই পূজা বছরে দু বার অর্থাৎ গড়িয়া ঠাকুর বিসর্জনের দিন এবং জুমের নবান্ন ভোজনের দিন সম্পাদন করা হয়।

'কের পূজার' মুখ্য উদ্দেশ্য হল নির্দিষ্ট এলাকায় জনসাধারণকে ব্যধি, দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা এবং মহামারী ইত্যাদির কবল থেকে রক্ষা করা। কের পূজা সাধারণত যে-কোনো শনি অথবা মঙ্গলবারে করা যায়। জমাতিয়া সম্প্রদায়ের কের পূজা ওছাই বা পুরোহিত দ্বারা সম্পাদন করা হয়। কের পূজার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল নির্দিষ্ট এলাকার ওপর বিধিনিষেধ জারি করা। কের পূজার সময় গ্রামবাসীরা চুলায় আগুন জ্বালাতে পারবে না এবং কেউ কোনো নির্দিষ্ট এলাকা অতিক্রম করতে পারবে না। কের পূজার সময় এবং পূজার উদ্দেশ্য অনুসারে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। যেমন (১) সায়ন পূজা (২) আগন পূজা (৩) চৈত্র ছেয়ন গারা (৪) বিশেষ কের অথবা মুদ্রা ইত্যাদি।

সায়ন পূজা ,সামগ্রিক ভাবে হদা কমিটির অনুমোদনক্রমে নির্দিষ্ট এলাকার জনসাধারণকে দুর্ভিক্ষ, অহেতুক আতঙ্ক ইত্যাদির হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে সম্পাদন করা হয়। আগন পূজা অথবা বলং কাটেরামা পূজাও হদা কমিটির দ্বারা করা হয় বিশেষ করে যারা বনজঙ্গলে জুমচাষ করে তাদের রক্ষা করার উদ্দেশ্যে। চৈত্র ছেয়ানগারা করা হয় গ্রামবাসীদের বিভিন্ন রোগ; যেমন—বসন্ত, কলেরা ইত্যাদির হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে।

বিশেষ কের অথবা মুদ্রা পূজা গ্রামবাসীরা সমবেত অথবা প্রতি পরিবারে আলাদা ভাবে করে থাকে। সাধারণ কের পূজার ন্যায় বিশেষ কের পূজা বা মুদ্রা পূজা শনি অথবা মঙ্গল বারে করা হয়। পূজার সময় ঠাকুরকে নৈবেদ্য প্রদান করা হয়। পূজার নৈবেদ্য তৈরির জন্য সাধারণত আতপ চাউল, চিনি, বাতাসা, সন্দেশ, পাকা কলা, নারিকেল এবং অন্যান্য স্থানীয় ফল ব্যবহার করা হয়। পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণ করে পূজা করে। এই পূজার জন্য সরিষা এবং কাঁচা হলুদ ও অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে অন্যতম।

বাড়িতে কের পূজা করা হলে পূজার দিন অবশ্যই পরিবারের সকল সদস্যদের উপস্থিত থাকতে হবে। এ ছাড়া, পূজার সময় অন্য বাড়ির কেউ পূজা বাড়িতে উপস্থিত থাকতে পারবে না। কিন্তু গ্রামবাসীরা যদি যৌথ ভাবে কের পূজা করে তবে ঐ নির্দিষ্ট গ্রামবাসী ব্যতীত অন্য কোন গ্রামের লোক পূজার সময় ঐ গ্রামে উপস্থিত বা প্রবেশ

করতে পারবে না। কের পূজার সময় লোক চলাচলের নিষেধ আজ্ঞা পুরোহিত এর নির্দেশ অনুযায়ী স্থির করা হয়। কোনো কোনো পুরোহিতের মতানুসারে পূজা শেষ হওয়ার ঠিক পরমুহূর্তে অন্যান্য গ্রামের লোকজনের উপস্থিতিতে বাধানিষেধ নেই। তবে কারো কারো মতো একদিন অথবা তিন দিন লোকচলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা বিরাজমান। এ ছাড়াও পূজার নিষেধাজ্ঞার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পূজার সময় কেউ ঘুমোতে পারবে না। নির্দিষ্ট গ্রাম থেকে কেউ বাহিরে যেতে পারবে না বা বাহির থেকে কেউ ঐ গ্রামে প্রবেশ বা উপস্থিত থাকতে পারবে না। পূজার দিন সকাল থেকে পূজা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনো গ্রামবাসীকে দৈনন্দিন কাজে ও বাইরে যেতে দেওয়া হয় না, এমনকি বাড়ির মধ্যে ধান ঝাড়াই, কাপড়, চোপড় ধোয়া, গাছ-গাছড়া কাটা ইত্যাদির ওপরও বারণ থাকে। পূজা সম্পাদনের জন্য গ্রামের পার্শ্ববর্তী ছোট জলের ধারা (ছড়া)র মধ্যে বাঁশের তিনটি মঞ্চ তৈরি করা হয়। ছড়ার উজানে যে বাঁশের মঞ্চ তৈরি করা হয় সেটি কেরের প্রধান বেদী হিসাবে গণ্য হয়। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মঞ্চ পরপর ছড়ার ভাটির দিকে তৈরি করা হয়। কেরের প্রধান মঞ্চটি বাঁশের চারটি ঘুঁটি দিয়ে তৈরি করা হয় এবং ফুল বেলপাতা এবং মালা ইত্যাদির দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। কের পূজার জন্য জমাতিয়া গ্রামবাসীরা মা কালীর একটি কাগজের ছবি এবং মা কালীর সাঙ্গোপাঙ্গের ৪টি ছবি মূল বেদীর ওপর প্রতিষ্ঠা করা হয়। পুরোহিত স্নান করে এসে কেরের মঞ্চের কাছে নৈবেদ্য তৈরি করে এবং পর পর মন্ত্র উচ্চারণ করে প্রতিটি মঞ্চেও পূজা দেয়। তৃতীয় অর্থাৎ ভাটির দিকের মঞ্চের জলকে অশুভ আত্মার জল হিসাবে গণ্য করা হয় এবং তৃতীয় মঞ্চ বা বেদীর কাছে উৎসর্গীকৃত নৈবেদ্য কেউ প্রসাদ হিসাবেও গ্রহণ করে না। তবে প্রথম ও দ্বিতীয় মঞ্চের নৈবেদ্যগুলি গ্রামবাসীরা প্রসাদ হিসাবে ভক্তি সহকারে গ্রহণ করে। পূজা শেষ হওয়ার পর মা কালীর সাঙ্গোপাঙ্গ বা রক্ষীদের ছবিগুলি উল্টো দিকে ঘুরিয়ে রাখা হয় এবং মা কালীর ছবি গ্রামে নিয়ে আসা হয়। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন মা কালীর ছবি যারা মঞ্চ থেকে গ্রামে নিয়ে আসবে তাদের ঐ সময় কথা বলা বা হাসা বারণ। ছবি নিয়ে গ্রামে ফিরে আসার পর পূজার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। তারপর গ্রামের সর্দার এবং প্রত্যেক গ্রামবাসীর বাড়িতে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

পূজার দিন সন্ধ্যা সময়, পুরোহিত আতপ চাউল, কাঁচা হলুদ এবং সরিষার বীজ তন্ত্রমন্ত্র পড়ে পবিত্র করে এবং এই মিশ্রণ প্রত্যেক বাড়িতে ছিটানো হয়। এই মিশ্রণ ছিটানোর মাধ্যমে গ্রামবাসীরা অশুভ শক্তির হাত থেকে সুরক্ষিত থাকে এমন ধারণা জমাতিয়া উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যমান। সাধারণত পুরোহিতের পক্ষ থেকে এক ব্যক্তি এই কাজ সম্পাদন করে তবে মন্ত্রপুত আতপ চাউল, কাঁচা হলুদ এবং সরিষার বীজের মিশ্রণ ছড়ানোর সময় ঐ ব্যক্তির কথা বলা নিষেধ। এই কারণে মিশ্রণ ছড়ানোর আগে প্রত্যেক গ্রামবাসীকে জানিয়ে দেওয়া হয় তারা যেন বাড়ির সামনের

এবং পিছনের দরজা খোলা রাখেন, যাতে সহজে সারাবাড়িতে ছিটানোর কাজ সম্পাদন করা সম্ভব হয়।

জমাতিয়া সমাজে প্রশাসন ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত। জমাতিয়া সমাজ ব্যবস্থার প্রধান হন্তাকর্তা অর্থাৎ সর্বোচ্চ পরিষদ হল "হদা"। হদার ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের জন্য গ্রামস্তরের পরিষদ বা "লুকু", অঞ্চল স্তরের পরিষদ বা "ময়াল" কাজ করে থাকে। প্রশাসনিক কাজকর্ম ত্রিস্তরে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য জমাতিয়া সম্প্রদায়ের আট সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা কমিটি বিদ্যমান।

জমাতিয়া সমাজ-ব্যবস্থাপনা গ্রাম স্তরে প্রধান মুখপাত্র বা "চৌকদিরি", দুজন অথবা প্রয়োজন অধিক সাহায্যকারী "খাণ্ডোল" বিদ্যমান। গ্রামের বিবাহিত, স্ত্রী বর্তমান, এবং সন্তানের পিতা, এমন প্রধান ব্যক্তি যার অর্থনৈতিক অবস্থা মজবুত তাকে " চৌকদারি" বা প্রধান মুখপাত্র হিসাবে সরাসরি নির্বাচন করা হয়।

গ্রামস্তরের পরিষদ গ্রামের ছোটখাটো ঝগড়া বিবাদ চিরাচরিত উপজাতি আইন অনুযায়ী নিষ্পত্তি করে। চৌকদরি প্রয়োজনে সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ বিচারের জন্য গ্রামের প্রভাপশালী গণ্যমান্য গ্রামবাসীদের দ্বারা গঠিত জুরি কমিটির সাহায্য গ্রহণ করে। জমাতিয়া সমাজ ব্যবস্থায় চৌকদরি গ্রামের সকল প্রকার সামাজিক এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান যেমন—বিবাহ, মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ, কেরপূজা ইত্যাদি যেন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার তদারকী করে। চৌকদরি "ময়াল" এবং "হদা" কমিটির সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষা করে। হদা কমটির বার্ষিক সভায় চৌকদরি নিজে অথবা তার মনোনীত দু'জন প্রতিনিধি উপস্থিত থাকে।

ত্রিশ-থেকে পঞ্চাশটি লুকু নিয়ে একটি অঞ্চল বা ময়াল গঠিত হয়। অঞ্চল স্তরে দুজন মুখপাত্র "ময়াল পঞ্চায়" থাকে। তারা প্রতিটি গ্রামের প্রতিনিধিদের দ্বারা নির্বাচিত হয়। নির্বাচিত ময়াল পঞ্চায়কে বা ময়াল সর্দারকে অবশ্যই বিবাহিত, সস্ত্রীক এবং সন্তানের পিতা হতে হবে। তারা তাদের অঞ্চলের সমস্ত আইন-কানুন এবং জমাতিয়া সমাজের কল্যাণে সমস্ত কাজকর্ম দেখাশুনা করে। তাদের অঞ্চলের ভিতর সমস্ত গ্রামের ঝগড়া বিবাদের নিষ্পত্তি তারা স্থানীয় চৌকদারিদের বা গ্রামের সর্দারদের সাহায্যে সম্পাদন করে। কিন্তু ময়াল সর্দারের বিচারে কেউ সন্তুষ্ট না হলে "হদা অক্রায়" অর্থাৎ সর্বোচ্চ পারিষদের শেষ বিচার প্রার্থী হতে পারে।

জমাতিয়া সমাজ ব্যবস্থায় "হদা"-হল সর্বোচ্চ পরিষদ, হদা পরিষদের প্রধান হল "হদা অক্রা"। প্রাচীনকালে ত্রিপুরারাজ্যের সমস্ত জমাতিয়া সমাজে শুধুমাত্র একজন হদা অক্রা ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে অমরপুর এবং উদয়পুর মহকুমার জন্য দুজন হদা অক্রা নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। এই দুজন হদা অক্রা হদা কমিটির বার্ষিক সভায় প্রতিটি গ্রাম পরিষদের চৌকদারি অথবা প্রতিনিধিদের দ্বারা নির্বাচিত হয়। হদা কমিটির বার্ষিক সভা প্রতি বছর অগ্রহায়ণ মাসে সম্পন্ন হয়। হদার প্রধান মুখপাত্র পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হয়।

হদা অক্রা নির্বাচনের সময় যে-সকল বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হল অবশ্যই ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি এবং জমাতিয়া সমাজ ব্যবস্থার চিরাচরিত আইন কানুন, প্রশাসন পরিচালনার অভিজ্ঞতা থাকা বাঞ্ছনীয়। উনি অবশ্যই বিবাহিত সস্ত্রীক এবং পিতৃত্বসম্পন্ন ব্যক্তি হবেন। হদা অক্রা ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাসকারী সমস্ত জমাতিয়া সমাজের মুখপাত্র হিসাবে কাজ করবেন। হদা জমাতিয়া সমাজের কল্যাণে গড়িয়া পূজা, গাঙ্গ পূজা ইত্যাদি বারোয়ারি পূজার ব্যবস্থা করে থাকে। বিভিন্ন ধরণের জটিল বিচার, বিশেষ করে; বিবাহ-বিচ্ছেদ, অপহরণ, অসামাজিক কার্যকলাপ এবং জমাতিয়াদের অন্যান্য জটিল সমস্যার সমাধান করে থাকেন। মোটকথা হদা হল জমাতিয়া উপজাতি সমাজ ব্যবস্থার সর্বময় কর্তা।

আট সদস্যবিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ হদার যাবতীয় কাজকর্মের প্রতি নজর রাখে এবং প্রয়োজনে জমাতিয়া সমাজের কল্যাণে যাবতীয় উপদেশ প্রদান করে।

জমাতিয়া সমাজ ব্যবস্থায় এক বোতল মদ অথবা এক টাকা ফিস গ্রামের চৌকদিরির নিকট জমা দিয়ে যে-কোনো জমাতিয়া বিচারপ্রার্থী হতে পারে। গ্রামের চৌকদিরি বা সর্দার বিচারের দিন সময় এবং স্থান ইত্যাদি নির্ধারণ করে বাদী এবং বিবাদী পক্ষকে সাক্ষীসহ বিচার সভায় উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেয়। গ্রামের সর্দারের বাড়িতে এই ধরনের বিচারসভা বসে। "খাম্ডোল" সাধারণত সর্দারের পক্ষে সভা ডাকে। বিচার সভায় বিস্তারিত আলাপ আলোচনা এবং সাক্ষী প্রমাণ নিয়ে দোষী ব্যক্তিকে জরিমানা করা হয়। জরিমানা কৃত অর্থ জমাতিয়াদের বারোয়ারি উৎসবে খরচ করা হয়। "লুকু"র বিচারে কেউ সন্তুষ্ট না হলে "ময়াল" এবং ময়ালের বিচারে সন্তুষ্ট না হলে "হদায়" বিচারপ্রার্থী হওয়া যায়।

জমাতিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে সমবায় ব্যবস্থা বহু প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত ছিল। যেমন জমাতিয়া পাড়াগুলিতে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান সমবেতভাবে সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে চকদৌরি অর্থাৎ গ্রামের সর্দারের নেতৃত্বে প্রতি পরিবার থেকে এক মুঠো চাউল "মুষ্টিচাউল" প্রতি সপ্তাহে সংগ্রহ করা হত। এই সংগৃহীত চাউল পাড়ার বিভিন্ন সামাজিক পূজা-পার্বণ, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি সুষ্ঠভাবে সম্পাদনের জন্য ব্যবহার করা হত। পূজা পার্বণের পর বছরের শেষে উদ্বৃত্ত চাউলের মূল্য "হদা অক্রা" তহবিলে জমা করে দেওয়া হত। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, গ্রামের গরিব, অক্ষম ব্যক্তিদের কাছ থেকে যদিও কোন প্রকার তহবিল সংগ্রহ করা হত না কিন্তু পূজাপার্ব্বণে গরিব, ধনী সকলে পূজা পার্বণের আনন্দ সমভাবে উপভোগ করত। মুষ্টি চাউলের তহবিল থেকে কাউকে ঋণ অথবা সাহায্য দেওয়া হত না, শুধুমাত্র সামাজিক পূজা পার্বণের জন্য খরচ করা হত।

এছাড়া, "ধর্মগোলা" পদ্ধতি ও উপজাতি সমাজ ব্যবস্থায় সমবায়ের অন্যতম উদাহরণ। জুম ফসল তোলার পর পাড়ার সকলে যৌথভাবে ধর্মগোলার সদস্য হয়।

প্রত্যেক পরিবার ১০ কিলোগ্রাম ধান ধর্মগোলায় জমা দিয়ে সদস্যপদ গ্রহণ করে। যদি পাড়ার মধ্যে কোনো গরিব অক্ষম পরিবার নির্ধারিত ধান জমা দিয়ে সদস্য পদে সক্ষম না হয় তখন পাড়ার সকলে যৌথভাবে সাহায্য করে নির্ধারিত ধান জমা দেয়। ধর্মগোলা থেকে পাড়ার যে কোনো পরিবার প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। ঋণ ফেরৎ দেওয়ার সময় ঋণ গ্রহীতা সুদ স্বরূপ বাড়তি ধান ধর্মগোলায় জমা দিতে বাধ্য থাকে। তবে সুদের হার গ্রামা মহাজনদের সুদের হার অপেক্ষা অনেক কম ধার্য্য করা হয়।

ত্রিপুরা রাজ্যের ১৯টি উপজাতির মধ্যে জমাতিয়া সম্প্রদায় প্রথম সমতলে স্থায়ী চাষবাস শুরু করে এবং জমাতিয়া পাড়াগুলির অর্থনীতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় প্রধানত কৃষি নির্ভর। বর্তমানে স্থায়ী চাষ আবাদের পাশাপাশি জুম চাষ ও জমাতিয়া সম্প্রদায় করে থাকে। সমতল জমিতে বলদ লাঙ্গলের কর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে আজকাল পাওয়ার টিলারের ব্যবহারও পরিলক্ষিত হয়। জমাতিয়া পাড়ায় মোটামুটি ১০-১২% পরিবার সম্পূর্ণ জুমচাষের উপর এবং ৭০-৭৫% পরিবার আংশিক জুম চাষ এবং আংশিক স্থায়ী চাষ আবাদের ওপর নির্ভরশীল। ১৯৮৭ সনে ত্রিপুরারাজ্যে মোট জমাতিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ২৯৪৯ জুমিয়া পরিবারের মধ্যে ৯৩৩ পরিবার ছিল গোঁড়া জুমিয়া এবং ২০১৬ পরিবার আংশিক জুমিয়া। মোট জুমিয়া জনসংখ্যা ছিল ১৬,২৯৮ জন। এদের মধ্যে ৭৫ জন জুমিয়া উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ২,১৮৮ জন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় এবং ১৪,০৩৫ জন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় বসবাস করতো।

বর্তমানে সমতলে বসবাসকারী জমাতিয়া পরিবারগুলির মধ্যে প্রায় ২০-২৪% পরিবার স্থায়ী চাষবাসের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। এ ছাড়া, ১০-১২% পরিবার ভাগচাষী জমাতিয়া পাড়ায় দেখা যায়। যারা স্থায়ী চাষবাসে অভ্যস্ত তারা রাসায়নিক সার, লোগ পোকার, ঔষধ উচ্চফলনশীল বীজ ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে। এ ছাড়া, স্প্রেয়ার, ডাস্টার, পাম্প মেশিন, ধান মাড়াই করার যন্ত্র, ইত্যাদি ব্যবহারেও সমতলবাসী জমাতিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে গোঁড়া জুমিয়া পরিবারগুলির সম্বল এখনও টাকাল, সার ও রাসায়নিক কীটনাশক ঔষধ তারা ব্যবহার করে না।

জমাতিয়া পাড়ায় বেশির ভাগ বাড়ীতে আজও কোমর তাঁত দেখা যায়। আগে জমাতিয়া রমণীরা জুমে উৎপাদিত তুলো থেকে নিজে সুতো তৈরি, রঙ করা ইত্যাদি সকল কাজ নিজ হাতে করতো এবং রিনয় (পাছড়া), রিসা (বক্ষাবরণী), চাদর ইত্যাদি বাড়িতে কোমর তাঁতের দ্বারা নিজেরা তৈরি করে পরিবারের সকলের চাহিদা মেটাতো। কিন্তু বর্তমানে, রঙীন সুতো সরাসরি বাজার থেকে কিনে পাছড়া, চাদর ইত্যাদি তৈরি করে। বেশির ভাগ মহিলারা আজকাল চিরাচরিত বক্ষাবরণী (রিসা) এর পরিবর্তে বাজারে ব্লাউসের ওপর নির্ভরশীল। হস্তচালিত কোমর-তাঁতে কাপড় বুনন শিল্পে জমাতিয়া মহিলাদের নক্সা, কাপড়ের গুণগতমান, টেকসই এবং সৌন্দর্য ইত্যাদি এখনো প্রশংসনীয়।

জমাতিয়া পাড়াগুলিতে চিরাচরিত পূজা যেমন গড়িয়া, সেনা, কের, অ্যাঁগন, লাম্প্রা, গঙ্গা, বুড়াদেবতা, মাইলুঙ্গমা খোঁলুঙ্গমা ইত্যাদির পাশাপাশি আধুনিক পূজা; যেমন— শনি, ত্রিনাথ, সরস্বতী, লক্ষ্মী, মনসা, দুর্গা, কালী ইত্যাদিও পরিলক্ষিত হয়।

ধর্মপ্রাণ জমাতিয়া পাড়াগুলিতে দোল-পূর্ণিমা, রথযাত্রা, ঝুলন, জন্মাষ্টমী, শিবচতুর্দশী ইত্যাদি অনুষ্ঠান এবং একাদশী, পালন করতেও দেখা যায়। অবস্থাপন্ন জমাতিয়া সম্প্রদায় দলবদ্ধ হয়ে তীর্থস্থান, বিশেষ করে গয়া, কাশী, বৃন্দাবন ভ্রমণে বেড়িয়ে পড়ে এবং পুণ্য অর্জন করে পুনরায় দেশে ফিরে আসে।

জমাতিয়া সম্প্রদায়ের যৌথ পরিবার বিভক্ত হলে প্রত্যেক পরিবার নিজ নিজ ফসলের দেবী মাইলুঙ্গমা (ধানের দেবী) এবং খোঁলুঙ্গমা (তুলোর দেবী)র ঘট স্থাপন করে। এই পূজার সময় দারবক (টাক্কাল), কুড়াল ইত্যাদি হাতিয়ার পূজার স্থানে ঘটের সামনে রেখে দেবীর আশীর্বাদ গ্রহণ করে থাকে।

চতুর্থ অধ্যায়

চাকমা

ত্রিপুরার উপজাতিদের মধ্যে জনসংখ্যার পরিসংখ্যানে চাকমা উপজাতি চতুর্থ স্থানে। ত্রিপুরারাজ্যের দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার অমরপুর এবং সাব্রুম মহকুমায়, উত্তর ত্রিপুরা জেলার কৈলাশহর এবং কাঞ্চনপুর মহকুমায় এবং ধলাই জেলার লংথরাই ভ্যালি এবং গন্ডাছড়া মহকুমায় চাকমা সম্প্রদায় অধিক সংখ্যায় বসবাস করে। চাকমা উপজাতি সরল, পরিশ্রমী এবং শান্তিপ্রিয়। চাকমা উপজাতি ত্রিপুরারাজ্য ব্যতীত আসাম, অরুণাচল প্রদেশ, মিজোরাম, বাংলাদেশের পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ও মায়ানামারে বসবাস করে। উল্লেখ্য যে, শেষোক্ত মায়নামারে বসবাসকারী চাকমারা 'ছৈননার্ক' নামে পরিচিত।

"চাকমা" বা "চাংমা" বর্মাশব্দ সাক-থেক (Tsak-Thek) এবং মা (Ma) অর্থাৎ বর্মী শব্দ মি (Mi) থেকে উদ্ভূত। ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাসকারী চাকমা উপজাতি সম্প্রদায় যারা প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাস করে তারা এখনও চাকমা শব্দের উচ্চারণ "চাংমা" করে থাকে।

ইতিহাসে দেখা যায়, 'মেচ্চাগ্রি' বা 'মাইসাংগিরি' নামীয় একটি চাকমা রাজ্য উত্তর আরাকানে ছিল। সেখানে থেকে সম্ভবত মগ তথা বর্মিদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে চাকমারা বর্তমান আরাকান সীমান্তবর্তী পার্বত্য চট্টগ্রামের মাতা মুহুরী উপত্যকাভুক্ত আলীকদমে ১৪৩৩ খ্রিঃ আশ্রয় গ্রহণ করে। উত্তর আরাকান থেকে মগদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে চাকমা উপজাতি সম্প্রদায় পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করতে শুরু করে তার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রাচীন চাকমা লোকগীতে যেমন—

ঘরত গেলে মগে পায়।
ঝারত গেলে বাঘে খায়॥
বাঘে ন খেলে মগে পায়।
মগে ন পেলে বাঘে খায়॥
যেই যেই বাপ-ভেই চল যেই।
চম্পক নগর ফিরি যেই॥
এলে মইস্যাং লালস নেই।
ন-এলে মইস্যাং কেলেশ নেই॥
যেই যেই বাপ-ভেই চল যেই।
চম্পকনগর ফিরি যেই॥

পার্বত্য চট্টগ্রাম চাকমাদের আরাকান থেকে আগমন মোগল আমলের শেষ সময় বলে ধরে নেওয়া যায়। কারণ শের মস্ত খাঁ ১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দে চাকমা অনুগামীদের নিয়ে মোগলদের অধীনে চট্টগ্রাম অঞ্চলে আনুষ্ঠানিক ভাবে পুনর্বাসন গ্রহণ করে এমন

প্রমাণ বিদ্যমান। আবার চাকমাগণ মগনারী ও মোগল সৈনিকদের মিলনজাত বংশধর এমন ধারণাও বিদ্যমান। কারণ চাকমা রাজবংশে খাঁ ও বিবি উপাধির প্রচলন ছিল। মুসলিম নাম খেতাব, খোদা ও দোজখ ইত্যাদি ইসলামি পরিভাষার প্রচলনও চাকমা সমাজে পরিলক্ষিত হয়। আবার চাকমা রাজাদের রাজকীয় সিলমোহরগুলিতে আরবী লেখার প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্তমান বাংলাদেশের রাঙ্গামাটির চাকমা রাজবাড়িতে রক্ষিত প্রত্নতত্ত্ব নিদর্শন—রাজা শের জব্বর খাঁর ব্যবহৃত সিলমোহর যার ভাষ্য হলো "রোসান, আরাকান, আল্লাহু রাবি, ১১১১ শের জব্বর খান।" এর দ্বারা প্রমাণিত হয় ঐ রাজার সময়কালে চাকমাগণ আরাকানের রোসাঙ্গ অঞ্চলে ছিলেন। এই সময়কাল, ঐ সিলমোহর অনুযায়ী ১১১১ মঘী মোতাবেক ১৭৪৯ খ্রিষ্টাব্দের শুরু।

কিন্তু আমাদের মতে, চাকমাদের মগ রমণী ও মুসলমান তথা মোগল সৈনিকদের অবৈধ জাত বলে ধরে নেওয়া ঠিক নয়। যেহেতু, প্রথমত, মুসলমানদের অনুরূপ 'খাঁ' উপাধি কেবল চাকমা রাজা বা সর্দারগণই ধারণ করতেন, প্রজারা নয়। পার্শ্ববর্তী অপেক্ষাকৃত শক্তিধর মোগল শাসকদের খুশি করা বা আনুগত্য প্রকাশের জন্যই তৎকালীন চাকমা রাজা বা সর্দারগণ সম্ভবত এই 'খাঁ' উপাধি ধারণ করতেন। এখানে উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়, আরাকানের 'রোসাঙ্গ' রাজ্যের মগ নরপতিগণও অনুরূপভাবে 'খাঁ' ও 'শাহ' উপাধি ধারণ করতেন কেবল মোগলদের আনুগত্য প্রকাশের জন্য। 'খাঁ' বা 'শাহ' উপাধি ধারণ করলেও তাঁরা বরাবর বৌদ্ধধর্মের অনুগামীই ছিলেন। চাকমা রাজাদের ক্ষেত্রেও তাই। তাঁদের রাজকীয় সিলমোহরে "আল্লাহ রাবি" উল্লেখ থাকলেও কদাপি ইসলাম ধর্মের অনুগামী ছিলেন বলে কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। তা-ছাড়া, কেবল 'খাঁ' উপাধি দিয়েই তাঁদের ইসলাম বলে সাব্যস্ত করা যায় না। যেহেতু, চেঙ্গিস খাঁ (বা খাঁন), 'কুবলাই খাঁ' এরা কি মুসলিম ছিলেন?

দ্বিতীয়ত, বার্মা ও আরাকানে 'থেক' (Thek – সাক বা সাক্য শব্দের বার্মিজ বিবর্তিত রূপ) নামে অখ্যায়িত চাকমারা বিকৃত বৌদ্ধধর্ম তথা বৌদ্ধ তন্ত্রযানে বিশ্বাসী ছিলেন বলে 'থেরবাদ' (অর্থাৎ স্থবিরবাদে)-এর অনুগামী বার্মিজগণ বারংবার চাকমাদের আক্রমণ করতেন—এই তথ্য বার্মিজ ইতিহাসে স্বীকৃত। বার্মিজ ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে যে, উল্লিখিত 'থেক' বা 'চাকমারা' বার্মার প্রাচীন জনগোষ্ঠীদের অন্যতম। সুতরাং তাদের মগ রমণী ও মোগল সৈন্যদের অবৈধ মিলনজাত একটি জনগোষ্ঠী বলে মনে করা সঙ্গত নয়।

তৃতীয়ত, কয়েকটি ইসলামিক শব্দের প্রচলন চাকমা ভাষায় লক্ষ্য করা যায় বলেই তাদের ইসলামদের সংস্পর্শে উদ্ভূত বলে মনে করার কোন যুক্তি নেই। ভাষা বহতা নদীর মতো। নদী যেমন বিভিন্ন ছোট ছোট নদী, ঝরণার জলধারা বহন করে চলে, ভাষাও তাই। চাকমা ভাষায় বহু আরবী, ফার্সি শব্দের পাশাপাশি অজস্র প্রাকৃত, পালি

ও সংস্কৃত শব্দের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং চাকমাদের উদ্ভবের ক্ষেত্রে মুসলমানদের সঙ্গে মগজাতির সংস্পর্শের বিষয়ে অনুমান করা কল্পনামাত্র।

যা হোক, ঐতিহাসিক তথ্য অনুযায়ী চাকমারা উত্তর আরাকান থেকে আরাকানিজ বা মগদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে কিছুকাল বর্তমান বাংলাদেশের মাতা-মুহুরী ও টেকনাফ এলাকায় অবস্থানের পর ক্রমশ পার্বত্য চট্টগ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। ব্রিটিশদের আগমনের পূর্বকাল পর্যন্ত তারা সেখানে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকে। ব্রিটিশদের সময়াকাল থেকেই চাকমাদের একটা অংশ পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে মিজোরাম ও ত্রিপুরায় ছড়িয়ে পড়ে।

ব্রিটিশ প্রশাসকদের প্রশাসনিক রিপোর্ট থেকে জানা যায় পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমারাণী কালিন্দী (১৮৪৪-৭৪ইং)-এর রাজত্বকালের শেষ দিকে ১৮৭২ সাল নাগাদ পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে ত্রিপুরায় প্রথম চাকমাদের আগমন ঘটে।

ত্রিপুরা রাজ্যে চাকমা উপজাতির জনসংখ্যা নিম্নরূপ ঃ

সন	জনসংখ্যা	সন	জনসংখ্যা
১৯০১	৪৫১০	১৯৩১	৮৭৫৬
১৯১১	৪৩১০	১৯৪১	১৯৪৪৯
১৯২১	৫৭৩৮	১৯৬১	২২৩৪৬

চাকমা ভাষা দক্ষিণ-পূর্ব্ব বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ত্রিপুরা রাজ্যে সমতলে বিশেষ করে পেঁচারতল, মাছমারা, কাঞ্চনপুর, ময়নামা অঞ্চলে বসবাসকারী চাকমা সম্প্রদায় বাঙ্গালীদের সঙ্গে বসবাস করার সুবাদে বাঙ্গালীদের সামাজিক রীতিনীতির প্রভাব অধিক পরিলক্ষিত হয়। চাকমা ভাষার বর্ণমালা, অক্ষর বর্ম্মা ভাষার বর্ণমালার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, অন্যদিকে চাকমাদের ভাষা বাংলা, অসমীয়া এবং উড়িয়া ভাষার সঙ্গে মিল পরিলক্ষিত হয়। চাকমা উপজাতি সম্প্রদায় বেশির ভাগ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও হিন্দু, বৈষ্ণব এবং ইসলাম ধর্মের প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়।

চাকমা উপজাতি বেঁটে থেকে মাঝারি ধরণের উঁচু হয় এবং উন্নত মাংসপেশী যুক্ত, পরিশ্রমী এবং শক্তিশালী উপজাতি, একজন পুরুষ ৫০-৬০ কিলোগ্রাম ওজন একসঙ্গে পরিবহণ করিতে সক্ষম। এরা মঙ্গোলীয়ানদের শারীরিক কাঠামো বহন করে। গায়ের রঙ ফর্সা, মুখমণ্ডলে এবং বুকে লোম খুবই কম অথবা থাকে না। চাকমা উপজাতি ত্রিপুরার অন্যান্য উপজাতিদের ন্যায় অমিতব্যয়ী এবং ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ের চিন্তা কম করে। তারা অন্যদের সঙ্গে খুব কম মেলামেশা করে এবং মেলামেশা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নিজের স্বজাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে পছন্দ করে। এরা খুবই ধর্মপ্রাণ এবং ধর্মীয় অচার অনুষ্ঠান ভক্তিসহকারে পালন করে।

চাকমা মহিলারা তাঁত এবং কাপড় বুনন শিল্পে খুবই পারদর্শী। মহিলারা আজকাল চওড়া পাছড়া কোমড় থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ঢেকে পড়ে এবং গায়ে ব্লাউজ পড়ে। শরীর চাদর অথবা গামছা দিয়ে ঢেকে রাখে। পুরুষেরা হাঁটু পর্যন্ত ধুতি কাপড় পড়ে এবং গায়ে গেঞ্জি ও শার্ট পড়ে।

চাকমা সম্প্রদায় ত্রিপুরার অন্যান্য উপজাতিদের ন্যায় মদ পানে খুব বেশি আসক্ত নয় তবে বাঁশের হুক্কায় তামাক অথবা বিড়ি, সিগারেট ইত্যাদি স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে অধিক পরিমাণে সেবন করে থাকে।

চাকমাদের মধ্যে আঞ্চলিক গোষ্ঠী বা কুলকে বলা হয় গোজা। গোজারা বিভিন্ন অঞ্চলে দলবদ্ধ হয়ে জুমচাষ করে। বর্তমানে বিভিন্ন চাকমা গোজারা মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—আমু, বামু, বোগা, বুঙ্গা, কালা, কুরা, লারমা, লেবা, মোলিমা, পোয়া, পোমা, রাঙ্গী, সেগে, তুমা, থের ইত্যাদি।

চাকমা সমাজ-ব্যবস্থায় রাজনৈতিক স্তরের শীর্ষে ছিলেন চাকমা প্রধান বা চাকমা চীফ। চাকমা চীফকে রাজা, রাণী উপাধিতে ভূষিত করা হত। চাকমা ইতিহাসে দেখা যায় পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা রাণী কালিন্দী ১৮৬০ সালে এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কালিন্দী রাণী ছিলেন চাকমা প্রধান ধরমবক্স খানের বিধবা পত্নী। অন্যদিকে প্রতিটি উপগোষ্ঠী বা গোজার প্রধানদের বলা হত দেওয়ান। এই দেওয়ানরা তার অধীনস্থ উপগোষ্ঠী থেকে কর আদায় করত এবং নিজের কমিশন ব্যক্তিগত ভাবে রেখে দেওয়ানরা সংগৃহীত কর চাকমা প্রধানকে দিত। চাকমা প্রধানরাও করের একটি অংশ নিজে রেখে বাকী কর সরকারের কাছে জমা দিত। এ ছাড়া, সব ফসলের এক-দশমাংশ পেতেন চাকমা প্রধানরা। যেমন— কোনো হরিণ, শুকর বা বন্যপ্রাণী শিকার করা হলে পশ্চাদ পদের রান (মাংসল অংশ) দেওয়ানকে দেওয়ার রীতি ছিল। দেওয়ানের বাড়িতে কোনো অনুষ্ঠান হলে প্রত্যেক প্রজা টাকা, খাবার এবং মদ সরবরাহ করত। এ ছাড়াও দেওয়ানরা প্রজাবর্গের কাছ থেকে বছরে তিন-চার দিনের বিনা পারিশ্রমিকে কাজ (বেকার খাটা) আদায় করত। গোজাদের গোষ্ঠী সংগঠন বেশি বড় হলে দেওয়ান প্রশাসনিক কাজকর্ম দেখাশুনা করার জন্য কর্মচারী বা "খেজা" নিযুক্ত করত। দেওয়ানদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য প্রতিবছর নির্দিষ্ট পরিমাণ চাউল, মদ এবং একটি মুরগি দেওয়া খেজাদের রেওয়াজ ছিল। দেওয়ানরা ছিলেন চাকমা গোজাদের রাজনৈতিক নেতা এবং মুখপাত্র। "দেওয়ান" উপাধি চাকমা শব্দ নয়, উর্দু ভাষা থেকে ধার করা শব্দ যার অর্থ "অধিকর্তা"। প্রাচীনকালে দেওয়ানরা চাকমা সমাজে "তালুকদার" এবং চাকমা রাজা বা চাকমা প্রধানরা সমতলের জমিদারদের ন্যায় ভূমিকা পালন করত। দেওয়ানরা নিজেদের এলাকার ঝগড়া বিবাদ মেটায়।

ত্রিপুরারাজ্যে বসবাসকারী চাকমা উপজাতি সম্প্রদায় ত্রিপুরার অন্যান্য উপজাতি সম্প্রদায়ের ন্যায় গান-বাজনায় তত উন্নত নয়। তবে চাকমাদের কিছু কিছু লোকগীত

খুবই জনপ্রিয়। চাকমাদের বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে চিরাচরিত সিঙ্গা, ডুলুক, ক্ষেঙ্গারাঙ্গ ইত্যাদি। আজকাল আধুনিক বাদ্যযন্ত্র, যেমন—হারমোনিয়ম, গিটার, তবলা ইত্যাদির দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে যাচ্ছে। চাকমাদের জনপ্রিয় গানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—রাধামন, ধনপতি পালা, রাজা সাধেং গিরিপালা, গেঙ্গছুলি গীত ইত্যাদি। এই সকল পালা গানের মাধ্যমে চাকমা উপজাতি সম্প্রদায় চিরাচরিত পূজা-পার্বণ করে থাকে। চাকমা উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে নাচেরও তেমন প্রচলন নেই। তবে আজকাল শিক্ষিত এবং শহর অঞ্চলে বসবাসকারী ছোট ছেলেমেয়েদের নাচ শিখতে দেখা যায়। চাকমা উপজাতি যাত্রাগান বেশ উপভোগ করে।

দু ধরণের অনুষ্ঠান চাকমা উপজাতির মধ্যে পরিলক্ষিত হয় যেমন ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং সামাজিক অনুষ্ঠান। চাকমা উপজাতি সম্প্রদায় ভূত, প্রেতাত্মা ইত্যাদি বিশ্বাস করে। তারা দুষ্ট আত্মার পূজা পার্বণও করে যেন তাদের আশীর্বাদে পুষ্ট হয়ে ধন-সম্পত্তি এবং সংসারের সুখ সমৃদ্ধি হয়। অন্যান্য পূজাপার্বণ যেমন "থানমানা", "গাংমানা" ইত্যাদিও পালন করে বিশেষ করে পরিবার এবং গ্রামকে দুষ্ট আত্মার হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে। চাকমা উপজাতির মধ্যে একজন অন্যের প্রতি রুষ্ট হলে "চালান" বা "আঙ" এর ওপর বিশ্বাস করে। যে-সকল "চালান" বা "আঙ" চাকমা সমাজে প্রচলিত আছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—ভূত চালান, যাদু চালান, পুরি চালান ইত্যাদি। এই চালানগুলি ভাল এবং মন্দ দুই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়।

চাকমা সম্প্রদায়ের মধ্যে দুই পদ্ধতির বিবাহ পরিলক্ষিত হয়। ১। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিবাহ, ২। সামাজিক রীতিনীতি পালনের মাধ্যমে বিবাহ। চাকমা সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ সাধারণত অভিভাবকগণ স্থির করে থাকে। স্ত্রী স্বামীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সর্বদা ব্যস্ত থাকে। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিবাহ পদ্ধতি অবস্থাপন্ন সমাজে পরিলক্ষিত হয়। এই ধরণের বিবাহ বৌদ্ধ ভিক্ষু ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন করে এবং বেশ ধূমধামের সঙ্গে হয়।

সামাজিক বিবাহ গ্রাম—পাহাড় অঞ্চলে বসবাসকারী সাধারণ পরিবারের মধ্যে অধিক পরিলক্ষিত হয়। গ্রাম-পাহাড়ের চাকমা ছেলেদের ২০-২২ বছর হলে পিতামাতা পাত্রীর সন্ধানে খোঁজ-খবর নেওয়া শুরু করে। উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধান পেলে ছেলের পক্ষ থেকে তাদের কোনো পুরুষ আত্মীয়কে মেয়ের বাড়িতে ঘটক হিসাবে প্রেরণ করা হয়। যদি প্রাথমিক আলাপ আলোচনায় মেয়ের পক্ষ রাজী হয় তারপর একটি দিন ধার্য করা হয় উভয়পক্ষের অভিভাবকদের মধ্যে বিয়ের ব্যাপারে বিস্তারিত আলাপ আলোচনার উদ্দেশ্যে। এই আলাপ-আলোচনা মেয়ের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিন ছেলের পক্ষ থেকে এক বোতল দেশিমদ মেয়ের বাড়িতে দেওয়া হয় এবং ছেলের পক্ষ রাত্রে খাওয়াদাওয়া করে মেয়ের বাড়িতে রাত্রি যাপন করে।

তারপর ছেলের পক্ষ কয়েকদিনের মধ্যে মেয়ের বাড়ি দ্বিতীয় বার যায়। এই বার

এক বোতল মদ এবং পিঠা সঙ্গে নিয়ে যায়। দ্বিতীয় বারের আলাপ-আলোচনা ফলপ্রসূ হলে কিছু দিনের মধ্যে ছেলে পক্ষ তৃতীয় বার মেয়ের বাড়ি যায়। তৃতীয় বার যাওয়ার সময় পর্যন্ত পরিমাণ মদ, পিঠা এবং অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে যায়। এই দিন ছেলে এবং মেয়ে পক্ষ বিয়ের ব্যাপারে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা করে এবং বিবাহের দিন ক্ষণ স্থির করে।

বিয়ের পূর্বের দিন বরপক্ষ বিয়ের শর্ত অনুযায়ী নূতন কাপড়, অলংকার, বিয়ের বাদ্য ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে কনের বাড়ি আসে। তারপর কনে নূতন কাপড় চোপড়, অলংকার ইত্যাদি পড়ে। সারারাত্র কনের বাড়ি উৎসবের আনন্দ ফুর্তিতে সরগরম থাকে। পরদিন সকাল বেলা খাওয়া দাওয়ার পর্ব শেষ করে কনে পক্ষ কনেকে নিয়ে বরের বাড়ি আসে এবং ঐ দিন রাত্রে বরের বাড়িতে বিয়ের কাজ সম্পাদন করা হয়। বিয়ের সময় বর এবং কনেকে পাশাপাশি বসানো হয়। তারপর তাদের আত্মীয়দের মধ্যে একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা বর কনেকে একটি সাদা কাপড় দিয়ে বেঁধে 'দেওয়া'কে বলা হয় 'জরাবানা'। জরাবানার আগে সামাজিক অনুমোদন আবশ্যক, তারপর কনে বরকে ভাত এবং পান খাওয়ায়। অনুরূপ বরও কনেকে খাওয়ায়। এখন সাদা কাপড়ের গিট খুলে নেওয়া হয় এবং বিয়ের কাজ সুসম্পন্ন হয়।

চাকমাদের বিয়ের সময় একটি মোরগ উৎসর্গ করা হয় এবং মোরগের জিহ্বা বের করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর এই বিবাহের ফলাফল এবং ভবিষ্যৎ-এ নবদম্পতি সুখী হবে কিনা? তাদের কত জন সন্তান হবে? প্রথম সন্তান ছেলে না মেয়ে হবে ইত্যাদি বিষয়ে আলাপ আলোচনা এবং হাস্যকৌতুক করা হয়।

চাকমা সমাজে বহুবিবাহ প্রথার প্রচলন আছে। এই বিয়েকে বলে "চামুলঙ"। এক স্ত্রীর বর্তমানে দ্বিতীয় বিবাহ করার সময় বরকে কনের মূল্য বাবদ ধান, গৃহপালিত পশু এবং নগদ অর্থ ইত্যাদি প্রদান করতে হয়।

চাকমা সম্প্রদায়ের মধ্যে ছেলে মেয়েদের প্রেম প্রীতি ও ভালবাসার বিবাহ ও পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে মেয়ের পিতামাতার সম্মতি থাকা আবশ্যক। মোটকথা চাকমা সমাজে বিবাহে মেয়ের পিতামাতা বা অভিবাবকদের মতামত প্রাধান্য পায়। যদি ছেলে মেয়ে পিতামাতার সম্মতি ব্যতীত পালিয়ে যায়, তবে এই ক্ষেত্রে মেয়ের পিতামাতা কনের মূল্য বাবদ অধিক পরিমাণ যৌতুক ও অর্থ আদায় করে থাকে।

বিয়ের কাজ সুসম্পন্ন হলে নবদম্পতি তাদের সকল গুরুজনদের আশীর্বাদ গ্রহণ করে। চাকমা সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদ গ্রহণযোগ্য এবং পুনর্বিবাহ বা বিধবাবিবাহে কোন প্রকার বাধা-নিষেধ নেই।

মৃত্যুর পর চাকমাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বেশ ধূমধামে, জাঁকজমক এবং আড়ম্বরের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়। চাকমা সম্প্রদায় শবদাহ করে এবং মৃত্যুর পর বড় ধরণের অনুষ্ঠান পালন করে থাকে এবং সামাজিক ভোজনের ব্যবস্থাও করে।

চাকমা সম্প্রদায়ের কেউ মারা গেলে তার নিকট আত্মীয়-স্বজনেরা না পৌঁছানো পর্যন্ত একটি কাঠের বাক্সের মধ্যে ৫-৭ দিন শব রেখে দেওয়া হয়। তারপর স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে সমবেত হয়ে শবদাহ করে এবং প্রত্যেকের সামর্থ্য অনুসারে সাহায্য করে। এ ছাড়া, অভাবের দিনে অথবা অসময়ে মৃত্যু হলে শব সাময়িক কবরস্থ করে রক্ষা করা হয়। কবরস্থ করার সময় পুরুষের ক্ষেত্রে মাথা পূর্বদিকে এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে মাথা পশ্চিমদিকে স্থাপন করা হয়। তারপর সুবিধামত সময়ে নিকট আত্মীয়-স্বজনেরা একত্রিত হয় এবং ধূমধামের সহিত শব কবর থেকে বের করে দাহের ব্যবস্থা করে। চাকমা সম্প্রদায়ের শ্মশান নদীর ধারে বা নদীর বাঁকে করা হয়। চাকমারা পুনর্জন্মে বিশ্বাসী। শবদাহের পরদিন নিকট আত্মীয়-স্বজন, মৃতের ছেলে, ভাই শ্মশানে যায় এবং সাতটি হাড় সংগ্রহ করে, মাটির হাড়িতে রাখে এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পর নদীর জলে ডুবিয়ে দেয়। শ্রাদ্ধের সময় মৃত ব্যক্তির সকল ছেলে মাথা মুণ্ডন করে। চাকমা উপজাতি সম্প্রদায় মৃতের জন্য ছয়দিন শোক পালন করার পর, সাতদিনের দিন শ্রাদ্ধকার্য সম্পন্ন করে থাকে। বৌদ্ধ ভিক্ষু এই শ্রাদ্ধের কাজ সম্পাদন করে। শ্রাদ্ধের সময় সাধ্য অনুসারে বৌদ্ধ ভিক্ষুকে দান সামগ্রী প্রদান করা হয়। শ্রাদ্ধের সময় সকল গ্রামবাসী সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করে এবং সামাজিক ভোজের মাধ্যমে শ্রাদ্ধকার্য সম্পন্ন হয়।

চাকমা সমাজে অবস্থাপন্ন পরিবারের কারো মৃত্যু হলে শবযাত্রার সময় মৃতদেহ রথে চড়িয়ে নেওয়ার রেওয়াজ পরিলক্ষিত হয়। রথ টানা উৎসব-সম্পন্ন শ্রাদ্ধে টাকা পয়সা এবং দান সামগ্রী অধিক পরিমাণে ব্যয় করা হয়।

চাকমা সামাজিক ব্যবস্থাপনায় কতকগুলি নিজস্ব আইন কানুন প্রচলিত আছে। নীচে তার কয়েকটি সংক্ষেপে আলোচনা করা হল—

১। জুম চাষের জন্য কোনো চাকমা উপজাতি কৃষক বনভূমি চিহ্নিত করলে অন্য কেউ ঐ স্থানে জুম চাষ করতে পারবে না অথবা ঐ নির্বাচিত বনভূমিতে অন্য ধরণের কাজ-কর্মও করতে পারবে না।

২। চাকমা উপজাতি সম্প্রদায়ের বৈমাত্র ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ।

৩। কাহারো স্বামী অথবা স্ত্রীর মৃত্যু হলে সাতদিন পর শ্রাদ্ধ না হওয়া অবধি দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারবে না।

৪। একই গোষ্ঠীর মধ্যে পাঁচ পুরুষ পর্যন্ত অন্তর্বিবাহ নিষিদ্ধ।

৫। গোষ্ঠী পুরুষদের বংশ অনুযায়ী পরপর বাহিত হয়। মেয়েদের মাধ্যমে গোষ্ঠী বাহিত হয় না। মেয়েরা বিয়ের পর পিতৃগোষ্ঠী পরিবর্তন করে স্বামীর গোষ্ঠী গ্রহণ করে থাকে।

উৎসব ব্যতীত নির্জন স্থানে একাকী নাচ, গান আনন্দোৎসব ইত্যাদি করা নিষিদ্ধ।

৬। লোকালয়ে গালিগালাজ করা, নিষিদ্ধ শব্দ উচ্চারণ করা অথবা অসভ্য ভাষা ব্যবহার করা দণ্ডনীয় অপরাধ।

৭। বসতঘরে জুতা পায়ে দিয়ে বহিরাগতের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

৮। চাকমাদের চামুলং অথবা সোমৌলং বিবাহ পদ্ধতিতে গ্রামের পুরোহিত বা ওঝা মুরগি, শূকর ইত্যাদি উৎসর্গ করে। বর কনে পাশাপাশি বসে ভক্তি সহকারে আশীর্বাদ গ্রহণ করে।

৯। অবিবাহিত ছেলে অথবা মেয়ে যৌনাচারের ধর্মীয় নিষেধ অমান্য করলে গ্রামের মাতব্বরেরা দুজনকে শাস্তিস্বরূপ একটি শূকর জরিমানা করে। ফলে চাকমা সমাজে ছেলে মেয়েদের মধ্যে অবৈধ মেলামেশার মধ্যে প্রতিবন্ধকতা, সামাজিক এবং ধর্মীয় বিধি-নিষেধ বিরাজমান।

১০। যদি কোনো অশুভ আত্মা অথবা ছোঁয়াছে রোগ কোনো বাড়িতে অথবা গ্রামে প্রবেশ করেছে সন্দেহ হয় তখন একটি সাদা অথবা কালো রঙের পতাকা পুঁতে এলাকা চিহ্নিত করা হয় এবং কিছু নির্দিষ্ট সামাজিক লোকাচার পালন করে, ঐ এলাকায় অন্যদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। কেউ এই আইন ভঙ্গ করলে বিচারে তার শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়।

ত্রিপুরারাজ্যে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী চাকমা উপজাতি এখনও জুম চাষের ওপর নির্ভরশীল। তাদের উৎপাদিত ফসলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-জুমধান, ভুট্টা, তিল, তুলো, মেস্তা ইত্যাদি। সমতলে বসবাসকারী চাকমা উপজাতি উচ্চফলনশীল ধান, গম, সরিষা, শাকসবজি বিশেষ করে মূলা, বেগুন, আলু, কুমড়ো, লাউ, করলা, ক্ষিরাই ইত্যাদির চাষ করে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী চাকমা উপজাতি সম্প্রদায় নূতন জুমের জমির খোঁজে স্থান পরিবর্তন করা। ত্রিপুরারাজ্যে ১৯৮৭ সালে চাকমা উপজাতির গোঁড়া জুমিয়া পরিবারের সংখ্যা এবং আংশিক জুমিয়া পরিবারের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১,৮৪৯ এবং ৩,১২৬ পরিবার। মোট চাকমা জুমিয়া জনসংখ্যা ছিল ২৭,৮৩৭ জন। কিন্তু সমতলে বসবাসকারী চাকমা উপজাতি সম্প্রদায় চাষবাসের উন্নত প্রযুক্তি; যেমন—উচ্চ ফলনশীল বীজ, পাওয়ার টিলার, স্প্রেয়ার, ডাস্টার, পাম্প মেশিন, সার ও ফসলের রোগ-পোকার ঔষধ ইত্যাদি ব্যবহারে অভ্যস্ত। এ ছাড়া, জল বিভাজিকা প্রকল্পে বসবাসকারী চাকমা উপজাতিরা বিভিন্ন ধরণের ফল ও বাগিচা ফসল বিশেষ করে আনারস, সুপারি, আদা, হলুদ ইত্যাদি চাষের মাধ্যমে এবং মৎস্যচাষ ও পশুপালনের মাধ্যমে স্বনির্ভর হওয়ার জন্য সচেষ্ট হয়েছে।

প্রাচীনকালে ত্রিপুরারাজ্যে চাকমা উপজাতি সম্প্রদায় উঁচু পাহাড়ের উপর ও ঢালে জুমচাষ ব্যতীত দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী নিচু লুঙ্গা জমিতে গর্জ্যা ধান চাষ করত। এই চাষ পদ্ধতিতে দুটি পাহাড়ের মধ্যে বাঁধ দিয়ে নিচু জমিতে জল ধরে রাখা হয় ফলে জলের তলায় বনজ গুল্ম, পাতা ইত্যাদি পচে জৈব সারে পরিণত হয়। কয়েক মাস পর ঐ স্থানের জল ছেড়ে মাছ ধরে নেওয়া হয় এবং গর্জ্যা ধান বীজের অঙ্কুর উদগমের পর বপন করা হয়। তারপর ধান গাছের বৃদ্ধির সাথে সংহতি রেখে জমিতে জল

ধরে রাখা হয়। ধান পাকার সময় পুনরায় জল ছেড়ে মাছ ধরা হয় এবং জমি থেকে শুধুমাত্র ধানের ছড়া সংগ্রহ করে ফসল তোলা হয়। চাকমা উপজাতির প্রাচীন গর্জ্যা ধান চাষ পদ্ধতি আধুনিক মাছ এবং ধান (Fish cum paddy) চাষের অনুরূপ পদ্ধতি বলা যায়। জমির স্বল্পতার জন্য বর্তমানে ত্রিপুরারাজ্যে গর্জ্যা ধান চাষ খুবই বিরল তবে অরুণাচল প্রদেশ এবং মিজোরামে বসবাসকারী চাকমা উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে গর্জ্যা ধান চাষ পদ্ধতি বিরাজমান।

চাকমা উপজাতির জুম কৃষির সঙ্গে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান এবং কৃষ্টির সংযোগ পরিলক্ষিত করা যায়। যেমন চাকমা উপজাতি জুমিয়া জুম জমি নির্বাচনের সময় শুভাশুভ বিচারে বিশ্বাসী। গোসাপ, মড়া বাঁদর, মরা পাখি অথবা জমিতে গভীর সুড়ঙ্গ বা খাদ দেখলে ঐ জমি জুমচাষের জন্য নির্বাচনে বিরত থাকে। জুমের জমি পছন্দ হলে "সাগা চিহ্ন" বাঁশের ক্রসচিহ্ন দিয়ে খুঁটি পুঁতে স্বত্ব আরোপ করে। জুমের বন-জঙ্গল কাটা শুরু করার আগে সকলে মিলেমিশে "থানমানা" পূজা করে। যৌথ ভাবে থানমানা পূজায় মাঘ মাসে গ্রামের মঙ্গল কামনার্থে চৌদ্দ জন দেবতার আরাধনা করা হয়। পূজারী বা অঝা পূজা শেষে ভবিষ্য বাণী করে। এই পূজায় গ্রামের সকলে চাউল এবং নগদ টাকা চাঁদা হিসাবে প্রদান করে। পূজার সময় মাংস, ভাত, মদ ইত্যাদির ভূরিভোজের মাধ্যমে গ্রামের সকলে আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠে। জুমের বিভিন্ন কাজ সময়মত শেষ করার জন্য চাকমা জুমিয়া পরিবারগুলি "শ্রম বিনিময়" পদ্ধতি মেনে চলে। চৈত্রের শেষে জুম পোড়া দেওয়ার সময় চাকমা জুমিয়া চাষী "লর্মা পূজা" বা অগ্নিদেবতার পূজা করে। এই পূজায় একটি মোরগের বাচ্চা উৎসর্গ করা হয়। পূজার উপকরণ সামগ্রীর মধ্যে জল, ফুল এবং হাতপাখা উল্লেখযোগ্য। চাকমা জুমিয়া চাষীর ধারণা অগ্নি দেবতা সন্তুষ্ট হলে সুষ্ঠভাবে জুম পোড়ার কাজ সম্পন্ন হবে এবং জুম পোড়ার সময় বাতাসের গতিবেগ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। এ ছাড়াও চৈত্রমাসের শেষ দুদিন এবং পয়লা বৈশাখে চাকমা উপজাতি ধূমধামের সঙ্গে বিজু উৎসব অর্থাৎ ফুল বিশু, মূল বিশু এবং গোজ্যা-পোজ্যা পালন করে বিশেষ করে জুম বীজ বপনের আগে। এই উৎসবে নাচ গানের উদ্দেশ্য হল জুমের ফলন বৃদ্ধি করা। বিজু উৎসবের তিন দিন, সন্ধ্যা সময় নদীর পাড়ে, ঘরের সিঁড়িতে, ঘরের মাঝে খুটিতে, ঘরের চালে এবং ঢেকির ঘরে প্রদীপ প্রজ্বলন করা হয় বিশেষ করে জলদেবী (গঙমা), বৃষ্টিদেবতা (দেবা) এবং লক্ষ্মীদেবীকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে। আষাঢ় মাসে অম্বুবাচির সময় একদিন চাকমা উপজাতি "হালপালনি" অর্থাৎ কৃষিকাজ থেকে বিরত থাকে। জুমফসলের কৃষিশত্রু নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান চাকমা জুমিয়ারা পালন করে। যেমন "চেরেই পুরু" দমনের উদ্দেশ্যে শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে টং ঘরে সাদা কাপড় লাগিয়ে রাত্রে আগুনের মশাল জ্বালানো হয় এবং বাঁশের কাঠির সাহায্যে শব্দ করা হলে অসংখ্য পোকা এসে হাজির হয়। চাকমা উপজাতি পোকাগুলি মেরে ভাজি করে খায় এবং ফসল রক্ষা করে।

আবার নির্বাচিত জুমের জমিতে উই পোকার ঢিপির সংখ্যাধিক্য পরিলক্ষিত হলে চাকমা জুমিয়া কৃষক জুম ধান বপনের সময় "উই রাজার" উদ্দেশ্যে উই ঢিপিতে একটি মোরগ উৎসর্গ করে যেন উই পোকা জুম ফসলের ক্ষতিসাধন না করে। বাঁশবনে ফুল ফল এলে সেই বছর ফসলের ইঁদুরের উৎপাত বৃদ্ধি পাবে এমন ধারণা চাকমা উপজাতি পোষণ করে। তাই ইঁদুর নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে "রাখ্যায়াল দেবতার" পূজা করে। জুম ধান কাটার সময় মোরগ উৎসর্গ করে "ধান ফবং" পূজা এবং ফসল ঘরে তোলার পর "নুঅ ভাত" বা নবান্ন উৎসব চাকমা উপজাতির কৃষি ও কৃষ্টির অন্যতম অঙ্গবিশেষ।

পঞ্চম অধ্যায়

হালাম

হালাম উপজাতি সম্প্রদায় কুকি উপজাতি সম্প্রদায় থেকে উদ্ভূত। এমনও শোনা যায়, কুকি উপজাতি সম্প্রদায় ত্রিপুরারাজ্যে ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের আগমনের পূর্ব থেকে বসবাস করতো। যে সকল কুকি সম্প্রদায়ের গোষ্ঠী ত্রিপুরার মহারাজের অনুগত ছিল তাদের হালাম সম্প্রদায় হিসাবে গণ্য করা হত। হালামদের পূর্ব পুরুষগণ উত্তর পশ্চিম মণিপুরের খোরপিলতাভিম গ্রামের অধিবাসী ছিল এবং সম্ভবত মণিপুর থেকে ত্রিপুরায় এসে বহু প্রাচীন কালে বসবাস-শুরু করে। বর্তমানে ত্রিপুরারাজ্যে বসবাস কারী উনিশটি উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে জনসংখ্যার বিচারে পঞ্চম স্থানে আছে। ১৯৮১ সালের হিসাব অনুযায়ী ত্রিপুরা রাজ্যে মোট হালাম উপজাতির সংখ্যা ছিল ২৯০৪০ জন, তারমধ্যে অধিক সংখ্যক হালাম উপজাতির বাস উদয়পুর, কমলপুর, অমরপুর, ধর্মনগর, সদর, খোয়াই, কৈলাশহর এবং সোনামুড়া মহকুমায়। ত্রিপুরা রাজ্যের ১৯৮৭ সালের জুমিয়া পরিসংখ্যানে দেখা যায় মোট ৩৯২১ হালাম পরিবার জুমচাষের উপর নির্ভরশীল, তার মধ্যে ১৭৫২ পরিবার গোঁড়া জুমিয়া এবং ২১৬৯ পরিবার আংশিক জুমচাষের ওপর জীবন জীবিকার জন্য নির্ভরশীল। ঐ সময়ে মোট ২০৮৭১ জন হালাম উপজাতিভুক্ত জুমিয়া জনসংখ্যার মধ্যে ৮৯৩৯ জন উত্তর ত্রিপুরা জেলায়, ৭৮৮২ জন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় এবং ৪০৫০ জন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় বসবাস করতো।

ত্রিপুরায় বসবাসকারী হালাম উপজাতি সম্প্রদায় যদিও কুকি বংশধর তথাপি ত্রিপুরীদের সংস্পর্শে এসে ত্রিপুরীদের সামাজিক জীবনধারা রপ্ত করে। পুরাতন কালে ত্রিপুর রাজ্য কিরাটদের রাজধানী রাঙ্গামাটিয়া (বর্তমান উদয়পুর) দখল করলেও কিছু সংখ্যক কিরাতবাসী কুকি সম্প্রদায় মহারাজের সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করেনি। সম্ভবত তারা হল ডারলং কুকি। তাদের "রাজা" বা "লাল" স্থানীয় শাসনব্যবস্থা কায়েম রাখে এবং ত্রিপুরার মহারাজাও তার অনুমোদন দেন। কিন্তু বেশিরভাগ কিরাত গোষ্ঠী হালাম সম্প্রদায় ত্রিপুরার রাজাদের আনুগত্য স্বীকার করে ত্রিপুরীদের সঙ্গে মিলেমিশে শান্তি প্রিয় প্রজা হিসেবে জীবন যাপন শুরু করে। ত্রিপুরার মহারাজা তাদের সৈন্য-বাহিনীতেও অধিক সংখ্যক নিযুক্ত করতেন এবং বিজয়া দশমীর "হাসম" ভোজনের সময় তাদের যথেষ্ট আদর আপ্যায়ন করতেন। ফলে হালামদের মধ্যে কুকি এবং ত্রিপুরীদের শিল্প সংস্কৃতি পরিলক্ষিত হয়। ত্রিপুরার "রাজমালায়" দেখা যায় হালাম উপজাতির ১৩টি গোষ্ঠী ছিল সেগুলি হল ১। রাংখল ২। মলসুম, ৩। কাইপেং, ৪। রূপিণী, ৬। কলই, ৭। খুলুং, ৮। চড়াই, ৯। মছরাং, ১০। লঙ্গাই, ১১। বংশেল, ১২। কর্ব্বং, ১৩। ফুতিলাংলা, ১৯৩১ সালের ত্রিপুরা গেজেটে দেখা যায় হালাম সম্প্রদায়ের মধ্যে ৯টি উপজাতি গোষ্ঠী

দেখানো হয়েছে। যেমন,—১। মলসুম, ২। কাইবেঙ, ৩। রাংখল , ৪। কলই , ৫। বঙ্গ শেল, ৬। রূপিণী ৭। কররঙ, ৮। থাংচেপ, ৯। চৌরাই। আবার ১৯৪০ সালের ত্রিপুরা গেজেটে দেখা যায়, হালাম উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে ১৬টি গোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমন (১) কাইপেঙ (২) রাংখল (৩) কলই (৪) মুরচলঙ (৫) কইরেঙ (৬) কররঙ (৭) কুলু (৮) চৌরই (৯) ড্যাপ (১০) থাংচেপ (১১) স্যাকচেপ (১২) নবীন (১৩) লংলুঙ (১৪) রূপিণী (১৫) বঙশেল (১৬) লঙ্গাই। প্রতিটি গোষ্ঠী সর্দারের নাম অথবা বাসস্থানের নাম অথবা নদী, পর্ব্বত ইত্যাদির নাম অনুসারে পরিচিতি লাভ করে।

প্রাচীন কালে কুকি উপজাতিরা এক স্থানে বসবাস করতো না তারা সমতল অঞ্চলে হানা দিত, জুম চাষ করতো ফলে জীবনের বেশির ভাগ সময় মাটির পথে হাঁটতে হত। ককবরকে "হা" অর্থ মাটি এবং "লাম বা লামা" অর্থ পথ, তাই যে উপজাতি সম্প্রদায় মাটির পথে বেশির ভাগ সময় চলাফেরা করতো তারাই হল হালাম উপজাতি। অন্যমতে যে কুকি উপজাতি সম্প্রদায় মহারাজের বশ্যতা স্বীকার করে ত্রিপুরীদের ধর্ম, ভাষা এবং সামাজিক রীতিনীতি রপ্ত করে কৃষিকাজ শিখে জীবন জীবিকার পথ বেছে শান্তিময় জীবনযাপন করতে শুরু করে, তারাই হল হালাম। ধলাই জেলার কমলপুরের প্রধান হালাম সম্প্রদায় ভুক্ত শ্রীরিজা মোহন বংশীর মতানুসারে যে উপজাতি কুকি সম্প্রদায় ত্রিপুরা মহারাজের আনুগত্য স্বীকার করেছিল, তারাই হালাম। ত্রিপুরার অধিবাসীদের কাছে হালাম সম্প্রদায় "মিলা কুকি" নামেও পরিচিত ছিল।

হালাম উপজাতি সম্প্রদায় অন্যান্য মঙ্গোলিয়ান জাতির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ, তাদের শরীর শক্তিশালী, উচ্চতা মাঝারি ধরণের, নাক চ্যাপ্টা, চোখ ছোট, গায়ের রঙ শ্যামলা থেকে ফর্সা, মুখে ও বুকে লোম কম। হালাম সম্প্রদায়ের মধ্যে শাক্ত প্রভাব পরিলক্ষিত হলেও কলই, রূপিণী গোষ্ঠীর মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই সম্প্রদায় হিন্দু ধর্মের অনুরূপ বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা অন্যান্য উপজাতিদের ন্যায় করে থাকে। হালাম উপজাতির বিশ্বাস ভগবান এক এবং অভিন্ন তবে ভগবানের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন রূপে বিরাজ করে। তারা আত্মাবাদের তত্ত্ব বিশ্বাস করে। তাদের বিশ্বাস, দেবদেবী এবং আত্মাকে পূজাপার্বণ এবং পশুপাখি উৎসর্গ করা হলে ফসল হানি, মহামারী রোগ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। হালামদের বিশ্বাস বহু বিদেহী আত্মা সবসময় আশপাশে ঘোরাফেরা করে। এই আত্মাগুলি নবজন্মের জন্য মাতৃগর্ভে আসে। তাদের পূজাপার্বণ দিয়ে সন্তুষ্ট রাখতে পারলে তারা শান্তিতে বসবাস করতে সক্ষম হবে। হালামদের মধ্যে অলৌকিক বিশ্বাসও বিদ্যমান। তারা যাদুমন্ত্র, ডাকিনী বিদ্যা, পাহাড়ে পর্বতে, নদীতে, গাছগাছড়ায় বহু উপদেবতার উপস্থিতিতে বিশ্বাসী। হালাম সম্প্রদায়ের ধারণা মানুষ রাত্রে ঘুমালে তার আত্মা শরীর থেকে বাইরে এসে ফড়িং রূপ ধারণ করে ঘুরে বেড়ায় তাই তারা রাত্রে ফড়িং মারে না। উৎপাদিকা

শক্তিদেবীর পূজা হালাম সম্প্রদায় করে থাকে। ফসল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শস্যগোলাকে মোরগ, শূকর ইত্যাদি উৎসর্গ করে পূজা দেয়। জলের দেবী "তুইমা", ধানের দেবী "সেরিং আর্থা", তূলোর দেবী "লাকুমফই" বনদেবী "হাচুংমা" মাঙ্গলিক দেবতা "পায়েংফা, নারীর বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণের দেবতা" আরকান থাও রবল" ইত্যাদি দেবদেবীর পূজাও করে থাকে। কেরপূজা হালাম সম্প্রদায়ের অবশ্য করণীয় পূজার অন্যতম। ত্রিপুরার রাজবাড়ির কের পূজা শেষ হওয়ার পর হালাম সম্প্রদায় কের পূজা করে। কের পূজার সময় হালাম পাড়ায় বা গ্রামে বহিরাগতের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এমনও শোনা যায় প্রাচীন কালে এই আইন অমান্যকারীর শাস্তি ছিল মৃত্যু। হালাম সম্প্রদায়ের জাঁকজমকপূর্ণ পূজা হল বড় পূজা। বড় পূজা ব্যয় সাপেক্ষ বলে বিভিন্ন এলাকার হালাম সম্প্রদায় যৌথভাবে চার-পাঁচ বছর পর পর একবার এই পূজা করে থাকে। পূজার সময় ছাগল, মুরগী, শূকর ইত্যাদি উৎসর্গ করা হয় এবং সকলে মিলেমিশে মদ পান ও ভুঁড়িভোজে মেতে উঠে। এই পূজার মাধ্যমে বিভিন্ন হালাম পাড়া অথবা গ্রামের ঝগড়া বিবাদ ইত্যাদি মিটিয়ে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের বাতাবরণ সৃষ্টি করা হয়।

হালাম সম্প্রদায় মায়াবিদ্যা, যাদুমন্ত্র, তন্ত্রমন্ত্র, ডাকিনী বিদ্যা ইত্যাদিতেও বিশ্বাসী। মন্ত্রপূত মাদুলি, কাপড়ের টুকরো, গাছের পাতা, শিকড়, শাখা-প্রশাখা, লাল ও কালো রঙের সুতো ইত্যাদি ব্যবহার করে দুরারোগ্য রোগ-শোক থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব বলে তাদের ধারণা। এছাড়া মন্ত্রপূত বাণ গাছে বিদ্ধ করা হলে গাছটি শুকিয়ে মরে যাবে এবং শত্রুপক্ষের ক্ষতিসাধন হবে এমন বিশ্বাসও বিরাজমান।

ওঝাই বা গুণীন ব্যক্তি বা সাধু সন্ন্যাসীরা এই সকল যাদুবিদ্যায় পারদর্শী। হালাম সম্প্রদায়ের ধারণা ইহজগতের সমস্ত কাজকর্ম, জয়-পরাজয়, ব্যর্থতা, কৃতকার্য ইত্যাদির ওপর দেবদেবী, আত্মা-প্রেতাত্মা, যাদুমন্ত্র ইত্যাদির সরাসরি যোগাযোগ এবং প্রভাব আছে।

হালামদের সমাজ ব্যবস্থায় চৌধুরী বা সর্দার গ্রামের বা পাড়ার সর্বেসর্বা। চৌধুরী গ্রামের মুখপাত্র হিসাবে কাজ করে। এছাড়া পাড়ার ছোটখাটো ঝগড়া-বিবাদ মিমাংসা, সামাজিক পূজাপার্বণ ইত্যাদি সম্পাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। হালাম সমাজে গ্রামের সর্দারকে বিতর্কমূলক সমস্যায় গঠনমূলক পরামর্শ প্রদানের জন্য দুইজন উপদেষ্টা নুট্রু ও পট্রু থাকে। এছাড়া দুইজন পেয়াদা ও চৌকিদার, একজন পুরুষদের মোড়ল, একজন মহিলাদের মোড়ল, গ্রাম পরিষদে হালাম সমাজের নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

হালাম সমাজের গ্রাম স্তরের পরিষদের ওপরে আছে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন হালাম পরিষদ। হালাম পরিষদের প্রধানকে বলা হয় "হালাম্সা"। হালাম পরিষদের প্রধান কাজ, সমস্ত হালাম উপজাতি গ্রামগুলির মধ্যে সমন্বয় এবং সংহতি বজায় রাখা। হালাম্সাকে সাহায্য করার জন্য "গালিম" পদ বিদ্যমান। গালিম হালাম্সা পদ খালি

জানা করা হয়। বিচারে সাক্ষী প্রমাণ নিয়ে চৌধুরী জুম ধানের দাম নির্দ্ধারণ করে। যদি ধান এক মন হয়, তবে এক মন ধানের মূল্য দোষী ব্যক্তির কাছ থেকে আদায় করা হয়, ধানের মালিক ধানের মূল্য পাওয়ার পর চৌধুরীকে বিচারের জন্য ১০ টাকা প্রদান করে। চৌধুরী ঐ টাকা থেকে এক টাকা দিয়ে দোষীব্যক্তিকে চোখের জল পথ করতে বলে। তারপর বিচারপ্রার্থী বাদী-বিবাদীর পক্ষ থেকে জমাকৃত টাকা দিয়ে একটি মোরগ ক্রয় করে বিচার সভায় উপস্থিত সকলে একসঙ্গে খাবে। জুম ক্ষেতে সবজী চুরির জন্য প্রথম বারে জরিমানা করা হয় না। কিন্তু একই ব্যক্তি দ্বিতীয় বার জুমের সবজী চুরি করলে তার জরিমানা হিসাবে ১৫ টাকা এবং এক বোতল মদ আদায় করা হয়।

অন্যদিকে যদি কোনো ব্যক্তি সামাজিক কাজ যেমন গ্রামের রাস্তা ঘাট পরিষ্কার করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকে তবে ঐ ব্যক্তির কাছ থেকে ঐ দিনের মজুরি যা হয় তার সমপরিমাণ টাকা জরিমানা করা হয়। ঐ জরিমানা কৃত টাকা যারা কাজে অংশগ্রহণ করে, তাদের খাওয়া-দাওয়ার জন্য ব্যয় করা হয়। যদি কেউ জরিমানার টাকা দিতে অথবা রাস্তায় কাজ করতে অস্বীকার করে, তবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে ঐ রাস্তা দিয়ে তাকে হাঁটতে দেওয়া হয় না।

কোনো ব্যক্তি অন্য কারো গৃহপালিত প্রাণী মারলে অথবা প্রাণীকে জখম করলে, নিহত প্রাণীর সমান একটি প্রাণী, মালিককে দোষী ব্যক্তি দিতে বাধ্য থাকবে।

যদি বিয়ের পূর্বে কোনো মেয়ে গর্ভবতী হয় তবে এক্ষেত্রে মেয়ের পিতামাতার কর্তব্য বিষয়টি পাড়ার চৌধুরী অথবা গ্রাম্য পরিষদকে অবগত করানো। চৌধুরী বিচারের জন্য ছেলেপক্ষ এবং মেয়েপক্ষ উভয়কে গ্রাম্য বিচার সভায় ডাকবে। সভায় গর্ভবতী মেয়ে সবার সামনে যে ছেলের নাম বলবে সে কোনো প্রকার আপত্তি না করে তার দোষ স্বীকার করতে বাধ্য। তারপর ছেলেকে ১৫টাকা এবং একটি বড় শূকর অথবা একটি বড় পাঁঠা জরিমানা দিতে বাধ্য করা হয়। মেয়েকেও ৫ টাকা জরিমানা জমা দিতে হবে এবং উভয়কেই বিয়ে করতে বাধ্য করা হবে। যদি ছেলে নবজাতকের পিতৃত্ব অস্বীকার করে তবে তাকে ১৫ টাকার পরিবর্তে ৩০ টাকা জরিমানা করা হবে। জরিমানার টাকা সভায় উপস্থিত বয়স্ক সকলের মধ্যে সমান ভাবে ভাগ করা হয়। বিয়ের ব্যবস্থা চৌধুরীর বাড়িতে সুসম্পন্ন করা হয়ে থাকে।

যদি কোনো ব্যক্তি যৌন আকাঙ্ক্ষার জন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে অপব্যবহার করে, তবে, তাকে ২০ টাকা নগদ এবং একটি পাঁঠা অথবা একটি শূকর জরিমানা দিতে হবে।

যদি সমাজের মধ্যে কোনো ব্যক্তি অন্য কারোর স্ত্রীর সঙ্গে যৌন ব্যাভিচারে ধরা পড়ে তবে সেই ব্যক্তির বিচারে ৩৫ টাকা নগদ এবং একটি পাঁঠা অথবা একটি বড় শূকর জরিমানা হিসাবে আদায় করা হয়। আদায়কৃত টাকা থেকে ১৫ টাকা ঐ মহিলার

হলে সেই পদে আসীন হয়। এছাড়া "কাচি কাও" এবং "কাবুর" উচ্চ হালাম পরিষদে মন্ত্রী এবং উপমন্ত্রীর ভূমিকা পালন করে থাকে। অপরাধীকে ধরার দায়িত্ব থাকে "থোও-কচুং" এর ওপর। অন্যদিকে উচ্চ হালাম পরিষদের যাবতীয় খবারখবর আদান-প্রদান, সভা চলাকালীন, পরিষদের কর্মকর্তাদের পান, সুপারী, মদ, আসন ইত্যাদি বিলি বণ্টনের দায়িত্বে থাকে দুজন "য়াকচুং" এবং "খুখুইচুং"। হালাম পরিষদে দোষীব্যক্তিকে দৈহিক নির্যাতন এবং শাস্তি দানের জন্য "ছেং কান্তা" দায়িত্ব পালন করে। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, হালাম পরিষদের সদস্যরা সাধারণত ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয় না, তবে সর্বসাধারণের ঐকমত্যে মনোনীত হয়।

হালাম মহিলারা গলায় রূপার হার এবং কানে রূপার দুল ব্যবহার করে। এছাড়া বুনো কলার বীচি, রীচি, পুঁতি এবং টাকা-পয়সার মালাও হালাম মহিলারা পরতে পছন্দ করে। হালাম মহিলারা কোমর-তাঁত ব্যবহার করে। কাপড় বুননে খুবই পারদর্শী এবং নিজেদের পরনের পাছড়া, রিসা ইত্যাদি নিজেই তৈরি করে। এছাড়া হালাম উপজাতি মহিলারা বাড়ি ঘরের সমস্ত কাজকর্ম যেমন রান্নাবান্না, লাকড়ি আনা, ধান থেকে কাঠের হামাম দিস্তা দিয়ে চাউল তৈরি করা, ভাত থেকে মদ তৈরি করা, জুমের তুলো থেকে সূতা কাটা, বাচ্চার দেখাশোনা করা এমনকি হাট বাজার করার কাজ ও সুনিপুণতার সঙ্গে সম্পাদন করে। হালাম পুরুষেরা ঘরবাড়ি তৈরি, জুমচাষ, ফসল তোলা, বন্যপশুপাখি শিকার, পাহাড়ি নদী থেকে মাছ, কাঁকড়া, চিংড়ি, কুছিয়া মাছ ধরা ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকে। হালাম পুরুষেরা কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা মোটা কাপড় বা গামছা পরে এবং গায়ে জামা (কামচিলি) ব্যবহার করে থাকে।

ত্রিপুরারাজ্যের ধলাই জেলার কমলপুর মহকুমায় হালাম উপজাতির গ্রাম্য পরিষদের চুরির বিচার আইনে দেখা যায় যদি চুরিকৃত দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য ১০০ টাকা হয় তবে চোর চুরিকৃত দ্রব্য ফেরৎ দেওয়ার সময় এক বোতল দেশী পরিশ্রুত মদ এবং এক হাঁড়ি চাউল থেকে তৈরি চোলাই মদ জরিমানা হিসাবে দিতে বাধ্য। কোনো চুরির বিচার প্রার্থী হলে বাদী এবং বিবাদী উভয়ে গ্রামের সর্দার বা চৌধুরীকে এক কিলোগ্রাম চিনি এবং ১০ টাকা জমা দিলে চৌধুরী বিচার শুরু করবে। যদি চুরিকৃত জিনিস ফেরত পাওয়া না যায় তবে বিচারে দোষী ব্যক্তি ঐ জিনিসের মূল্য দিতে বাধ্য করা হয় এবং সেই সঙ্গে ১৫টাকা জরিমানাও করা হয়। এই ১৫ টাকার মধ্যে ১৪টাকা জিনিসের মালিককে দেওয়া হয় এবং ১ টাকা চোরকে কান্নাকাটি করার জন্য সান্ত্বনা হিসাবে প্রদান করা হয়।

জুমের ধান চুরির জন্য বিচার প্রার্থীকে প্রথমে ১৫ টাকা নগদ এবং এক বোতল মদ দিয়ে গ্রামের চৌধুরীকে জানাতে হবে। চৌধুরী গ্রামের সকল বয়স্ক লোকদের তার বাড়িতে নির্দিষ্ট দিনে বিচারে উপস্থিত থাকার জন্য ডাকবে। ঐ দিন যে ব্যক্তির নামে বিচার দেওয়া হয় সে এসে ১৫ টাকা এবং এক বোতল মদ দিলে, বিচারে

স্বামীকে বদনামের সান্ত্বনা হিসাবে প্রদান করা হয়। বাকি ২০ টাকা বিচার সভায় উপস্থিত বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

হালাম উপজাতিদের বিবাহের মধ্যে ছেলে এবং মেয়ের পছন্দকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। মেয়েরা চরিত্রবান ছেলেকে পছন্দ করে, এছাড়া ভাল গান, বাজনা জানা এবং বাঁশবেতের কাজে পারদর্শী ছেলে মেয়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অনুরূপ হালাম ছেলেরা সুন্দরী এবং লম্বা চুল আছে এমন মেয়ে বেশি পছন্দ করে। তাছাড়া চড়কার সাহায্যে সূতা কাটা, কোমর-তাঁতে কাপড় বোনা, বাড়িঘরের কাজে সুনিপুণা মেয়েদের প্রতি ছেলেরা বিয়ের জন্য অধিক গুরুত্ব দেয়। বিয়ের রীতি অনুসারে যুবক ছেলে ঘনিষ্ঠ বন্ধু অথবা একটি বাচ্চা ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে রাত্রে প্রায় ১০ টার সময় মেয়ের বাড়ি আসে। ছেলে সাধারণত বাদ্যযন্ত্র সারিন্দা সঙ্গে নিয়ে বাজাতে বাজাতে আসে। মেয়ের বাড়ির দরজায় এসে অপেক্ষা করে। মেয়ে এসে স্বাগতম্ জানালে ছেলে বাড়ি ঢোকে এবং আগুনের ধারে বসে। মেয়ের মা বাবা ছেলেকে লক্ষ্য করে। যদি তাদের কাছে ছেলে গ্রহণযোগ্য হয়, তবে মা বাবা ঘুমাতে চলে যায়। অনেক সময় মেয়ের মা বাবা ঘুমাতে যাওয়ার পরও ছেলে আসতে পারে, সেক্ষেত্রে পিতা মাতা বিছানা ছেড়ে এসে ছেলেকে লক্ষ্য করবে। যদি তাদের পছন্দ না হয় তখন তারা ঘুমাতে যাবে না কিন্তু ছেলে মেয়েকেও কিছু বলবে না। বসে বসে তামাক, পান, সুপারী ইত্যাদি খাবে এবং ছেলে মেয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। তারপরও যদি ছেলে বাড়ি থেকে বের হয়ে না যায়, তখন ভদ্রভাবে বলবে এখন ঘুমানোর সময় হয়েছে। অন্যদিকে মেয়ের মা বাবার আপত্তি না থাকলে তারা ঘুমাতে চলে যাবে এবং ছেলের বন্ধু বা বাচ্চা ছেলেটি ঘরের মেঝেতে শুয়ে পড়বে। শুধুমাত্র মেয়ে এবং ছেলে কথাবার্তা বলবে। এই সময় ছেলে মেয়ে নিরিবিলি অবস্থান এবং কথাবার্তা বললেও কোনো প্রকার কুকাজ করে না। ছেলেমেয়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলে পছন্দ হলে তার মা বাবাকে জানাবে। যদি ছেলের মা বাবার মেয়েকে পছন্দ হয় তখন ঘটক, আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে নিয়ে ছেলের মা, বাবা মেয়ের বাড়ি আসবে এবং মেয়ের মা বাবার সঙ্গে প্রাথমিক কথাবার্তা বলবে এবং দ্বিতীয় দিনের কথাবার্তার জন্য দিনক্ষণ ধার্য্য করবে। দ্বিতীয় দিন ছেলের পক্ষ মেয়ের বাড়িতে আসার সময় মদ নিয়ে আসবে এবং একসঙ্গে বসে গল্পগুজব হাসি-ঠাট্টার মাধ্যমে সকলে মদ পান করবে এবং ঐ দিনই পাকা কথা বলার জন্য দিনক্ষণ স্থির করবে, বিয়ের পাকা কথা বলার দিন ছেলের পক্ষ মদ এবং শুকনো মাছ সঙ্গে নিয়ে আসবে এবং মেয়ের আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে বসে মদ ও শুকনো মাছ খাবে। ওই দিনই বিয়ের শর্ত অর্থাৎ ছেলে মেয়ের বাপের বাড়িতে কত বছর কাজ করবে, মেয়ের পণ কত টাকা দিবে ইত্যাদি স্থির করা হয়। তারপর এই বিবাহের শর্তাবলি সকলকে বিশেষ করে গ্রাম্য পরিষদকে জানাবে। যদি কোনো পক্ষ শর্তপূরণে অসমর্থ হয় তবে গ্রাম্য পরিষদের বিচারে তাদের জরিমানা হয়।

হালাম সম্প্রদায়ের বিবাহ অনুষ্ঠান খুবই সাদাসিধা এবং তাদের পুরোহিত (অচাই) মন্ত্র পড়ে বিয়ের কাজ সম্পাদন করে। হালাম উপজাতিদের বিয়ের আইন অনুযায়ী মেয়ের মাকেও কিছু টাকা পয়সা কন্যাদানের পর দেওয়ার রেওয়াজ আছে। কারণ মেয়ের মা মেয়েকে স্তন দান এবং আদর যত্ন করে লালন পালন করার বিনিময়ে, আজকাল অবশ্য মেয়ের মা নগদ অর্থ গ্রহণ করে না। বিনিময়ে তারা ছেলের নিকট শর্ত আরোপ করে যে বিয়ের পর ছেলে মেয়ের প্রতি কখনও দুর্ব্যবহার করবে না। রাগের বশবর্তী হয়ে কখনও চুল ধরতে পারবে না ইত্যাদি। বিয়ের শর্ত পূর্ণ হলে অচাই সাধারণত কনের বাড়ির রান্না ঘরে বিয়ের কাজ সুসম্পন্ন করে। বিয়ের রীতি অনুযায়ী বর এবং কনে দুই জনে পা ছড়িয়ে একে অন্যের বিপরীত দিকে বসবে। দুই জনের মধ্যে একটি পাথর রাখা হয়। এই পাথরের ওপর দুটি মোরগ কেটে উৎসর্গ করা হয়। মোরগ কাটার পর যতবেশি পরিমাণ রক্ত পাথরের ওপর পড়বে, সেই বিবাহ তত শুভ বলে ধরে নেওয়া হয়। এছাড়া অচাই রান্না ঘরের বাইরেও চারটি মোরগ উৎসর্গ করে থাকে। মেয়ের বাড়ি থেকে কনেকে বিয়ের সময় বিছানাপত্র, একটি বাক্স এবং একটি হস্তচালিত চড়কা উপহার স্বরূপ দেওয়া হয়।

বিয়ের ৪-৫ দিন পর নবদম্পতি একসঙ্গে ছেলের বাড়ি যায় এবং এক সপ্তাহ বসবাস করে। তারপর আবার মেয়ের বাপের বাড়ি ফিরে আসে এবং বিয়ের শর্ত অনুযায়ী বর শ্বশুর বাড়িতে ৩-৪ বছর ঘর জামাই হিসাবে বাস করে। আজকাল অবশ্য এই সময় সীমা কমিয়ে এক বছর করা হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর স্বামী স্ত্রী আলাদা বাড়িঘর করে বসবাস করতে পারে।

হালাম উপজাতির সমাজব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক। মেয়েরা বিবাহের পর স্বামীর গোত্রভুক্ত হয়। পিতার মৃত্যুর পর সম্পত্তি ছেলেরা পায়। দুই ভাইয়ের ছেলে মেয়ের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। কিন্তু দুই বোনের ছেলেমেয়ের মধ্যে বিবাহের প্রচলন আছে। হালাম উপজাতির মধ্যে বড়ভাই ছোট ভাইয়ের বৌকে অথবা বরের মামা ভাগ্নেবৌকে স্পর্শ করতে পারে না। এমনকি সরাসরি কথাবার্তা বলাও নিষিদ্ধ। অন্যদিকে হালাম সমাজে দাদু-দিদিমা-নাতি, নাতনী, নাতবৌ, নাতজামাই, দেবর-বৌদি, জামাইবাবু-শ্যালক, শ্যালিকা, বৌদি-ননদ, নন্দাই এর মধ্যে মধুর এবং রঙ্গরসের সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। হালাম সমাজে এক বিবাহ বহু প্রচলিত নিয়ম। বহুবিবাহ এবং বাল্য বিবাহ বিরল। স্বামীর বয়স স্ত্রীর বয়স অপেক্ষা বেশি হয়, তবে কদাচিৎ ব্যতিক্রমও পরিলক্ষিত হয়।

ত্রিপুরারাজ্যে বসবাসকারী হালাম উপজাতি সম্প্রদায় মৃতদেহ দাহ করে এবং পারলৌকিক কার্যাদি ও সম্পাদন করে। মৃত ব্যক্তির পারলৌকিক কার্য বংশের বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ করার অধিকারী হয়। তবে মৃত ব্যক্তির কোনো সন্তান না থাকলে স্ত্রী, স্ত্রী জীবিত না থাকলে মৃত ব্যক্তির ভাই পারলৌকিক কার্য সম্পাদন করে থাকে।

❐ ষষ্ঠ অধ্যায়

মগ

মগ উপজাতি সম্প্রদায় ত্রিপুরারাজ্যের উনিশটি উপজাতি সম্প্রদায়গুলির মধ্যে অন্যতম। ত্রিপুরারাজ্যের দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাব্রুম এবং বিলোনীয়া মহকুমায় মগ সম্প্রদায়ের উপজাতি গোষ্ঠীর বসতি অধিক সংখ্যায় পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া ধলাই জেলার কমলপুর, আমবাসা এবং লংথরাই মহকুমায় মগ উপজাতি বসবাস করে। ত্রিপুরা রাজ্যে মগ উপজাতি সম্প্রদায়ের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ।

সন		জনসংখ্যা
১৯০১	—	১৪৯১
১৯১১	—	১৯৩০
১৯২১	—	৪০২০
১৯৩১	—	৫৭৪৮
১৯৫১	—	৮৭৮৯
১৯৬১	—	১০,৫২৪
১৯৭১	—	১৩,২৭৩
১৯৮১	—	১৮,২৯১

ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাসকারী মগ উপজাতি সম্ভবত চীনদের বংশধর এবং চীন থেকে বর্ম্মা আরাকান হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রথম বসতি স্থাপন করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে ফেনী নদী পার হয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ করে এবং ত্রিপুরায় স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করে। সম্ভবত সতেরশ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিকে মগ উপজাতি চট্টগ্রামের কক্সবাজারে আসে তারপর সীতাকুণ্ডে বসতি স্থাপন এবং ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে পার্বত্য ত্রিপুরায় আসে।

সতেরশ খ্রিস্টাব্দে মগ উপজাতি ছিল দুর্ধর্ষ হানাদার, যোদ্ধা এবং তৎকালীন বাংলার সমতলবাসীদের কাছে ভীতির কারণ। সে সময়ে মগ উপজাতি সমতলবাসীদের এলাকায় অতর্কিত আক্রমণ করে লোকজন, মেয়েছেলে এবং শিশুদের তুলে নিয়ে যেত এবং ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করে দিত। তৎকালে মগ দস্যুদের কাছে কোনো প্রকার দয়া ক্ষমা অথবা আইনকানুন ছিল না। তাই আজো বাংলা ভাষায় "মগের মুল্লুক" বললে যে স্থানে কোনো প্রকার আইন কানুন বা ন্যায্য বিচার নেই সেই স্থানকে বোঝায়। ত্রিপুরারাজ্যে বৌদ্ধ সংস্কৃতির বিকাশ হয়েছে সম্ভবত মগদের দ্বারা, প্রাচীন কালে দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনীয়া মহকুমার পিলাকে বৌদ্ধ সংস্কৃতির নানা অনুশীলনের তথ্য আজ ও আবিষ্কারের অপেক্ষায় আছে বলে মনে করা হয়। আরো লক্ষ্য করলে

দেখা যায়, আজও বিলোনীয়া মহকুমার পিলাক অঞ্চলের আশপাশের বহু অভিজাত মগ পরিবার বসবাস করে। বিলোনীয়া মহকুমার মগ অধ্যুষিত অঞ্চলে আজও বেশ ধুমধামের সঙ্গে বুদ্ধ পূর্ণিমায় সুবিশাল ভগবান বুদ্ধের মূর্তি পুজা, মহামুনির উৎসব হিসাবে পালিত হয়।

ত্রিপুরার রাজা অমরমাণিক্যের সময় একবার মগদস্যুরা পরাজিত হয়। ফলে মগ রাজা বাধ্য হয়ে অমরমাণিক্যের সঙ্গে দুরভিসন্ধি করতে বাধ্য হয়। এরপর মগ রাজা ত্রিপুরার রাজভ্রাতাদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একটি অতীব সুন্দর হাতির দাঁতের কারুকার্য খচিত মুকুট ত্রিপুরায় প্রেরণ করেন। মূল্যবান মুকুটের মালিকানা নিয়ে ত্রিপুরার রাজভ্রাতাদের মধ্যে মনোমালিন্য শুরু হলে মগরাজা পর্তুগিজ সৈন্যদের সাহায্য নিয়ে ১৫৮৬ সালে তৎকালীন ত্রিপুরার রাজধানী রাঙ্গামাটি (বর্তমান উদয়পুর) আক্রমণ করে এবং প্রায় এক পক্ষকাল ধরে লুটতরাজ ও তাণ্ডব চালায়। যদিও সতেরশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মগেরা লুঠতরাজের রাজত্ব কায়েমের মাধ্যমে জীবন ধারণ করত। কিন্তু ধীরে ধীরে আঠারশ খ্রিস্টাব্দ থেকে দস্যুবৃত্তি ছেড়ে আস্তে আস্তে শান্তিপ্রিয় হয়ে উঠে। এর প্রধান কারণ, মগদস্যুদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বর্ম্মারাজ ১৭৮৫ সালে মগদের রাজ্য আরাকান আক্রমণ করে ঐ সময়ে বর্ম্মী সৈন্যরা আরাকানে বসবাসকারী মগদের উপর নির্মম, কঠোর অত্যাচার করে এবং আরাকান রাজ্য দখল করে নেয়। ফলে মগদস্যুরা বাধ্য হয়ে পার্শ্ববর্তী চট্টগ্রামে শরণার্থী হয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। যে সকল মগ উপজাতি আরাকান পরিত্যাগ করেনি, তারা বর্ম্মীদের আনুগত্য স্বীকার করে এবং বর্ম্মাবাসীদের আচার অনুষ্ঠান এবং সামাজিক রীতিনীতি গ্রহণ করে বর্ম্মাবাসী হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে বর্মা, আরাকান সহ চট্টগ্রাম অঞ্চলে ইংরেজদের কঠোর শাসনের ফলে মগদস্যুরা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় এবং শান্তিপ্রিয় হয়ে উঠতে বাধ্য হয়।

মগেরা ছিল ইন্দোচীনের উপজাতি সম্প্রদায়, যারা মারমাগ্রী, ভুঁইয়া মগ, রোয়াংগা মগ, জুমিয়া মগ ইত্যাদি উপাধি গ্রহণ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করতো। পরবর্তী সময়ে ঐ অঞ্চলের নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাসকারীরা সাধারণ মগ উপজাতি হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। যে সকল মগ ব্রহ্মদেশ থেকে আসে তাদের বলা হয় "মারমা" এবং যারা নদীর ধারে এবং জলে বসবাস করতো তাদের বলা হয় "ক্ষিয়ংসা"। এই দুই গ্রুপ জীবিকা, বাসস্থান অর্থাৎ পাহাড়, নদী ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন উপভাগে বিভক্ত।

মগদের আদিস্থান নিয়ে নানা ধরণের মতবাদ দেখা যায়। অনেক ঐতিহাসিকদের মতে মগ উপজাতির আদিস্থান আরাকান। তারা আরাকানের পার্শ্ববর্তী পার্বত্য চট্টগ্রামের আশপাশে ও বসবাস করত। আবার কারো কারো মতে মগেরা ইন্দোচীনের জনজাতির সংমিশ্রণে উদ্ভূত। জে. পি. মিলস্ এর মতানুসারে মগ উপজাতি চীন দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রথমে থাইলং অর্থাৎ বৃহত্তর থাইল্যান্ডে

অনুপ্রবেশ করে এবং আরাকানে এসে বসতি স্থাপন করে। আরাকান থেকে প্রায় সতেরশ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের কক্সবাজারে প্রবেশ করে।

অন্য মতবাদ অনুসারে মগ উপজাতি মঙ্গোলীয়ানদের বংশধর। মগ শব্দ সম্ভবত মগধ থেকে উৎপত্তি এবং যে মঙ্গোলীয়ান উপজাতি মগধ থেকে এসেছে তাদের পরিচিতি 'মগ' হিসাবে করা হয়। আরাকানের রাজা সুধন্য মগধের অধিবাসী এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিল। মগদের আদিকাল সেখানেই থাক না কেন, এই কথা সত্যি, মগ সম্প্রদায় হল আরাকানের অধিবাসী এবং বার্ম্মার জনজাতি থেকে প্রাচীন কালেই উদ্ভূত হয়েছে। ১৯৩১ সনের জনগণনা রিপোর্ট অনুযায়ী মগদের মধ্যে দুটি গ্রুপ পরিলক্ষিত হয়। প্রথম গ্রুপে চট্টগ্রামের বৌদ্ধ সম্প্রদায় এবং আরাকান মগ যারা পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করে, তাদের দেখানো হয়েছে। অন্যদিকে বাঙালি অধ্যুষিত চট্টগ্রামের মগেরা ক্ষত্রিয় হিসাবে পরিচয় দেয়। তাদের দাবি তারা মগধের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বংশধর, হিন্দুধর্ম পুনরুজ্জীবনের কারণে এবং মোগলদের আগমনের জন্য তারা মগধ পরিত্যাগ করে চট্টগ্রামে আসে। এই কারণে চট্টগ্রামের মগদের "মারমাগ্রী" মগ এবং আরাকানের মগদের "জুমিয়া" মগ হিসাবে অর্থাৎ রোয়াং এবং রাখাইং, হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। অন্যদিকে এই কথাও বলা হয় যে প্রাচীনকালে কোনো এক সময়ে একই বার্মিজ গ্রুপ পাহাড় এবং সমতলে আলাদা হয়ে বসবাস করতে শুরু করে। যারা সমতলে আসে তারা বাঙালিদের ভাষা এবং ধর্মের সংমিশ্রণে এসে ভাষাগত এবং চেহারাগত কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হয়। পাহাড়ে বসবাসকারী মগদের তুলনায় সমতল-বাসী মগদের নাক উঁচু এবং চোখও বড়।

মগদের ইতিহাসে জানা যায়, ভগবান বৌদ্ধের জন্মের আগে এক রাজার নাম ছিল "অভিরাজ"। রাজ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ায় অভিরাজ রাজ্যের রাজধানী কপিলা বস্তু পরিত্যাগ করে ইরাবতী নদীর তীরে "ত্যাগুন" নামক স্থানে রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। মহারাজ অভিরাজের দুই পুত্র ছিল, নাম কানরাজগাইজ এবং করনজী। অভিরাজের মৃত্যুর পর রাজ্য সিংহাসন নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে বিবাদ দেখা দেয়। তারপর স্থির হয় যে ভাই এক রাত্রের মধ্যে একটি মন্দির নির্মাণ করতে সক্ষম হবে, সে রাজসিংহাসনের অধিকারী হবে। ছোটভাই ছিল খুব বুদ্ধিমান এবং এক রাত্রের মধ্যে মন্দির নির্মাণে সক্ষম হয়। বড়ভাই ব্যর্থ হয়ে তার অনুগামীদের নিয়ে উত্তর আরাকানের "কা কপান্ডা" পাহাড়ে নূতন রাজধানী স্থাপন করে বসবাস করতে শুরু করে। তাই আরাকানের মগ সম্প্রদায় দাবি করে তারা রাজার বংশধর এবং যোদ্ধা হিসাবে তারা ক্ষত্রিয় বংশ, বর্ম্মাদেশের জনজাতির বংশধর নয়। আরাকানের অধিবাসীদের 'মগ' পরিচিতি অন্যদের কাছে গ্রহণযোগ্য হলেও কিন্তু 'মগ' সম্প্রদায় তাদের পরিচয় 'মগ' এর পরিবর্তে 'মারমা' হিসাবে বেশি পছন্দ করে। মারমা শব্দ বর্ম্মা ভাষায় ম্রাইমা অর্থ বংশধর। বাংলাদেশের মগ সম্প্রদায় 'মারমা' হিসাবে পরিচিত।

চাকমা জুমিয়া দম্পতি

চাকমা জুমিয়া পরিবার

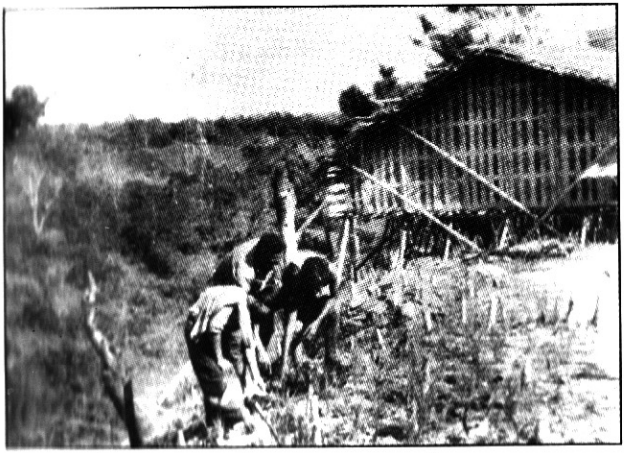

পাহাড়ি অঞ্চলে চাকমা জুমিয়াদের সার প্রয়োগ পদ্ধতি দেখছেন লেখক

এছাড়া আরাকানের অধিবাসীদের 'রাখাইংদি' অর্থাৎ রাখাইং অঞ্চলের অধিবাসী যা ইংরাজি ভাষায় 'আরাকানী' নামে বহুল পরিচিত। শুধুমাত্র অন্যান্য জনজাতির কাছে আরাকানের অধিবাসীরা মগ হিসাবে পরিচিত।

মগ শব্দ সম্ভবত বিহারের মগধ নাম থেকে এসেছে এমন মতবাদও বিদ্যমান। ভারতবর্ষে হিন্দু ধর্ম পুনরুজীবিত হওয়ায় এবং মুসলিম সম্রাটদের শাসন ব্যবস্থার সময় মগধের রাজপরিবার বৌদ্ধধর্ম রক্ষা করার জন্য সম্ভবত আরাকানে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল এবং আরাকানে শাসনব্যবস্থা শুরু করে। ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, নবম শতাব্দী এবং তারপর থেকে বহু বৌদ্ধ শরণার্থী বাংলা অতিক্রম করে আরাকানে গিয়ে ধর্ম রক্ষা করতে বাধ্য হয়। মগদের রাজ্য তৎকালে আরাকান, মেঘনানদী এবং বর্ম্মার পেগু পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এমন ধারণা করা হয়। ত্রিপুরার ইতিহাসেও দেখা যায় প্রাচীন ত্রিপুরা রাজা জুজারুফা ৫৯০ সনে সিংহাসনে বসে পার্বত্য এলাকার লিকারাজ (মগরাজা) কে পরাজিত করে চট্টগ্রাম জয় করেন এবং পার্বত্য ত্রিপুরার রাজধানী প্রথমে রাঙ্গামাটি (বর্তমান উদয়পুর) এবং পরে বিশালগড়ে স্থাপন করেন। জুজারুফা প্রথম "ত্রিপুরাব্দ" প্রবর্তন করেন। জুজারুফা যে সনে প্রথম ত্রিপুরার রাজ সিংহাসনে বসেন অর্থাৎ ৫৯০ সন থেকে ত্রিপুরাব্দ শুরু হয়। সবশেষে বলা যায়, আরাকানের প্রাক্তন অধিবাসী এবং মগধ থেকে আসা বৌদ্ধ রাজবংশী সকলে কালক্রমে 'মগ' নামে পরিচিতি লাভ করে।

মগভাষা আসাম-বর্ম্মা গ্রুপের তিব্বত-চীন ফ্যামিলির অন্তর্ভুক্ত। মগদের ভাষাকে "লু হমুগ" বলা হয় যা আরাকানবাসীদের ভাষা এবং বর্ম্মী হরফে বর্ম্মী কায়দায় লেখা হয়। ত্রিপুরা রাজ্যে মগ ভাষায় তেমন উল্লেখযোগ্য বই পাওয়া কষ্টকর। ত্রিপুরার মগ সম্প্রদায়ের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বর্ম্মী হরফ বৌদ্ধ বিহারে শিখে। তবে মগ ভাষায় প্রেমের গানে ভরপুর। ভালবাসার গানগুলিকে "ক্যাপ্‌য়া" বলা হয়। ফসল ঘরে তোলার সময় এই গানগুলি গাওয়া হয়। উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে বসবাসকারী মগদের কথ্য ভাষার মধ্যে উচ্চারণের কিছুটা তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। ত্রিপুরায় বসবাসকারী মগদের মধ্যে মগ ভাষা ব্যতীত বাংলা ভাষার ও বহুল প্রচলন বিদ্যমান।

শরীরগত গঠনের দিক পর্যালোচনা করলে দেখা যায় মঙ্গোলিয়ানদের সঙ্গে মগ উপজাতির শারীরিক গঠন সামঞ্জস্যপূর্ণ। মগেরা বর্তমানে ধর্মপ্রিয় এবং ধার্মিক জীবন যাপন করতে পছন্দ করে। মগদের রঙ ফর্সা, চুলের রঙ কালো, পুরুষের মুখে ও বুকে লোম কম। মেয়েরা মাথার মধ্য বরাবর সিঁথি কেটে চুলবিন্যাস করে এবং খোঁপা বাঁধে। মগ মহিলারা বুকে রিয়া এবং কোমরে জড়িয়ে পাছড়া পরে। পুরুষেরা লুঙ্গি অথবা ধুতি পরে। মহিলারা অনেকে ব্লাউস পরে এবং শরীরে চাদর ব্যবহার করে। মগ উপজাতির মেয়েরা প্রাচীনকালের অলংকার পরিধান করতে ভালবাসে। তবে অনেকে কানে দুল ব্যবহার করে, গলায় হারসী, হাতে রূপোর বালা, পায় খারু পরতে ভালবাসে এবং বাহুতে খাল্‌সী ব্যবহার করে থাকেন।

ত্রিপুরারাজ্যে বসবাসকারী মগেরা বৌদ্ধধর্ম পালন করলেও নিরামিষ ভোজী নয়। মগ উপজাতির প্রধান খাদ্য ভাত, শুকনো মাছ, মাছ, মাংস ইত্যাদি। আমিষ ভোজন যদিও অহিংস বৌদ্ধধর্ম বিরোধী তথাপিও ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাসকারী মগ সম্প্রদায় নিরামিষ অপেক্ষা আমিষ ভোজন পছন্দ করে। বয়স্ক পুরুষ মহিলারা পান সুপারীতে আসক্ত। মদ্যপান এবং ধূমপানেরও প্রচলন আছে। মগ সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা সাদাসিধে গেরুয়া বস্ত্র সর্বাঙ্গ ঢেকে পরিধান করে এবং সবসময় মুণ্ডিত মস্তকে বৈরাগ্য জীবন যাপন করে।

মগ উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্য রূপ চর্চার বহর খুব বেশি। পুরুষেরা হাতে এবং মহিলারা হাতে এবং পিঠে উল্কি পরে। উল্কি পড়ার সময় খুবই কষ্ট স্বীকার করতে হয়। বাঁশ দিয়ে কলমের নিবের আকারে সূচালো বাঁশের কুঞ্চি দিয়ে গায়ের চামড়ায় বিভিন্ন নক্সা করে তারপর এক প্রকার গাছের রস লাগিয়ে গায়ে স্থায়ী নক্সা করাকে উল্কি পড়া বলে। বিহার এবং মধ্যপ্রদেশের উপজাতিদের মধ্য উল্কি পড়ার রেওয়াজ অধিক পরিলক্ষিত হয়। ত্রিপুরা রাজ্যে মগ এবং চাকমা সম্প্রদায়ের মধ্যে মাঝে মধ্যে উল্কি পরার প্রবণতা দেখা যায়।

মগ উপজাতির মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠী বিদ্যমান। মগের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল (১) প্যালেঙ্গসা, (২) প্ল্যাঙ্গয়ীসা (৩) লুংডোসা, (৪) কক্‌ডেঙ্গসা (৫) ফ্রাংরুয়াসা (৬) র‍্যাখাঙ্গসা, (৭) ক্ষিয়াসা ইত্যাদি। জনসংখ্যার বিচারে প্যালেঙ্গসা গোষ্ঠী সবচেয়ে বড় এবং ক্যউকফ্যায়াসা গোষ্ঠী দ্বিতীয়। মগদের মধ্যে এমন মতবাদ বিদ্যমান যে প্যালেঙ্গসা গোষ্ঠীর মগ উপজাতিদের পূর্বপুরুষ পার্বত্য চট্টগ্রামে আসে তৎকালীন আরাকানের প্যালেঙ্গখাউ থেকে। বর্তমানে প্যালেঙ্গখাউ ময়নামায় অবস্থিত এবং তৎকালীন বর্ম্মী সৈন্যরা আরাকান থেকে ঐ অঞ্চল দখল করে নেয়।

মগ উপজাতি সম্প্রদায় ত্রিপুরার অন্যান্য উপজাতিদের ন্যায় টং ঘরে বসবাস করতে পছন্দ করে। মগদের টংঘর অন্যান্য উপজাতিদের অপেক্ষা স্বতন্ত্র এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। মগ সম্প্রদায় বড়সড় টং ঘর তৈরি করে তার মধ্যে বেড়া দিয়ে ছোট ছোট কোঠা তৈরি করে বসার ঘর, শোয়ার ঘর, রান্না ঘর ও খাবার ঘর ইত্যাদির জন্য ব্যবহার করে। টং ঘরের মধ্যে মাটির উনুনে মগেরা রান্নাবান্না করে। মগরা বাড়িঘর বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে।

মগ উপজাতির সামাজিক বিচারক নিজের কর্মক্ষমতা প্রদর্শন করে উপযুক্ত আসনে আসীন হন। তিন-চার পাড়ার জন্য একটি মাত্র গ্রাম্য কমিটি কাজ করে। গ্রাম্য কমিটির প্রধান কাজ গ্রামগুলির আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং সমাজের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন করা। গ্রাম্য কমিটির কর্মকর্তাগণ বয়স্ক এবং প্রগতিশীল ব্যক্তিবর্গ দ্বারা গঠিত হয়। গ্রাম্য কমিটির প্রধানকে বলা হয় "পৌচুসুগ্রি"। পৌচুসুগ্রি নির্বাচনের সময় গ্রামের প্রতাপশালী, বিত্তবান এবং ধনী ব্যক্তিদের প্রাধান্য দেওয়া হয়। প্রধানকে

সাহায্য করার জন্য "কারবারী" এবং খবরাখবর আদান-প্রদানের জন্য "পিয়াকডা" নিযুক্ত থাকে। গ্রামের প্রধান বা পৌচুসুগ্রি কমিটির সভা পরিচালনা করে এবং বিচারের সিদ্ধান্ত স্থির করে। প্রায় প্রত্যেক মগ গ্রামে একটি বৌদ্ধমন্দির দেখা যায়। মগ উপজাতিদের সমাজব্যবস্থা পিতৃপ্রধান। মগ সমাজে মেয়েদের মতামত অপেক্ষা পুরুষের মতামত সব ব্যাপারে প্রাধান্য পায়। স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা নিয়ে ছোট ছোট পরিবার মগদের মধ্যে বেশি পরিলক্ষিত হয়। তবে যৌথ পরিবারও মাঝে মধ্যে নজরে পড়ে। পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার ছেলেরা ভোগ করে থাকে। সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারার ক্ষেত্রে দেখা যায় পরিবারের সম্পত্তির অর্ধেক পায় বড় ছেলে, বাকি অর্ধেক সম্পত্তি অন্যান্য ছেলেদের মধ্যে সমান ভাবে ভাগ করে দেওয়া হয়। পরিবারের মায়ের অলংকারাদির ক্ষেত্রেও বড়মেয়ে অধিক পরিমাণে পায় এবং অন্যান্য মেয়েরা বাকি অংশ সমান ভাবে পায়।

মগ উপজাতি সমাজে মহিলারা বাড়ি ঘরের সমস্ত প্রকার কাজ কর্ম করে। বাড়িঘরের কাজকর্ম সম্পাদনের ব্যাপারে মহিলাদের সর্বোচ্চ স্বাধীনতা বিদ্যমান। মগ মহিলারা দামি সুন্দর পোশাক পড়তে ভালবাসে এবং চুল ও রূপচর্চায় পারদর্শী। মহিলারা খুবই পরিশ্রমী এবং সবসময় কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা পরিবারের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ মজবুত করে। মগ উপজাতি সম্প্রদায়ের মহিলাদের কাজের ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে আর. এইচ. স্লেয়েড হুটচিনসন বলেন, বিয়ের পর থেকে মৃত্যু না হওয়া অবধি তাদের কোন বিশ্রাম নেই। অর্থাৎ সারাজীবন শীত, বর্ষা, গ্রীষ্ম প্রায় সারা বছর সংসারের জন্য খেটে মরে। এছাড়া মাঠের কাজেও তারা পুরুষদের সমকক্ষ, বিশেষ করে, চাষবাসের সময় এবং জুম চাষে বীজ বপন, আগাছা নিয়ন্ত্রণ, ফসল কাটা, ফসল মাঠ থেকে বাড়ীতে বয়ে আনা, মাড়াই, ঝাড়াই এবং রান্নাবান্না করে পরিবারের সকলের সময়মত ভোজনের ব্যবস্থা করার প্রধান দায়িত্ব মগ মহিলারা বহন করে। কাজের ফাঁকে অবসর সময়ে কাপড় বোনা, সেলাই ইত্যাদি কাজও মহিলারা নিজ হাতে করে থাকে। এতৎসত্ত্বেও বৃদ্ধ বয়সে যখন কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তখন মহিলারা পরিবারের সকলের সমাদর থেকে বঞ্চিত হয়। মগ সমাজে কর্মক্ষমতাহীন বৃদ্ধা মহিলারা সংসারের বাড়তি বোঝা হিসাবে পরিগণিত হন। মোট কথা বিয়ের পর থেকে শ্মশান ঘাটে না যাওয়া অবধি মগ মহিলাদের কাজের শেষ নেই।

মগ উপজাতির মধ্যে সমজাতিক বিবাহ অথবা অন্তর্বিবাহ প্রাধান্য পায়। তবে মগ ছেলেরা নিজের গোষ্ঠীর মধ্যে খুব কাছাকাছি রক্তের সম্পর্ক আছে এমন মেয়ে ব্যতীত যে কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে পারে। একজন পুরুষ একটি বিবাহ করে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ করে ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে এর ব্যতিক্রম মাঝে মধ্যে পরিলক্ষিত হয়, বাল্যবিবাহ সাধারণত হয় না। মগের ছেলেরা কনেকে পণ দিয়ে থাকে। নিয়ম অনুযায়ী পণের হার ৩০ থেকে ৮০ টাকার মধ্যে হয়। কনের মূল্য মেয়ের

মা মেয়েকে লালন-পালন করার খরচ হিসাবে দাবি করে। বিধবা বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদ মগ সমাজে প্রচলিত আছে। মগ সমাজে তিন ধরণের বিবাহ পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয় যেমন (১) প্রেমের বিবাহ (২) অভিভাবকদের আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিবাহ এবং (৩) বরের কাজের বা শ্রমের বিনিময়ে বিবাহ। প্রেমের বিবাহে বর কনেকে নিয়ে দু তিনদিনের জন্য বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। পরে দু পরিবারের অভিভাবকেরা নবদম্পতি বিয়ের ব্যবস্থা করে। এই ক্ষেত্রে কনের পণ হিসাবে বর পক্ষকে ক্ষমতা অনুযায়ী নির্দ্ধারিত মূল্য দিতে হয়। মগদের বিবাহের কাজ বৌদ্ধ পুরোহিত মন্ত্রের মাধ্যমে সম্পন্ন করে। আজকাল মগ সমাজে বেশির ভাগ বিবাহ বরকনের অভিভাবকেরা কথাবার্তার মাধ্যমে স্থির করে। পাত্র-পাত্রী পছন্দ এবং নির্বাচনপর্ব শেষ হলে বর পক্ষ থেকে কনের অলংকার এবং পান, সুপারী, মদ নিয়ে কনের বাড়ি যায় এবং খাওয়া-দাওয়া হয়। বিয়ের এই পর্বকে বলা হয় আড়াওবদং। নির্দিষ্ট বিয়ের দিনে মগ পুরোহিত মন্ত্রের দ্বারা এবং আশীর্বাদের মাধ্যমে বিয়ের কাজ সম্পাদন করে। বিবাহ বাসরে বর কনেকে আত্মীয়স্বজন এবং গুরুজনেরা আশীর্বাদ করে। তারপর বর কনেকে একই থালায় ভাত খেতে দেওয়া হয় এবং খাওয়ার পর কনে বরের চারপাশে প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করে। বিয়ের পর বর কনে এক সপ্তাহকাল কনের বাড়িতে বসবাস করে। বিয়ের এক সপ্তাহ পর বর কনে বৌদ্ধমন্দিরে গিয়ে পুরোহিতের সামনে চিরস্থায়ী বিবাহিত জীবন যাপনের অঙ্গীকার বদ্ধ হয় এবং বিয়ের আচার অনুষ্ঠান শেষ হয়। মোট কথা মগদের বিবাহ সহজ সরল এবং খুব কম খরচে সুসম্পন্ন হয়।

মগ উপজাতি প্রধানত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। ত্রিপুরারাজ্যে প্রায় ৯৯ শতাংশ মগ উপজাতি বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী। মগদের কাছে "স্বর্গ" এবং "নরক" যথাক্রমে "স্যাগরাফোন" এবং "নেরেফোন" নামে পরিচিত। ভগবান বৌদ্ধকে তারা বলে "ফোরা"। মগদের ধর্মাচরণের মধ্যে বর্ম্মাদেশের ধর্মীয় আদব-কায়দা পরিলক্ষিত হয়। বর্তমনে ত্রিপুরায় বসবাসকারী মগ উপজাতিরা শনি, কালী, গঙ্গা এবং মগধেশ্বরী ইত্যাদি দেবদেবীর পূজাপার্বণ করতে দেখা যায়। মগধেশ্বরী দেবী মগদের কাছে খুব জাগ্রত দেবী, পূজা অর্চনার মন্দিরকে মগ ভাষায় বলে "কেয়াং"। প্রায় প্রতিটি মগ গ্রামে একটি করে কেয়াং দেখা যায়। মগেরা খুবই ধর্মভীরু। মগ ভাষায় পুরোহিতকে বলে "অ্যাশাঙ্গুফুরা"। পুরোহিত ধর্মীয় এবং সামাজিক অনুষ্ঠানের কাজ কর্ম সম্পাদন করে। পূজা অর্চনার স্থান অর্থাৎ কেয়াং এর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মগ গ্রামবাসীরা চাঁদা প্রদান করে। কেয়াং এর মধ্যে ছোট বাচ্চাদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা আছে। মগ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—নৌকা উৎসব, জল উৎসব, ব্যূহচক্র উৎসব এবং ধর্মীয় পুরোহিতের শেষকৃত্য উৎসব ইত্যাদি।

মগ উপজাতিরা নৌকা উৎসব আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে পালন করে। আশ্বিনী পূর্ণিমায় দিনের বেলায় মগ উপজাতিরা ভগবান বৌদ্ধকে নৈবেদ্য প্রদান করে পূজা দেয় এবং সন্ধ্যা সময় নদীর তীরে সমবেত হয়। ঠাকুরের উদ্দেশ্যে তারা ছোট ছোট

নৌকার প্রতিকৃতি তৈরি করে বাতি জ্বালিয়ে নদীর উজান থেকে ভাটির দিকে ভাসিয়ে দেয়। এই সময় তারা গান গায় এবং হৈ চৈ করে উৎসবের আনন্দ উপভোগ করে। তবে ত্রিপুরার মগ সম্প্রদায়ের মধ্যে নৌকা উৎসব তেমন পরিলক্ষিত হয় না। জল উৎসব চৈত্র মাসের শেষে উদ্‌যাপিত হয়। মগদের জল উৎসব হিন্দুদের দোল বা হোলি উৎসবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। জল উৎসবকে নূতন বছরের উৎসব হিসাবেও পালন করা হয়। এই উৎসবের সময় ভগবান বৌদ্ধের মূর্তি জল দ্বারা স্নান করানো হয়। মগ সম্প্রদায়ের লোকজনেরা দলবদ্ধ হয়ে একে অন্যের গায়ে জল ছিটিয়ে দেয়। গর্ভবতী মহিলারা ব্যতীত মগ সম্প্রদায়ের সকলে জলউৎসবে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করে এবং আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠে।

মাঘ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে মগ সম্প্রদায় "ব্যুহচক্র উৎসব পালন করে। এই উৎসব ৩-৪ দিন ধরে পালন করা হয়। এই উৎসবে বাঁশের বেড়া দিয়ে আঁকাবাঁকা গোলক ধাঁধার ব্যুহচক্র তৈরি করা হয়। ব্যুহচক্রের একটি মাত্র প্রবেশ পথ এবং একটি বহির্নির্গমনের পথ থাকে, পলে একবার ব্যুহচক্রে প্রবেশ করলে ঘুরেফিরে বহির্নির্গমন পথে এসে হাজির হবে। ব্যুহচক্রের স্থানে স্থানে ভগবান বৌদ্ধের মূর্তি থাকে। দর্শনার্থীরা ঠাকুরের স্থানে প্রণাম করে আশীর্বাদ গ্রহণ করে।

এছাড়াও মগদের ধর্মগুরু বা ফুংগ্রী মারা গেলে ধুমধামের সঙ্গে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শেষকৃত্য সম্পাদন করা হয়। ধর্মগুরুর মৃতদেহ কয়েকদিন কেয়াং এর মধ্যে সংরক্ষিত অবস্থায় রাখা হয় যেন সকলে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের সুযোগ পায়। তারপর নির্দিষ্ট দিনে শেষকৃত্য উৎসব সকলে মিলেমিশে ধুমধামের সঙ্গে সম্পাদন করে।

ত্রিপুরারাজ্যে মগেরা সমতলে বসবাস করলে কোনো ছোট জলধারা বা ছড়ার পাশে গ্রাম গড়ে তোলে। আজকাল সমতলে বসবাসকারী মগদের ঘর মাটির দেওয়াল দিয়ে তৈরি এবং ওপরে ছাউনি ছন অথবা টিনের হয়। এই সকল মগ বাড়িতে রান্নাঘরও আলাদা দেখা যায়। সমতলে বসবাসকারী মগ উপজাতিদের পেশা প্রধানত কৃষিকাজ। সমতলের চাষ বাসের সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ি এলাকায় জুম চাষও মগ উপজাতিরা করে থাকে। ত্রিপুরা রাজ্যের ১৯৮৭ সালের এক সমীক্ষায় দেখা যায় প্রায় ১৮৬১ পরিবার মগ উপজাতি তখনও জুম চাষের ওপর নির্ভরশীল। ১৯৮৭ সালে ত্রিপুরা রাজ্যে মগ জুমিয়া উপজাতির জনসংখ্যা ছিল উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৯১৭ জন এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ৮৫৯৮ জন। মগেরা বাঁশ বেতের কাজে খুবই পারদর্শী, ধান গোলাজাত করার জন্য মগেরা বাঁশবেত দিয়ে সুন্দর সুন্দর ডোল তৈরি করে। এছাড়া দা, কুড়াল, কোদাল, লাঙ্গল-জোয়াল, নিড়ি, কাঁচি, ঢেঁকি, বাঁশের তৈরি গোলাকার ডানা ইত্যাদি কৃষি সরঞ্জাম সমতলে বসবাসকারী মগ বাড়িতে দেখা যায়।

❒ সপ্তম অধ্যায়

গারো

"ত্রিপুরারাজ্যে গারো উপজাতি সম্প্রদায় বহিরাগত এবং সংখ্যালঘু। গারো উপজাতি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) এর ময়মনসিং এবং সিলেট জেলা থেকে এসে ত্রিপুরারাজ্যে বসতি স্থাপন করে। বর্তমানে ত্রিপুরারাজ্যের মধ্যে উদয়পুর, সদর, কমলপুর এবং কৈলাসহর মহকুমায় গারো উপজাতিদের বসতি অধিক পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীন ইতিহাসের ভাষ্য অনুসারে ভারতবর্ষে গারো উপজাতি সম্প্রদায় বহু পুরাতন। কারণ বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, পদ্মপুরাণ ইত্যাদি পৌরাণিক কাব্যগ্রন্থে ভারতবর্ষে গারোদের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। ত্রিপুরারাজ্যে গারো উপজাতির আগমনের প্রধান কারণ ময়মনসিং এবং সিলেট জেলার জুম চাষের জমির অভাব। এছাড়া দেশ বিভাগের পর তৎকালীন পাকিস্তানের দাঙ্গা, ঐ সময়ে ত্রিপুরারাজ্যে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ জুম চাষের জমির প্রাপ্যতা, নিজেদের হিন্দুধর্ম রক্ষা করা এবং হিন্দু বাঙালিদের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সখ্যতা ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক-যোগসূত্রের কারণে হিন্দু বাঙালিদের সঙ্গে ত্রিপুরায় আশ্রয় নেয় এবং বসতি স্থাপন করে। এছাড়া গারোদের ত্রিপুরারাজ্যে আগমন এবং বসতি স্থাপন নিয়ে একটি মজাদার গল্প শোনা যায়। সিমন সাংমা নামে একজন গারো ময়মনসিং এর ভাওয়ালে একদিন একটি বাঘকে গুলি করে। আহত বাঘটি গুলি খেয়েও না মরে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। গারো সম্প্রদায়ের ধারণা আহত বাঘ প্রতিশোধের জন্য ঐ ব্যক্তিকে খুঁজে বেড়ায়। সিমন সাংমা আত্মরক্ষার্থে ময়মনসিং থেকে পালিয়ে এসে ত্রিপুরারাজ্যের ইন্দ্রনগরে আশ্রয় নেয়, কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস, সিমন সাংমা যখন উদয়পুর মহকুমার পতিছড়ি গ্রামে বসতি স্থানান্তরিত করে সেখানে বাঘের আক্রমণে তার মৃত্যু হয়।

ত্রিপুরারাজ্যের ইন্দ্রনগর এবং নন্দননগর এলাকায় প্রথমে প্রায় ২০০ পরিবার গারো উপজাতি বসতি স্থাপন করে। পরবর্তী সময়ে জুমের জমি এবং কৃষি জমির খোঁজে নাগীছড়া, ধূপছড়া, নোয়াবাদী ইত্যাদি স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। আবার এমনও শোনা যায় ময়মনসিং এ বুনো হাতির উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে গারো উপজাতি ত্রিপুরারাজ্যের ছলখলা, ঝরঝরিয়া, কাঞ্চনমালা, সিপাহীজলা, মহিষখলা, প্রীতিলতা ইত্যাদি স্থানে এসে বসতি স্থাপন করে। সে সময় গারো উপজাতি জুম চাষের ওপর নির্ভরশীল ছিল। তাই, জুম চাষের জন্য জমির খোঁজে দক্ষিণ ত্রিপুরার উদয়পুর মহকুমার হোলাক্ষেতে যায় এবং ধীরে ধীরে আশপাশের গ্রাম হাতিপোছা, বুড়িডেপা, পেরাতিয়া, বসনখোলা, গর্জ্জি, কালাবন, পতিছড়ি, রাজাপুর ইত্যাদি স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে সদরমহকুমার কালাপানি থেকে কিছু সংখ্যক গারো পরিবার কমলপুর মহকুমার কুলাই, বাঘমারা, কচুছড়া, আমবাসা ইত্যাদি অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। অনুরূপ ভাবে, কিছু সংখ্যক

গারো পরিবার সদর মহকুমার ঝরঝরিয়া থেকে কৈলাসহর মহকুমার কাঁঠালছড়া, মরসুমপাথার, করাতিছড়া, ধূমাছড়া, বেতছড়া এবং কাঞ্চনছড়ায় বসতি স্থানান্তরিত করে।

প্রাচীনকালে গারো উপজাতি হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে ধর্মান্তর পরিলক্ষিত হয়। ত্রিপুরারাজ্যে গারো উপজাতি জনসংখ্যার পরিসংখ্যান নিম্নরূপ ঃ

সন	ধর্ম						মোট জনসংখ্যা
	হিন্দু		খ্রিস্টান		বৌদ্ধ		
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	
১৯৯১	২০৭	৭৫·৮২	—	—	৬৬	২৮·১৮	২৭৩
১৯৩১	২১৪৩	১০০	—	—	—	—	২১৪৩
১৯৬১	৩৭৮৫	৬৯·০২	১৬৯৮	৩০·৯৬	১	০·৬২	৫৪৯৪
১৯৭১	৩২১৬	৫৭·৮৫	২৩১৫	৪১·৬৫	২৮	০·৫০	৫৫৫৯
১৯৮১	৩৩০০	৪৫·২২	৩৯৪৩	৫৪	৫৪	০·৭৪	৭২৯৭

গারো উপজাতি গারো ভাষায় কথা বলে। গারো ভাষা বড়ো ভাষা তথা তিব্বতী ভাষা গ্রুপের অন্তর্গত।

গারো উপজাতির শারীরিক গঠন মঙ্গোলীয়দের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। গারোদের শরীর বড়সড়, উচ্চতা মাঝারি ধরণের, পুরুষেরা গড়ে ৫ ফুট এবং মহিলারা ৪ ফুট ১০ ইঞ্চি লম্বা হয়। চোখ ছোট, নাক চ্যাপ্টা তবে বড়সড়, ঠোঁট মোটা, কান বড় এবং চোয়ালের হাড় প্রশস্ত। পুরুষের বুকে লোম এবং মুখে দাড়ি-গোঁফ কম। গায়ের রঙ শ্যামলা।

গারো উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে মাতৃতান্ত্রিক বা নারীকর্ত্রী সামাজিক ব্যবস্থা অধিক পরিলক্ষিত হয়। এর প্রধান কারণ, প্রাচীনকালে পুরুষেরা শিকার, খাদ্যসংগ্রহ এবং জনজীবন রক্ষা করার জন্য বেশির ভাগ সময় বাড়ি ঘরের বাইরে দূরদূরান্তে ব্যস্ত থাকতো। ফলে, বাড়ির মহিলারা ছেলেমেয়েদের এবং বাড়িঘরের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করতো। এছাড়া তৎকালে গারো ছেলেমেয়েদের মধ্যে অবাধ মেলামেশা এবং বিয়ের পূর্বে মেয়েদের গর্ভবতী হওয়ার ব্যাপারে তেমন সামাজিক বাধা নিষেধ ছিল না। ফলে যুবক-যুবতীদের বিয়ের পূর্বে অবাধ মেলামেশার কারণে সন্তানের জন্ম দেওয়া সেই সময়ে ছিল অতি সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু সন্তানের দায়দায়িত্ব পরবর্তী সময়ে শুধুমাত্র মাকে বহন করতে হত। তাই ছেলেমেয়েরাও মায়ের নামেই সমাজে প্রতিষ্ঠিত হত। তবে এইক্ষেত্রে মামারাও ভাগ্নে-ভাগ্নীদের ওপর কর্তৃত্ব করতো। এছাড়া গারো সমাজে মেয়েরা উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তির অধিকারী হয় এবং ছেলেরা

সম্পত্তির কোনো অংশ পায় না। গারো সমাজের সাধারণ নিয়ম অনুসারে পরিবারে সব চেয়ে ছোট মেয়ে মায়ের সমস্ত সম্পত্তির উত্তর অধিকারী হয়, তবে অন্য বোনদের বিয়ের সময় মায়ের ইচ্ছা অনুযায়ী কিছু সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারা করে দেও হয়। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, গারো ছেলেরা বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে ঐ পরিবারে সদস্য হিসাবে স্ত্রীর সঙ্গে বসবাস করে, অথবা স্ত্রীর সঙ্গে নূতন বাড়িতে বসবাস কর

অন্যদিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, গারো সমাজব্যবস্থায় প্রাচীন কালে ছেলেদে মা বাবার সঙ্গে থাকতে দেওয়া হত না। তারা গ্রামের বহু শয্যাবিশিষ্ট অবিবাহিতদে শয়নাগারে বিয়ের পূর্বে থাকতো। প্রাচীনকালে প্রতিটি গারো গ্রামে একটি ক "নকপান্টি" থাকতো। গারো ভাষায় "নক" অর্থ ঘর এবং পান্টি অর্থ অবিবাহি গ্রামের সমস্ত অবিবাহিত ছেলেরা একজন বয়স্ক অবিবাহিত পুরুষের তত্ত্বাবধানে সা আট বছর বয়স থেকে বিয়ে না হওয়া অবধি খেলাধূলা, গান-বাজনা ইত্যাদির মাধ্য সময় কাটাতো, প্রয়োজনে গ্রামরক্ষী বাহিনীর কাজ করতো। অবিবাহিত ছেলেদে শুধুমাত্র ভাত খাওয়ার জন্য অথবা সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য মায়ের বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হত তবে কর্মক্ষম ছেলেরা মা বাবাকে কৃষিকাজে ও সংসা অন্যান্য কাজে শ্রম দান করে সাহায্য করতে পারতো। যেহেতু অবিবাহিত ছেলে ছোটবেলা থেকে বাড়িতে থাকতে পারতো না। তাই মেয়েরা মায়ের সংসারের বিভি কাজকর্ম এমন কি কৃষিকাজ ইত্যাদি তে অংশ গহণ করে পরিবার পরিচালনায় মা সর্বতোভাবে সাহায্য করতো এবং সংসারের পরবর্তী সময় কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা অ করতো। আজকাল নকপান্টির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।

গারো সমাজে এক বোনের ছেলের সঙ্গে অন্য বোনের মেয়ের বিয়ে দেওয়া উ বলে বিবেচিত হয়। তবে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার আগে মেয়ের মতামত প্রাধান্য পা কোনো মেয়ে যদি কোনো ছেলেকে স্বামীরূপে পেতে ইচ্ছা প্রকাশ করে, তবে ছেলের ইচ্ছা অনিচ্ছাকে উপেক্ষা করে, সেই মেয়ের সঙ্গে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হ যদি সঙ্গ দেওয়ার পরও ছেলে মেয়ের মধ্যে সমঝোতা না হয়, তবে ছেলেকে সামাজি ব্যবস্থার মাধ্যমে নিজ বাড়িতে ফেরত পাঠানো হয়।

অন্য এক প্রকার বিবাহ পদ্ধতির মধ্যে দেখা যায়, বাড়ির সকলে ঘুমিয়ে পড় ছেলে এসে চুপিচুপি মেয়ের সঙ্গে রাত কাটায়, এই ক্ষেত্রে যদি ছেলে ধরা পড়ে ত বিবাহ করতে বাধ্য করা হয় এবং রাত কাটিয়ে কোনো ভাবে ছেলে পালিয়ে গে কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করা হয়।

গারো সমাজে বিবাহ পদ্ধতির মধ্যে এমনও দেখা যায় গোপনে মেয়েছেলে নিয়ে গ্রাম থেকে পালিয়ে যায় এবং অন্যত্র স্বামী-স্ত্রী হিসাবে বসবাস করে। কিছুদিন মধ্যে পরিবারের লোকজন ওদের খুঁজে বের করে এবং উভয়ের জরিমানা ক সামাজিক বিবাহের ব্যবস্থা করে থাকে।

গারোদের মধ্যে অবিবাহিত মেয়ে অবিবাহিত ছেলেকে বিয়ে করে থাকে। একই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। গারোদের বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলি সাধারণত পাখি, গাছ, পাহাড় পর্বত অথবা নদী ইত্যাদির নামে পরিচিতি লাভ করে। তাদের ধারণা একই গোষ্ঠীর সকলে এক মায়ের সন্তান। ত্রিপুরারাজ্যে গারোদের ৫৪টি গোষ্ঠী বসবাস করে। গোষ্ঠীগুলির নাম যেমন "ডুফু" অর্থ পেঁচা, জালুক অর্থ লংকা, 'আতি' অর্থ হাতি ইত্যাদি। সামাজিক বিয়ের পর মেয়েরা মায়ের বাড়িতে থাকে এবং জামাই সেই পরিবারের সদস্য হিসাবে গণ্য হয় অথবা স্বামী স্ত্রী দুই জনে আলাদা বাড়িতে বসবাস করতে পারে। যদি অবিবাহিত ছেলে কোনো বিধবা মহিলাকে বিবাহ করে এবং ঐ মহিলার প্রাক্তন স্বামীর কোনো মেয়ে থাকে সে অতিরিক্ত স্ত্রী হিসাবে গণ্য হয়। যদি কোনো বিবাহিত পুরুষের স্ত্রী অসুস্থ অথবা বন্ধ্যা হয় তবে স্ত্রীর ছোট বোনকে দ্বিতীয় স্ত্রী হিসাবে নির্বাচন করা যায়। অনুরূপ স্বামীর মৃত্যুর পর বৌদি দেবরকে বিবাহ করতে পারে।

গারো সমাজে বিবাহকে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে স্থায়ী বন্ধনসূত্রে আবদ্ধ করে। বিবাহের পর মৃত্যু পর্যন্ত স্বামী স্ত্রী নিজ নিজ গোষ্ঠীতে পরিচিতি থাকে। কিন্তু তাদের সন্তানগণ মায়ের গোষ্ঠী হিসেবেই পরিচিতি পায়।

গারোদের সামাজিক বিবাহ পদ্ধতি খুবই সহজ। কনের বাড়িতে বিয়ের সময় বর কনে পাশাপাশি বসে। গারো পুরোহিত (কামাল) মন্ত্র উচ্চারণ করে দুটি মোরগ উৎসর্গ করে। একটি মুরগা এবং একটি মুরগীর মাথা লাঠি দিয়ে পিটে মাটিতে ছুড়ে ফেলে দেয়া হয় যতক্ষণ না মারা যায়। তার পর মাথা দুটি ছিঁড়ে মুরগা মুরগীর রক্ত এক সঙ্গে মেশানো হয়। গারো সমাজে বিয়ের শুভাশুভ লক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়, যেমন আহত মুরগা মুরগী দুইটি যদি মৃত্যুর আগে একটি অন্যটির দিকে অগ্রসর হয়, তবে ধরে নেওয়া হয় বিবাহিত দম্পতি সুখে জীবন যাপন করবে। কিন্তু মুরগা মুরগী দুটি একটি অন্যটির বিপরীত দিকে অগ্রসর হলে ধরে নেওয়া হয় বিবাহিত জীবন সুখের হবে না এবং বিবাহ-বিচ্ছেদের সম্ভাবনা আছে। এছাড়া পুরোহিত (কামাল) মুরগা মুরগী দুটির পেট কেটে নাড়িভুঁড়ি পরীক্ষা করে। যদি নাড়িভুঁড়ি গুলি সমান দৈর্ঘ্যের হয় তবে শুভ বিবাহ হিসাবে গণ্য হয়, অন্যদিকে দৈর্ঘ্য অসমান হলে অশুভ সংকেত বহন করে।

শুভবিবাহের সংকেত পাওয়া গেলে কনে পক্ষ সমস্ত গ্রামবাসীকে ভূঁড়িভোজনের দাওয়াত দেয়। বর কনেকে একই থালার মধ্যে একসঙ্গে খেতে দেওয়া হয়। তবে গ্রামবাসীদের ভূড়িভোজনের ব্যবস্থা একটি নির্দিষ্ট দিন ধার্য্য করে সম্পাদন করা হয়।

ত্রিপুরারাজ্যে বসবাসকারী গারো উপজাতির প্রধান খাদ্য ভাত। এছাড়া মাংস, মাছ, শুকনো মাছ, বাঁশের কচি চারা, বুনো মাশরুম, বিভিন্ন ধরনের বুনো আলু এবং ফল মূল ও তাদের প্রিয় খাদ্য। জুমিয়া গারো উপজাতিদের ভাত রান্না করার পদ্ধতিতে

দেখা যায়, এক প্রান্তে এক গিঁট বিশিষ্ট কাঁচা বাঁশের চোঙের ভিতর চাউল এবং পরিমাণ মত জল দিয়ে, চোঙের খোলামুখ কলাপাতা দিয়ে ভালভাবে এঁটে বন্ধ করে দেয়। তারপর বাঁশের চোঙটি জ্বলন্ত কাঠকয়লার মধ্যে উত্তপ্ত করে। ফলে চোঙের ভিতর চাউল সিদ্ধ হয়ে ভাত হয়ে যায়। চোঙ সহ ভাত জুমে নিয়ে যায় এবং জুমে কাজ করার সময় চোঙটি ফালি করে ঝুরঝুরে ভাত বের করে মধ্যাহ্ন ভোজন সারে। তরকারির মধ্যে গোদক উপজাতিদের অতিপ্রিয় খাদ্য। সাধারণত শুকনো মাছ (গাঁজানো পুঁটি মাছ) এবং সবজী, বিশেষ করে বেগুন, কচি বাঁশের চারা (বাঁশ করুল), সীম, বরবটী ইত্যাদির সংমিশ্রণে গোদক তৈরি করা হয়। প্রথমে সব্জীগুলিকে টুকরো করে কাটা হয় এবং বাঁশের চোঙের মধ্যে পুরে পরিমাণ মত লবণ, কাঁচা লঙ্কা ইত্যাদি দেওয়া হয়। তারপর বাঁশের চোঙটি জ্বলন্ত কাঠ কয়লার মধ্যে ফেলে সব্জীগুলিকে সিদ্ধ করা হয়। সিদ্ধ করা সবজীগুলি বাঁশের চোঙের ভিতর একটা বাঁশের কাঠি দিয়ে ভালভাবে ঘুঁটে মিশিয়ে নেওয়া হয় এবং সুস্বাদু চুঙাগুতানি তরকারি হিসাবে ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করা হয়। আতপ চাউলের ভাত বেশি পছন্দ করে। অনেক গারো পরিবারে সরিষার তৈলের পরিবর্তে শূকরের তৈল ব্যবহার করে। বাঁশের চোঙের মধ্যে তারা শূকরের চর্বি থেকে তৈল তৈরি করে মজুদ করে রাখে। গরমভাতের সঙ্গে শূকরের তৈল মেখে খাওয়া তাদের কাছে ঘি ভাতের সমতূল্য।

ত্রিপুরার গারো উপজাতি সংঘবদ্ধ ভাবে পাশাপাশি ঘরবাড়ি তৈরি করে। বসবাস করার জন্য তৈরি ঘরকে গারোভাষায় বলে "নকমাণ্ডী"। গারোদের ঘর বাড়ি তৈরি করার আগে পুরোহিত বা "কামাল" পূজা দেয়। পূজার উপকরণ হিসাবে চাউল, ডিম, তীর, ধনু ইত্যাদি উৎসর্গ করে। পূজার পর পুরোহিত নূতন ঘর বাড়ির ভবিষ্যৎ কেমন হবে গৃহস্বামীকে জানিয়ে দেয়। যদি পূজার ফল শুভ হয়, তবেই ঐ স্থানে ঘর বাড়ি তৈরি করা হয় নতুবা অন্যত্র স্থান পরিবর্তন করার পরামর্শ দেয়। নূতন বাড়ি ঘর তৈরি করার পর উৎসর্গ পর্বে গারোরা গান গায়।

ত্রিপুরার প্রত্যন্ত অঞ্চলের গারোদের চিরাচরিত ঘর গাছের খুঁটির ওপর বাঁশের চাটাই দিয়ে মাচার ন্যায় তৈরি করে তার ওপর করা হয়। ঘরের ছাউনির জন্য ছন বহুল ব্যবহৃত হয়। বাঁশের বেড়ার সাহায্যে ঘরের চার পাশ ঢাকা থাকে। গারোদের ঘরের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল সামনে ও পিছনে দুটি দরজা থাকে। ঘর লম্বায় প্রায় ১০০ ফুট হলেও পাশে কোনো জানলার ব্যবস্থা থাকে না।

গারোদের ঘর বিভিন্ন কাজকর্ম সম্পাদনের জন্য মোটামুটি ভাবে তিন ভাগে বিভক্ত। যদিও, ঘরের মধ্যে কোনো প্রকার দেওয়াল দিয়ে আলাদা আলাদা কোঠা তৈরির ব্যবস্থা থাকে না। ঘরের সম্মুখের বেড়ায় বিভিন্ন ধরণের পশুপাখির ছবি লাগানো থাকে। গারো উপজাতি পূর্বপুরুষদের স্মরণার্থে একটি বিশেষ খুঁটি ঘরে রাখে। মাচার ওপর ওঠার জন্য বড় গাছের গুঁড়ির মধ্যে ধাপ কেটে সিঁড়ি তৈরি করা হয়। ঘরের সম্মুখ

ভাগের অংশে মাচার উপর মাটির প্রলেপ দেওয়া থাকে এবং এই অংশে সাধারণত লাকড়ি, ধান ভাঙ্গার কাঠের হামান দিস্তা (চাম র‍্যমল) গৃহপালিত পাখি এবং সংসারের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রাখা হয়।

তারপর ঘরের সামনের দরজার সম্মুখ ভাগে বিভিন্ন সামাজিক এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করার জন্য নির্দিষ্ট থাকে।

তারপরের অংশে মদ তৈরির সরঞ্জাম বসানো থাকে এবং বাড়ির মহিলারা দেশী মদ (চু) তৈরি করে। ঘরের কেন্দ্রস্থলে আগুনের চুল্লী থাকে এবং রান্নাবান্নার কাজ করা হয়। রান্নাবান্নার সময় ব্যতীত গারো উপজাতিদের ঘরের মধ্যে সবসময় আগুনের ধুনি জ্বালানো থাকে।

বর্তমানে সমতলে বসবাসকারী গারো পরিবার গুলি মাটির দেওয়াল দিয়ে ঘর তৈরী করে থাকে। ঘরের ছাউনীর কাজ ছন অথবা টিন দ্বারা করা হয়।

গারো উপজাতি জন্ম এবং বিবাহ অপেক্ষা মৃতের সৎকার্যের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। হিন্দু গারো উপজাতি শব দাহ করে। পরিবারে কেউ মারা গেলে প্রথমে মৃত্যু সংবাদ সত্বর তাঁর নিকট আত্মীয়স্বজনদের কাছে পাঠানো হয় এবং আত্মীয় স্বজনেরা এসে পৌঁছানোর পর সৎকার্য্য সম্পাদন করা হয়। মৃত্যুর পর যতক্ষণ দাহ কার্য সম্পাদন করা হয়, ততক্ষণ একজন শবদেহ পাহারা দেয়। গ্রামের লোকজন এসে মদ্যপান করে এবং এক প্রকার ঢোল বাজায়। শবদাহের পূর্বে পর্যন্ত, মৃত ব্যক্তির আত্মার উদ্দেশ্যে মদ এবং খাবার উৎসর্গ করা হয়। দাহের পূর্বে মৃতদেহটিকে স্নান করানো হয় এবং দাহ পর্ব শেষ হলে শ্মশান থেকে কয়েকটি হাড় সংগ্রহ করে বাড়িতে এক স্থানে পুঁতে দেওয়া হয়। শবদাহের পরদিন আত্মীয়স্বজনদের উপস্থিতিতে শ্মশানে একটি বাঁশের ছোট ঘর তৈরি করা হয় এবং "সালজোঙ্গ" পূজা দেওয়া হয়। তারপর ওয়াদালা পূজার পর মৃতের পারলৌকিক কার্য্য সমাপ্ত হয়।

নাচ গান গারো উপজাতিদের খুবই প্রিয়। প্রায় প্রতিটি পূজা পার্বণ এবং আনন্দ উৎসবে গারোরা তাদের চিরাচরিত নাচ গান করে থাকে। গারো উপজাতিদের বিভিন্ন লোক নাচ গান বহু প্রাচীন কাল থেকে সমৃদ্ধ এবং সমাদৃত। এই সকল লোক নাচ-গান বেশির ভাগ ধর্মীয়, কৃষিব্যবস্থা এবং প্রণয়ের বিষয়বস্তুর ওপর নির্ভরশীল। এছাড়া গারোদের নাচগানের মধ্যে বিভিন্ন পশুপাখির ক্রিয়াকলাপ ও পরিলক্ষিত হয়। বেশির ভাগ গানের সঙ্গে নাচ ও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। গারোদের চিরাচরিত বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল "ডামা" এবং "ক্রাম" দু ধরণের ঢোলক, মহিষের শিংয়ের দ্বারা তৈরি শৃঙ্গা, বাঁশের বাঁশি ইত্যাদি।

নাচগানের মধ্যে "মাগোঙ্গলা" চৈত্র মাসে খরার সময় বৃষ্টির জন্য করে থাকে। এই নাচ গানে একজন বানরের মুখোস এবং বেশ কয়েকজন বাঘের মুখোস পরিধান করে, দলবদ্ধ হয়ে গ্রামের বাড়ি বাড়ি গিয়ে নাচ-গান করে। বাড়ির লোকজন জল

ছিটিয়ে নাচের দলটিকে সিক্ত করে। নাচ-গান শেষ হলে বাড়ির মালিক কিছু পরিমাণ চাউল এবং কাঁচা সব্জী সম্প্রদান করে থাকে। অন্যদিকে অতি বর্ষা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে গারো উপজাতি "সালাকসুয়া" নাচ-গান করে থাকে। বৃষ্টির মধ্যে হাতে আগুন নিয়ে নাচ-গান করে থাকে। ওয়াঙ্গালা উৎসবের সময় স্ত্রী-পুরুষ মিলেমিশে "ডকরুসুয়া" নাচ-গান করে। "কিলপুয়া" নাচ ফসলের দেবদেবীকে সন্তুষ্ট করার জন্য স্ত্রী-পুরুষ মিলেমিশে তুলো ফসলের রোপণের বিস্তারিত দৃশ্য দেখায়। "অ্যামব্রেরুয়া" নাচ গানের মাধ্যমে দুজন যুবতী বিভিন্ন ফল সংগ্রহের দৃশ্য দেখায়। পুরুষেরা এতে অংশ গ্রহণ করে না। ভালোবাসা বা প্রেমের গান ও গারো উপজাতিরা খুব পছন্দ করে, তাদের প্রেমের গানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল র‍্যারে, সেরেজিং ইত্যাদি। গারো উপজাতিদের মধ্যে এমন ধারণা বিদ্যমান যে মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় নাচ-গান করা হলে মৃতের আত্মার সদগতি প্রাপ্তির সহায়ক হয়। তবে এই সকল গানের সুর সাধারণত করুণ এবং বেদনাদায়ক হয়। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার নাচ গানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল "অ্যাজেমা", "মাছুয়া", "রুডিলা", "ডালাঙ্গরুরুয়া" ইত্যাদি। এছাড়া ও নাচ-গান প্রেমী গারো উপজাতি সম্প্রদায়ের আরো অনেক বিভিন্ন ধরণের নাচ গান বিদ্যমান।

হিন্দু গারো সম্প্রদায় অধ্যাত্মবাদ এবং বহুদেবতায় বিশ্বাসী। দেবশক্তিকে গারোরা "মিদ্দি" বলে থাকে। হিতৈষী এবং ক্ষতিকারক হিংসাপর দেবদেবীকে পূজা পার্বণ করে, ছাগল, শূকর, মোরগ ইত্যাদি উৎসর্গ করে রোগ বালাই এর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব এমন ধারণা গারো সমাজে বিদ্যমান। গারো উপজাতি যে কোনো ধরণের সমস্যায় তাদের পুরোহিত বা "কামাল" এর শরণাপন্ন হয়। পুরোহিতের উপাদেশ অনুযায়ী নির্দিষ্ট দেবদেবীর পূজা পার্বণ করে।

গারোদের পূজা পার্বণের মধ্যে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, প্রায় প্রতিটি ঠাকুরকে সন্তুষ্ট করার জন্য পশুপাখি উৎসর্গ করার রেওয়াজ বিদ্যমান। এছাড়া রোগের কারণ অনুসারে ঠাকুর নির্দিষ্ট আছে। পৃথক পৃথক ঠাকুরের পূজার স্থান, সময় উৎসর্গীকৃত পশুপাখির রঙ ইত্যাদিও নির্দিষ্ট করা আছে। পুরোহিত বা কামাল প্রথমে রোগীকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে রোগের কারণ, কোন ঠাকুর রুষ্ট হওয়ায় হয়েছে নির্ণয় করে এবং পূজার বিধান দিয়ে থাকে।

ত্রিপুরারাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী গারো উপজাতি রোগগ্রস্ত হলে দুষ্ট আত্মার আশ্রয়, ঠাকুর দেবতা রুষ্ট হওয়া ইত্যাদির ওপর বিশ্বাসী হয়। রোগের কারণ নির্ণয়ে গারোদের পুরোহিত বা "কামাল" বৈদ্যের কাজ সম্পাদন করে এবং রোগ নিরাময়ের জন্য প্রয়োজনীয় পূজাপার্বণ, ধর্মীয়বিধি নিষেধ, মাদুলি, তাবিজ, ঝাড় ফুঁ, যাদুকরী মন্ত্রতন্ত্র এবং স্থানীয় গাছ-গাছড়া ও দ্রব্যের ঔষধ ব্যবহারের বিধান দিয়ে থাকে। এছাড়া রোগীর শত্রুর দ্বারা বিভিন্ন ধরণের ক্ষতিকর প্রয়াসের কারণে ও রোগাক্রান্ত হয়, এমন ধারণা গারোদের রয়েছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের গারো পরিবারে

কেউ অসুস্থ হলে প্রথমে পরিবারের প্রধান ব্যক্তিদের নির্দেশ অনুসারে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। যদি রোগ না সারে তখন স্থানীয় পুরোহিত বা গ্রামীণ বৈদ্য বা "কামাল" কে খবর দেওয়া হয়। এছাড়া প্রয়োজনে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের নামীকামী পুরোহিতদের পরামর্শ ও গ্রহণ করা হয়।

গ্রাম্য পুরোহিত রোগীকে পরীক্ষা করার সময় প্রথমে রোগের কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে। যেমন রোগী কোনো প্রকার দুষ্ট প্রেতাত্মা দ্বারা আক্রান্ত কিনা? রোগী কোনো প্রকার দুঃস্বপ্ন দেখে কিনা? কোনো দেবদেবী রোগীর উপর রুষ্ট কিনা? রোগগ্রস্ত হওয়ার জন্য রোগী কোনো ব্যক্তিকে সন্দেহ করে কিনা? ইত্যাদি। তারপর পুরোহিত বা বৈদ্য ঝাড়, ফুঁ জাদুকরী মন্ত্র তন্ত্র, পূজাপার্বণ, মাদুলি, ধর্মীয় বিধিনিষেধ এবং দেশীয় গাছগাছড়ার ঔষধ ব্যবহারের বিধান দেয়। ঝাড়, ফুঁ, তন্ত্রমন্ত্র, মাদুলি ইত্যাদি প্রয়োগে পুরোহিত বা কামাল খুবই গোপনীয়তা রক্ষা করে, তাই এই সকল তত্ত্ব সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে দেশীয় গাছ-গাছড়া এবং দ্রব্য থেকে যে সকল লোক ঔষধের (Folk medicine) বিধান ত্রিপুরায় গারো উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় তার মধ্যে কয়েকটি সংক্ষেপে আলোচনা করা হল—

কাশি হলে তুলসীপাতা, বেলপাতা, বাসকপাতা এবং আদা থেকে রস নিঃসৃত করে রোগীকে তিন দিন খাওয়ানো হয়।

ছোট শিশু এবং বাচ্চাদের সর্দ্দিকাশি হলে শূকরের পুরাতন তেল গরম করে ঈষৎ উষ্ণ অবস্থায় বুকে পিঠে মালিশ করা হয়।

মাথা ধরা নিরাময়ের জন্য রসুন থেতলে লেই তৈরি করে কপালের ওপর প্রলেপ দেওয়া হয়।

শরীরের পোড়া স্থানে নারিকেল তেল, মোম একসঙ্গে গরম করে প্রলেপ দেওয়া হয়। অথবা সবরি কলা চটকে লেই তৈরি করে পোড়াস্থানের ওপর প্রলেপ দেওয়া হয়।

দাঁত ব্যথা হলে তামাক পাতা, কুল গাছের ছাল এবং কাঁটা নটের বাকল পোড়ানো হয়। রোগী ঔষধের গুঁড়ো ব্যথাস্থানে প্রয়োগ করে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে মুখ ধুয়ে নেয়। দিনে অন্তত তিনবার এই ঔষধ প্রয়োগের বিধান দেওয়া হয়।

পোকার কামড়ে টক স্বাদ যুক্ত যে কোনো গাছের পাতার রস প্রয়োগ করা হয়। অথবা চুকাইগোডা (টক ট্যাঁড়স) গাছের শিকড়ের রস প্রয়োগ করা হয়। অথবা চুনের প্রলেপ দেওয়া হয়।

দাদ হলে তুলসীপাতার রস, লবণ এবং সরিষার তেল একসঙ্গে মিশিয়ে প্রয়োগ করা হয়।

খোস-পাঁচড়া হলে উনুনের পোড়া মাটির প্রলেপ দেওয়া হয়।

কাটা স্থানের রক্ত ঝরা বন্ধ করার জন্য গাঁদা ফুল গাছের পাতা অথবা বনতুলসী (মরিচা) গাছের পাতা থেতলে কাটা স্থানে চেপে বসিয়ে দেওয়া হয়।

সন্তান প্রসবের পর রক্ত ক্ষরণ বন্ধ না হলে মাকে দূর্বা ঘাসের রস খাওয়ানো হয়।

মহিলার সুতিকা জ্বর হলে শিমুল তুলো, শাল, বন বড়ই (বুনো কুল) ইত্যাদি গাছের ছালের রস এবং শাপলা (শালুক) একসঙ্গে মাটির পাত্রে ফুটিয়ে রোগিণীকে খাওয়ানোর বিধান দেওয়া হয়।

ত্রিপুরার গারো উপজাতি ঘুমের মধ্যে যে স্বপ্ন দেখে তার ভবিষ্যৎ ফলাফল সম্পর্কেও বিশ্বাসী। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কেউ যদি স্বপ্নে মাছ ধরার দৃশ্য দেখে তবে সে অদূর ভবিষ্যতে টাকা পাবে এমন ধারণা করা হয়। বাঘ স্বপ্নে দেখলে সে অসুস্থ হবে। হাতি স্বপ্নে দেখলে তাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। গাভী স্বপ্নে দেখলে কারো সঙ্গে ঝগড়াঝাটি হবে। অবিবাহিত ছেলে বা মেয়ে যদি ছাগল স্বপ্নে দেখে, তবে তার ভাবী স্ত্রী বা স্বামী কালো রঙের হবে। যদি গর্ভবতী মহিলা মুরগা স্বপ্নে দেখে তবে তার ভাবী সন্তান ছেলে হবে, কিন্তু মুরগী স্বপ্নে দেখলে কন্যা সন্তান হবে। যদি কোনো বাচ্চা ছেলে মেয়ে পাখি স্বপ্নে দেখে তবে সে দীর্ঘদেহ পাবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিভিন্ন রোগ নিরাময়ের জন্য গারো উপজাতি যে সকল ঠাকুর দেবতার পূজা পার্বণ পালন করে তা সংক্ষেপে দেওয়া হল—

▲ রোগ নিরাময়ে গারোদের পূজা পার্বণ ▲

পূজার/ঠাকুরের নাম	রোগের নাম/লক্ষণ	কোথায়, কখন, পশুপাখি উৎসর্গ করে পূজা করা হয়
১। সালজাটসকা	ছোট ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন প্রকার রোগের জন্য	বাড়ির ভেতর দুপুর বেলায় একটি মোরগ উৎসর্গ করে পূজা দেওয়া হয়।
২। তাতারামহামতাম	ঐ	বাড়ির ভিতর সন্ধ্যা সময় একটি মোরগ উৎসর্গ করা হয়।
৩। অ্যানিং	পেটের গোলমাল সারাই করার জন্য	জঙ্গলের মধ্যে একটি মোরগ উৎসর্গ করা হয়।
৪। অ্যামান্ড	পেটের ব্যথা	একটি কাঠের কচ্ছপ প্রতিকৃতি তৈরি করে ছড়ার জলে ছাড়া হয় এবং একটি মোরগ উৎসর্গ করা হয়।
৫। ওয়ালডপ	সারা শরীরের ব্যথা বেদনা, রোগী খোঁড়া হয়ে গেলে।	ঘরের দরজার সামনে সকাল বেলায় একটি মোরগ উৎসর্গ করে পূজা করা হয়।

পূজার/ঠাকুরের নাম	রোগের নাম/লক্ষণ	কোথায়, কখন, পশুপাখি উৎসর্গ করে পূজা করা হয়
৬। গারাম	গায়ে অসহ্য ব্যথা বেদনা হয়।	জঙ্গলের মধ্যে একটি কালো রঙের পাঁঠা উৎসর্গ করা হয়।
৭। মিসিন্না	খুব বেশি মাথাধরা এবং যন্ত্রণা লাঘব করার জন্য	বনের মধ্যে বড় গাছের নীচে সকাল বেলায় একটি মোরগ উৎসর্গ করে পূজা করা হয়।
৮। জাগিক্ষিপ্যাঙ্গ	রোগীর শরীরে বিভিন্ন ধরণের ক্ষত এবং শরীর ফুলে গেলে	একটি মোরগ উৎসর্গ করে পূজা দেওয়া হয়।
৯। বিডাসীফ্রেঙ্গ	জ্বর বা শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে	ছড়ার ধারে একটি শূকর উৎসর্গ করে পূজা করা হয়।
১০। উদাম	এই ঠাকুর ঈর্ষাপরায়ণ হলে রোগীর হাত পা সরু হয়ে যায়।	একটি মানুষের প্রতিকৃতি তৈরি করে রাস্তার ধারে পূজার সময় একটি কালো রঙের পাঁঠা উৎসর্গ করা হয়।
১১। জোঙ্গক্ষিপ্যাঙ্গ	ছোট ছেলে মেয়েরা দেরিতে হাঁটে	ঘরের দরজায় মদ এবং একটি মোরগ উৎসর্গ করে পূজা করা হয়।
১২। সালবাম্যান	চোখের রোগের জন্য বিশেষ করে চোখে ব্যথা বেদনা অথবা কম দেখা অথবা অন্ধ হওয়ার জন্য বড় ভাই সালবাম্যান বামানফেঙ্গ এবং ছোটভাই সালবাম্যান গারডালি ঠাকুরের পূজা দেওয়া হয়।	বাড়ির ভিতর সকাল বেলায় বড়ভাইকে পূজার সময় চারটি মোরগ ও একটি ডিম এবং ছোট ভাইকে একটি মোরগ উৎসর্গ করা হয়।
১৩। ডারছিক	সন্তান প্রসবের সময় মায়ের অত্যধিক রক্ত ক্ষরণ হলে	নবজাত শিশুর জন্মের পর বাড়ির ভিতর সকাল বেলায় একটি মোরগ উৎসর্গ করা হয়।
১৪। জোগো	জোগোওয়াফোঙ্গ এবং জোগোওয়াফেঙ্গ দুই ভাই অসন্তুষ্ট হলে গারোদের ধারণা বুকে ব্যথা হয়।	বড় ভাই জোগোওয়াফোঙ্গ ঠাকুরকে একটি শূকর এবং ছোট ভাই জোগোওয়াফেঙ্গ ঠাকুরকে পূজার সময় একটি মোরগ উৎসর্গ করা হয়।

পূজার/ঠাকুরের নাম	রোগের নাম/লক্ষণ	কোথায়, কখন, পশুপাখি উৎসর্গ করে পূজা করা হয়
১৫। ডরওয়াজোনঙ্গম	ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে বৃদ্ধ সুলভ এবং বৃদ্ধদের মধ্যে বালকসুলভ কার্যকলাপ পরিলক্ষিত হলে	বাড়ির ভিতর পিছনের দিকে একটি মোরগ উৎসর্গ করে পূজা দেওয়া হয়।
১৬। স্কল	এই দুষ্ট আত্মা রুষ্ট হলে মানুষের অসুখ বিসুখ হয়।	এই দুরাত্মাকে সন্তুষ্ট করার জন্য একটি ছাগল উৎসর্গ করা হয়।
১৭। সুসমি	এই ঠাকুর রুষ্ট হলে অন্যদের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি হয়। রোগী অন্ধ অথবা খোঁড়া হয়ে যায়।	পূজার সময় একটি শূকর, পাঁঠা অথবা মোরগ উৎসর্গ করা হয়।

গারো উপজাতি বট গাছ তলার মোমবাতি, ধূপধূনা প্রদীপ ইত্যাদি জ্বালিয়ে পূজা করে থাকে। বট গাছ তলায় সন্ধ্যা সময় পূজা এবং ধূপ, বাতি ইত্যাদি দিয়ে পূজা করলে সংসারে আর্থিক উন্নতি এবং সুখশান্তি বৃদ্ধি পায়। এমন ধারণা গারোদের মধ্যে বিদ্যমান।

জুমের বিনি ধান ঘরে তোলার পর গারোরা ওয়ানগালা উৎসব করে। এই উৎসবের সময় সমবেত ভাবে নাচ গান করে। বাড়ি ঘরে চাউলের গুঁড়ো দিয়ে নক্সা তৈরি করে। শরীরের মধ্যেও টিকটিকির ফ্যাসানে নক্সা করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে নাচ গানের মাধ্যমে আনন্দ উল্লাস করে।

অন্যদিকে গোয়েরা হল গারোদের সাহস এবং শক্তির ঠাকুর। গারোদের ধারণা বজ্রবিদ্যুৎ গোয়েরা ঠাকুরের অস্ত্রের ঝঙ্কার। গোয়েরা ঠাকুরকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য সামর্থ্য অনুযায়ী একটি শূকর, একটি মোরগ অথবা একটি হাঁস উৎসর্গ করে পূজা দেওয়া হয়। আবার গারোদের হিতৈষী দেবদেবীর মধ্যে বাগওবা, পোশ্চিম, ছুরাবাদি এবং খারামি উল্লেখযোগ্য। গারোদের বিশ্বাস বাগওবা দেবী তাদের মায়ের মত, সমস্ত ঈর্ষাপরায়ণ দেবদেবী এবং দুষ্ট আত্মার হাত থেকে রক্ষা করে রাখে। বাগওবা দেবী জুম ফসল ও বিভিন্ন কৃষি শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করে থাকে। অন্যদিকে ছুরাবাদি ঠাকুরকে গারোরা ফসলের ঠাকুর হিসাবে মান্য করে। গারো উপজাতি কোন প্রকার ফল গাছ থেকে প্রথম ফসল তোলার পর ছুরাবাদি ঠাকুরকে উৎসর্গ না করে গ্রহণ করে না।

ত্রিপুরারাজ্যে বসবাসকারী গারো উপজাতিরা প্রধানত কৃষিনির্ভর। মহিলারা কৃষিকাজে প্রধান ভূমিকা পালন করে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের গারো উপজাতি পরিবারগুলির

মধ্যে এখনও জুম চাষ মুখ্যজীবিকা। যারা সমতলে বসবাস করে স্থায়ীভাবে চাষবাসে অভ্যস্ত তাদের মধ্যেও জুম চাষের চিরাচরিত পদ্ধতির অনুসরণ পরিলক্ষিত হয়।

ত্রিপুরারাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী গারো উপজাতি সম্প্রদায় এক স্থানে দীর্ঘদিন বসবাস করে না। পুরাতন জুমিয়া পাড়ার আশপাশে জুম জমির জুমচক্র কমে গেলে ফলন নিম্নমুখী হতে শুরু করে। তখন গারোরা নতুন জুমের জমির খোঁজে কয়েকজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করে বিভিন্ন স্থানে পাঠায়। জুমের জমির সংবাদদাতা দল ঘুরে এসে কোন এলাকায় ভাল জুমের জমির সন্ধান দিলে, গারোরা বর্তমান বাড়িঘরের কথা অথবা ভবিষ্যৎ এর কথা চিন্তা না করে পাড়ার সকলে গোপনে পাড়া ছেড়ে নতুন স্থানে চলে যায় এবং নতুন ভাবে বাড়িঘর তৈরি করে জুম চাষ শুরু করে।

গারো উপজাতিদের জুম চাষের হাতিয়ারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল লৌহ নির্মিত তাক্কাল "আত্তি পয়াক" এবং বাঁশের তৈরি বিশেষ ধরনের খাঁচা "কোক"। তাক্কাল জুম চাষের প্রধান হাতিয়ার, যাহা বনজঙ্গল পরিষ্কার, বড় গাছের ডালপালা ছেঁটে দেওয়া, আগাছা নিয়ন্ত্রণ, ঘরবাড়ি তৈরি করা, বন্য জন্তু তাড়ানো ইত্যাদি বহুল কাজে ব্যবহৃত হয়। বাঁশের খাঁচা বা "কোক" জুমের জিনিষপত্র পরিবহণের' জন্য ব্যবহার করা হয়। এছাড়া খন্তা বা "কুনটা" নামক হাতিয়ার জুমে বীজ বপনের সময় মাটিতে গর্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। আবার ফসল তোলার পর ঝাড়াই করার জন্য বাঁশের তৈরি ডালা, কুলা এবং বীজ সংগ্রহের জন্য বাঁশের তৈরি ঝুড়ি "মাছেক", রোদে ধান শুকানোর জন্য বাঁশের চাঁটাই "আমধাড়ি", ধান ভেঙ্গে চাউল তৈরির জন্য গাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি বড়সড় হামান "সুয়ানচি চাম" এবং দন্তাকৃতি গাছের দিস্তা "র‍্যমাল" ইত্যাদি ব্যবহার করে।

গারো সম্প্রদায়ের জুম চাষ পদ্ধতিতে কতকগুলি ধাপে পর পর কার্য্য সম্পাদন করা হয়। যেমন—

১। জুম চাষের জন্য স্থান নির্বাচন।
২। নির্বাচিত স্থানের জঙ্গল, ঝোপঝাড়, গাছপালা কাটা।
৩। কাটা বন জঙ্গল ইত্যাদি শুকনোর জন্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়া।
৪। শুকনো বন জঙ্গল পোড়ানো।
৫। পোড়ানোর পর ভস্মীভূত হয় না এমন জঞ্জাল প্লট থেকে অপসারণ করা।
৬। বীজ বপন করা।
৭। আগাছা নিয়ন্ত্রণ।
৮। জুম ফসল পাহারা দেওয়ার জন্য পর্যবেক্ষণ ঘর তৈরি করা, বেড়া দেওয়া।
৯। ফসল তোলা।
১০। ফসল মাড়াই, ঝাড়াই, গোলাজাতকরণ, বাজারজাতকরণ ইত্যাদি।

ত্রিপুরারাজ্যে বসবাসকারী গারো উপজাতি সম্প্রদায় জুম চাষের জন্য স্থান নির্বাচন পর্ব অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করে থাকে। জুমের জমি নির্বাচনের সময় বাঁশ বন

প্রাধান্য পায়। কারণ শুকনো বাঁশের পাতা ও কাণ্ড তাড়াতাড়ি শুকায়, পোড়ানো সহজ এবং ছাই উত্তম সার হিসাবে পরিগণিত হয়। এছড়া নির্বাচিত স্থানের পাহাড়ের ঢালু এবং বসতবাড়ি থেকে দূরত্ব ইত্যাদি বিষয়গুলি ও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়।

জুমের জমির প্রাথমিক নির্বাচন পর্ব শেষ হলে পুরোহিত (কামাল) পূজা দেয় এবং ঐ স্থানের সম্ভাব্য উৎপাদন সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণী করে অথবা ঐ স্থানে কোনো প্রকার দুষ্ট প্রেতাত্মার আনাগোনা আছে কিনা জানিয়ে দেয়। এই পূজার সময় পাঁচটি বাঁশের খুঁটি চক্রাকারে পোঁতা হয়। এই খুঁটিগুলি জুমের পাঁচটি দেবদেবী যেমন (১) পোশ্চিম (২) বাগোবা (৩) সালজোঙ্গ (৪) জোগু (৫) ছুরাবাদির প্রতীক হিসাবে গণ্য করা হয়। জুমের জমিতে পূজার সময় গারোদের পাঁচ ঠাকুরকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে ৫টি মোরগ উৎসর্গ করার রেওয়াজ বিদ্যমান। গারো উপজাতিদের ধারণা বাগোবা ঠাকুর সন্তুষ্ট হলে জুম ফসল রক্ষা পায়। এছাড়া গারো সম্প্রদায় যে কোনো ফল তোলার পর প্রথমে ছুরাবাদি ঠাকুরকে উৎসর্গ না করে নিজেরা খায় না।

জুম চাষের জন্য বন জঙ্গল কাটার কাজ অগ্রহায়ণ মাস থেকে শুরু করে মাঘ মাস পর্যন্ত চলে। জুম চাষের জমির বন জঙ্গল কাটার কাজে পরিবারের সকলে অংশগ্রহণ করে। তবে পুরুষেরা সক্রিয় ভূমিকা নেয়, মহিলা এবং ছোট ছেলেমেয়েরা সাহায্য করে। জুমের জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করার কাজ ১০-১৫ দিনের মধ্যে শেষ করা হয়। তারপর কাঁটা বাঁশ, ছন, ঝোপঝাড়, বড় গাছের ডালপালা ইত্যাদি ভালভাবে শুকানোর জন্য ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

ফাল্গুন-চৈত্র মাসে প্রাক মৌসুমী বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগে কাটা বন জঙ্গল উত্তমরূপে শুকিয়ে গেলে আগুন দিয়ে পোড়ানো হয়। জুমে আগুন বুধবার ব্যতীত সপ্তাহের যে কোনো দিন দেওয়া হয়। জুমের বন জঙ্গল যত ভাল ভাবে পুড়বে এবং ছাই যত বেশি হবে তত ফলন ভাল হবে, এমন ধারণা গারো উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যমান। তাই প্রয়োজন বোধে পরিত্যক্ত আবর্জনা স্থানে স্থানে পুড়িয়ে অধিক পরিমাণ ছাই জুমের জমিতে ধরে রাখার জন্য সচেষ্ট হয়।

জুম পোড়ানোর পর প্রথম প্রাক মৌসুমী বৃষ্টির সুযোগ নিয়ে চৈত্র-বৈশাখ মাসে বীজ বপনের কাজ করা হয়। জুমচাষের জন্য তৈরি করা সমস্ত চড়াই উতরাই জমিকে একটি প্লট হিসাবে গণ্য করা হয়। জুমের সমস্ত ফসলের বীজ যেমন ধান, লংকা, কুমড়ো, বেগুন, মেস্তা, তুলো, তিল ইত্যাদির বীজ এক সঙ্গে মিশিয়ে খুন্তির সাহায্যে ছোট ছোট গর্ত করে, ৩-৪ সে.মি. গভীরে পর পর বপন করা হয়। জুমের সমস্ত বীজ মিশ্রিত করে একটি ছোট বাঁশের খাঁচা (মাছেক) বীজ বপনকারীর কোমরের বাম পাশে বেঁধে রাখা হয়। প্রতি গর্তে ৩-৪ টি বীজ বপন করে পায়ের সাহায্যে মাটি চাপা দেওয়া হয়। জুমচাষ সম্পূর্ণ বৃষ্টি নির্ভর। বীজ বপনের পর প্রাক মৌসুমী বৃষ্টি এবং মৌসুমী বৃষ্টিপাত শুরু হয়। এই সময়ে আগাছার বৃদ্ধিও দ্রুত হয়। জুম ফসলে বুনো ঘাস, বাঁশ, বিভিন্ন

ধরনের লতা, ছন ইত্যাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে জন্মায়। তাই জুম ফসলের সুষ্ঠু বৃদ্ধি এবং উত্তম ফলনের জন্য কমপক্ষে তিন বার আগাছা বাছাই গারো উপজাতি জুমিয়ারা করে থাকে। গারোরা ত্রিপুরারাজ্যে জ্যৈষ্ঠে, আষাঢ় এবং শ্রাবণ মাসে তিন বার জুমের আগাছা বাড়ির সকলে মিলেমিশে বাছাই করে থাকে।

ত্রিপুরারাজ্যের অন্যান্য উপজাতি জুমিয়াদের ন্যায় গারো উপজাতিরা জুম ফসল রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে জুম জমির মধ্যে একটি পর্যবেক্ষণ ঘর (বুরাঙ্গ নোক) তৈরি করে জুম পাহারার ব্যবস্থা করে থাকে। জুমের পর্যবেক্ষণ ঘর সাধারণত উচু বাঁশের মাচার ওপর তৈরি করা হয়। ঐ ঘর থেকে বুনো শূকর, হাতি, বানর, পাখি ইত্যাদি তাড়ায়। জুম রক্ষক বাঁশের টুকরো লম্বালম্বি আধফালি করে এক ধরণের হাতিয়ারের সাহায্যে বিকট শব্দ করে বন্যজন্তু ও পাখি তাড়ায়। এছাড়া বন্যজন্তুর উৎপাত বেশি হলে ফাঁদ পেতে সেগুলিকে ধরে। বুনো শূকর দলবদ্ধ ভাবে নির্দিষ্ট রাস্তা ধরে জুম ফসলে আসে এবং ফসলের ক্ষতিসাধন করে। বাচ্চা বুনো শুয়োর ধরার জন্য গারোরা শূকর চলাচলের রাস্তার দুই পাশে শক্ত দুইটি বাঁশের খুঁটি খাড়া ভাবে পুঁতে দেয়। তারপর আর একটি শক্ত বাঁশের খুঁটি আড়াআড়ি ভাবে মাটি থেকে প্রায় ৩০ সে.মি. উচ্চতায় শক্তভাবে খাড়া খুঁটি দুটির সঙ্গে বেঁধে দেয়। এখন শক্ত তারের ফাঁদ তৈরি করে ১৫-২০ সে.মি. পর পর ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। যখন বাচ্চা শূকর এই ফাঁদের মধ্য দিয়ে আসা যাওয়ার চেষ্টা করে তখন আটকা পড়ে।

ধাড়ি বুনো শূকর ধরার জন্য জুমের রাস্তার দুপাশে শক্ত দুটি বাঁশের খুঁটি পোতা হয়, এই খুঁটি দুইটির সঙ্গে আড়াআড়ি আর একটি বাঁশ ব্যবহার করা হয়। রাস্তা থেকে ১৫ ফুট দূরে অন্য একটি শক্ত লম্বা বাঁশ প্রায় ৬ ফুট গভীরে পোতা হয়। এখন লম্বা বাঁশের শেষ প্রান্তটি টেনে মাটির প্রায় ৩০ সে.মি. উচ্চতায় আড়াআড়ি রাখা বাঁশের সঙ্গে যুক্ত করা হয় এবং একটি শক্ত দড়ির ফাঁস বা ফাঁদ তৈরি করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। বাঁশের গোড়ায় মাটির ওপর কয়েকটি বাঁশের কুঞ্চি ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে রাখা হয়। শূকর যখন এই বাঁশের কুঞ্চির ওপর পা দেয় সঙ্গে সঙ্গে দড়ির ফাঁস ঘাড়ে আটকে যায় এবং বাঁশের মাথা ছুটে গিয়ে শূকরটি শূন্যে ঝুলতে থাকে।

সজারু ধরার জন্য গারো উপজাতি কলাগাছের কাণ্ড ছুঁড়ে মারে। সজারুর গায়ের কাঁটায় কলাগাছ সহজে বিঁধে যায় এবং আটকা পড়ে।

খরগোস ধরার জন্য গারো উপজাতি প্রথমে খরগোশের আস্তানার গর্তগুলি সনাক্ত করে। একটি গর্তের মুখে ফাঁদ পেতে, আস্তানার অন্য গর্তগুলির মুখ বন্ধ করে দেয়। তবে অন্য একটি গর্তের মুখে শুকনো খড় এবং লংকা পোড়া দিয়ে ঝাঁঝালো ধোয়ার সৃষ্টি করে গর্তের ভিতর পাঠায়। গর্তের মধ্যে ঝাঁঝালো ধোয়ার গন্ধ সহ্য করতে না পেরে খরগোশ বের হয়ে আসে এবং ফাঁদে আটকা পড়ে।

বনমোরগ ধরার জন্য একটি পোষা মোরগ ব্যবহার করা হয়। পোষা মোরগটি বেঁধে রেখে তার চার পাশে চক্রাকারে বেতের এবং সরু দড়ির ফাঁস বা ফাঁদ পাতা

হয়। পোষা মোরগটি উচ্চস্বরে ডাকতে থাকে তখন বন থেকে আশপাশের বনমোরগ গুলি বের হয়ে এসে পোষা মোরগের সঙ্গে ঝগড়া ও যুদ্ধ শুরু করে এবং সহজে ফাঁদে পা আটকে ধরা পড়ে।

জুমের ফসল তোলার কাজ অন্যান্য ফসলের ন্যায় এক বারে শেষ হয় না কারণ জুম চাষে মিশ্র ফসলের চাষ করা হয়। ফসলগুলি বিভিন্ন সময়ে ক্রমাগত পরিপক্ব হয় এবং ফসল তোলার কাজ চলে আষাঢ় মাস থেকে কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ত। ক্ষেত্রবিশেষ পরবর্তী বছরেও কিছু কিছু ফসল তোলা হয় যেমন লংকা, কন্দজাতীয় সবজি ইত্যাদি। ফসল তোলার সময় গারো উপজাতি জুমিয়া সকাল বেলা ভাত, তরকারি (গোদক), জলের পাত্র এবং উৎপাদিত ফসল ইত্যাদি বহন করার জন্য বাঁশের খাঁচা মাথায় এবং পিঠে ঝুলিয়ে জুমে যায়। জুমের ফসল তোলার কাজ (মিয়াকা) পুরুষ মহিলা সকলে মিলেমিশে করে। ধান ফসলের শুধুমাত্র ছড়া কেটে সংগ্রহ করা হয়, খড় জমিতে পড়ে থাকে। সংগৃহীত ধানের ছড়াগুলি পায়ের সাহায্যে অথবা বাঁশের, কাঠের উপর পিটিয়ে ধান মাড়াই (মিনাকা) করে।

জুম ধান মাড়াইয়ের পর ঝাড়াই, বাছাই এর কাজ সাধারণত বাঁশের তৈরি গোলাকার চালুনি, ডালা এবং লম্বাটে কুলোর (রুয়ান) সাহায্যে মহিলারা সম্পাদন করে। এই কাজের জন্য জোড় হাওয়ার সময় ডালা অথবা কুলোর সাহায্যে জঞ্জাল সহ মাড়াইকৃত ধান উপর থেকে ধীরে ধীরে মাটিতে ফেলা হয়। বাতাসের বেগে হালকা জঞ্জাল, ভূষি ইত্যাদি উড়ে পুষ্ট ধান থেকে আলাদা হয়ে আসে। ঝাড়াই এর কাজ শেষ হলে ধানগুলি বাঁশের তৈরির চাটাই (আমধাড়ি) এর ওপর রোদে শুকানো হয়। শুকনো ধান কাঠের তৈরি বড় হামানদিস্তার মধ্যে রেখে কাঠের বড় দণ্ডাকৃতি উখার সাহায্যে চাউল ছাঁটাই করা হয়। সমতল অঞ্চলে বসবাসকারী গারো উপজাতিদের কে চাউল ছাঁটাই এর কাজ ঢেঁকির সাহায্যে করতে দেখা যায়। ধান থেকে চাউল ছাঁটাই এর কাজ ও গারো রমণীরা সম্পাদন করে।

জুম ফসল ঘরে তোলার পর গারোদের পুরোহিত (কামাল) ভাদ্র মাসে প্রতি বাড়িতে রোঁছুগলা পূজা করে। এই পূজার সময় একটি লাল রঙের মোরগ উৎসর্গ করা হয়।

ত্রিপুরারাজ্যে বসবাসকারী গারো উপজাতি বর্তমানে স্থায়ী চাষপদ্ধতিতে আকৃষ্ট হয়ে জুম চাষকে বিকল্প চাষ পদ্ধতি হিসাবে ব্যবহার করতে দেখা যায়। ১৯৮৭ সনের হিসাব অনুযায়ী ত্রিপুরারাজ্যে ১১৮ পরিবার গোঁড়াজুমিয়া এবং ৪০ পরিবার আংশিক গারো জুমিয়া পরিবারের লোকসংখ্যা ছিল ২৬৬১ জন। অন্যদিকে গারো জুমিয়া জনসংখ্যা লক্ষ্য করলে দেখা যায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় বসবাসকারী গারোদের মধ্যে কোনো জুমিয়া পরিবার নেই। গারো উপজাতি জুমিয়া জনসংখ্যার ১৫৫১ জন উত্তর ত্রিপুরা জেলায় এবং ১১১০ জন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় বসবাস করত।

ত্রিপুরারাজ্যে বসবাসকারী বেশির ভাগ গারো উপজাতি নীচু সমতল অঞ্চলে স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করেছে এবং প্রধানত কৃষি নির্ভর জীবন জীবিকার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত

হচ্ছে। আজকাল সমতলে বসবাসকারী গারো উপজাতি বছরে তিন ফসল যেমন আউস, আমন এবং বোরো ধানের চাষ শুরু করেছে। বর্তমানে উন্নত চাষ প্রযুক্তি পাওয়ার টিলার, উন্নত মানের উচ্চ ফলনশীল বীজ, হাইব্রিড বীজ, সার, ফসলের রোগ-পোকার ওষধ, নিড়ানি যন্ত্র, স্প্রেয়ার, ডাস্টার, ধান মাড়াই যন্ত্র ইত্যাদির ব্যবহার ও অল্প সংখ্যক গারো কৃষক ভাই শুরু করেছে। তবে চিরাচরিত জুম চাষ ব্যতীত বলদ দিয়ে লাঙ্গল, মই ব্যবহার করে জমি তৈরি, রাসায়নিক সার ব্যবহার না করে গোবর/কম্পোস্ট সার ব্যবহার, পুরানো আমলের কৃষি যন্ত্রপাতি কোদাল, কাঁচি, দা ইত্যাদির দ্বারা চাষ পদ্ধতি এখন ও বেশির ভাগ সমতলবাসী গারোদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

গারো মহিলারা কৃষিকাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কৃষিকাজ ব্যতীত গারোদের মধ্যে অন্য যে সকল পেশা পরিলক্ষিত হয় তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পশুপালন, কাঁঠ মিস্ত্রী, ব্যবসা, উদ্যান ও বাগিচা ফসল চাষ এবং বনসৃজন, উপরোক্ত আলোচনা থেকে এই টুকু ধারণা করা যায় গারোদের মধ্যে বেশির ভাগ জনসংখ্যা সমতলে চাষবাসে অভ্যস্ত এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে অল্পসংখ্যক গোঁড়া জুমিয়া অর্থাৎ সম্পূর্ণ ভাবে জুম চাষের উপর নির্ভরশীল।

স্থায়ী চাষ আবাদে অভ্যস্ত এমন গারো সম্প্রদায়ের মধ্যে জমিচাষে ব্যবহৃত মজুরির বিভিন্ন পদ্ধতি যেমন (১) ভাগী (২) ভাগা এবং (৩) পাইকাস বিদ্যমান। অনেক গারো অধ্যুষিত গ্রামে দেখা যায় ভাগী পদ্ধতিতে চাষী এক বছর মালিকের জমি চাষ-বাস করে উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক ভাগ মালিককে দেয় এবং বাকি অর্ধেক নিজে ভোগ করে। কিন্তু ভাগা পদ্ধতিতে জমির মালিক জমি এবং বীজ চাষীকে দেয় এবং এক বছরের উৎপাদিত ফসল এবং ধানের খড় সমান ভাগে ভাগ করে চাষী এবং মালিক নেয়। পাইকাস বা লাগিদ পদ্ধতিতে জমির মালিক নির্দিষ্ট অংকের টাকা চাষীর কাছ থেকে অগ্রিম গ্রহণ করে এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যেমন এক বছর অথবা দুই বছর জমি চাষী চাষ করে সম্পূর্ণ উৎপাদিত ফসল চাষী ভোগ করে। চুক্তিবদ্ধ নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হলে জমির মালিক পুনরায় ঐ জমির উপর সম্পূর্ণ মালিকানা স্বার্থ ফেরত পায়।

এছাড়া গারো সমাজে দেখা যায় রেন পদ্ধতিতে জমির মালিক জমি বন্ধক দিয়ে সুদে টাকা নেয়। সুদখোর ঐ জমিতে চাষবাস করে এবং উৎপাদিত ফসল ভোগ করে। যদি জমির মালিক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সুদে আসলে টাকা ফেরত দিতে অসমর্থ হয় তখন সেই জমির মালিকানা সুদখোরের হয়ে যায়।

গারো উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে কৃষিশ্রমিক নিযুক্তির বিভিন্ন পদ্ধতি বিদ্যমান যেমন "নোক্কোল" অথবা "চোয়াকুয়াল"। এই পদ্ধতিতে পুরুষ কৃষি শ্রমিক এক বছর চুক্তিতে নিযুক্ত হয় এবং কৃষিকাজের যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করে। চুক্তিমতে সাধারণত এক বছর সময়ে কৃষি শ্রমিক মালিকের বাড়িতে অবস্থান করে স্বাভাবিক ভাত, কাপড়, থাকার

আস্তানা এবং চুক্তিবদ্ধ টাকা এক বছরের শ্রমের বিনিময়ে পায়। তবে শ্রমিক যদি নির্দিষ্ট সময়ের আগে কাজ ছেড়ে চলে যায় তবে পরিশ্রমের টাকা থেকে বঞ্চিত হয়। এছাড়া মাসিক, সাপ্তাহিক এবং দৈনিক হাজিরার ভিত্তিতেও কৃষি শ্রমিক নিযুক্তির পদ্ধতি বিদ্যমান। তবে এই ক্ষেত্রে কৃষিশ্রমিক মালিককে অগ্রিম জানিয়ে যে কোনো সময় কাজ ছেড়ে দিতে পারে এবং হাজিরার দিন হিসাব করে টাকা পেয়ে যায়। অন্যদিকে কৃষিকাজে শ্রম বিনিময় পদ্ধতি বা "বারা ছোট্টা" গারো সমাজে বিদ্যমান। এই পদ্ধতিতে এক পরিবারের লোকজন প্রয়োজনে অন্য পরিবারের চাষ বাসে শ্রম আদান প্রদান করে। বিশেষ করে জুমিয়া পরিবারগুলিতে বিশেষ সময়ে যেমন জুমের বন জঙ্গল কাটা, বীজ বপন, আগাছা নিয়ন্ত্রণ, ফসল তোলা ইত্যাদি কাজে এক জুমিয়া পরিবার অন্য পরিবারের সঙ্গে শ্রম বিনিময় করে। এই ধরনের শ্রম বিনিময়ে কোনো প্রকার পারিশ্রমিক দেওয়া হয় না। এই পদ্ধতিকে সহযোগিতা বলা চলে।

গৃহপালিত পশুপাখি লালন পালনের শ্রমের ভাগ-বাটোয়ারাকে গারোরা বলে "বাগাজিল্লা"। এই পদ্ধতিতে গরু, ছাগল, শূকর, হাঁস, মুরগী ইত্যাদির বাচ্চা দুই বছরের জন্য মালিক অন্যব্যক্তিকে প্রদান করে। ঐ ব্যক্তি দুই বছর লালন-পালনের পর গরুর দুধ এক বছর ভোগ করবে এবং পরে বাছুরটি রেখে মালিককে গাভীটি ফেরত দিবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে একের অধিক বাচ্চা হলে মালিক এবং পালক সমান দুই ভাগে ভাগ করে বাচ্চাগুলি পাবে কিন্তু বাচ্চার মা মালিক একক ভাবে পাবে।

সমতলে বসবাসকারী গারো উপজাতিদের মধ্যে হালের বলদ ভাড়া দেওয়ার পদ্ধতি বিদ্যমান তাকে বলে "কেরায়া"। এই পদ্ধতিতে হালের বলদের মালিক নির্দিষ্টকৃত টাকার অথবা ধানের বিনিময়ে চাষ আবাদের জন্য নির্দিষ্ট কৃষি মরসুমের জন্য বলদ ভাড়া দেয়। চুক্তি বদ্ধ কৃষি মরসুমের চাষবাসের কাজে ঐ বলদের শ্রম ব্যবহার করার পর মালিককে বলদটি ফেরত দেওয়া হয়।

ত্রিপুরারাজ্যে গারো উপজাতি বসবাস করে এমন গ্রামগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার প্রীতিলতা, ঝরঝড়িয়া, মিশনটিলা, মধুবন, নন্দননগর, মহিষমারা, ধূপছড়া, কাঞ্চনমালা, বড়ডেপা, সিপাহীজলা ইত্যাদি। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার হোলাক্ষেত, বটতলা, কালাবন, পেরাতিয়া, লক্ষ্মীছড়া, কাঁঠালিয়াছড়া, ধলাই জেলার কমলাছড়া এবং উত্তর ত্রিপুরায় জেলার করাতিছড়া ও কাঁঠালছড়া ইত্যাদি। আজকাল গারো অধ্যুষিত গ্রামগুলির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় বেশির ভাগ গারো উপজাতি বর্তমানে সমতল চাষবাসে অভ্যস্ত। তাদের চিরাচরিত জুম চাষ আজ প্রায় বিলুপ্তির পথে। ফলে ত্রিপুরা বসবাসকারী গারো উপজাতিদের সামাজিক রীতিনীতি ও জুমচাষ পদ্ধতির বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে এক কালের হিন্দুধর্মাবলম্বী ত্রিপুরার গারো সম্প্রদায় ব্যাপক ভাবে খিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হচ্ছে, তাদের চিরাচরিত পূজাপার্বণও আজ বিলুপ্তির পথে।

ভাত গারোদের প্রধান খাদ্য। বর্তমানে ধান প্রধান খাদ্যশস্য হিসাবে আউস, আমন এবং বরো মরসুমে চাষ করে। সমতলে বসবাসকারী অনেক গারো কৃষি পরিবার ধান ব্যতীত আলু, পাট, মেস্তা, সরিষা এবং বিভিন্ন ধরণের শাক-সব্জী চাষেও বর্তমানে পারদর্শী। বর্তমানে গারোগণ ফল ও বিভিন্ন বাগিচা ফসল চাষেও উৎসাহ দেখাচ্ছে। আম, কাঁঠাল, আনারস, পেঁপে, কলা, নারিকেল, সুপারি, গাছপান ইত্যাদি নানা ধরণের গাছ বসতবাড়ির আশপাশে চাষ করে থাকে।

কৃষিকাজ ব্যতীত গারো গন গবাদিপশু পালনের মাধ্যমে বাড়তি আয় করে থাকে। অনেক গারো পরিবার গরুর দুধ, হাঁস মুরগীর ডিম ইত্যাদি বিক্রি করে সংসারের খরচ চালায়। মিনি ব্যারেজ, পুকুর ইত্যাদি খনন করে গারো পরিবারগুলি আজকাল মৎস্যচাষেও বেশ উৎসাহ দেখাচ্ছে।

ত্রিপুরার আধুনিক গারো উপজাতি জনসংখ্যার একটি ভাল অংশ সরকারি চাকুরি, মিলিটারি, পাটকল, কেন্দ্রীয় সুরক্ষা বল, ত্রিপুরা পুলিশ এবং সীমা সুরক্ষা বল ইত্যাদিতে কর্মরত আছে।

এতৎসত্ত্বেও ত্রিপুরায় বসবাসকারী গারো উপজাতিদের অর্থনৈতিক অবস্থা মজবুত নয়। কারণ, অনেক গারো উপজাতি পরিবার এখনও অন্যের কৃষি জমিতে মজুরির কাজ করে, অনেকে বন থেকে বাঁশ, ছন, লাকড়ি ইত্যাদি সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতে দেখা যায়।

ত্রিপুরার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী গারো উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় হল তারা জুম চাষ এবং সরকারি অনুদানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। সরকারি অনুদানের অর্থ পেলে আগামী দিনের কথা চিন্তা না করে খরচ শুরু করে। এমন কি, যতক্ষণ নগদ টাকা শেষ হয় ততক্ষণ কাজ কর্ম বন্ধ করে দেয় ফলে তাদের পক্ষে ভবিষ্যৎ এর জন্য টাকা সঞ্চয় করা সম্ভব হয় না। ত্রিপুরায় বসবাসকারী গারো উপজাতিরা বছরে প্রধানত দুই সময়ে অর্থাৎ চৈত্রমাসে এবং আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে অধিক অভাবে পড়ে। তাদের অভাবের প্রধান কারণগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মদ্যপান, রোগ-শোকে অপব্যয়, বিবাহ পদ্ধতি, সম্পত্তির মালিকানা, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদাসীনতা এবং মহাজনদের ঋণের বোঝা ইত্যাদি।

❒ অষ্টম অধ্যায়

নোয়াতিয়া

ত্রিপুরারাজ্যে ১৯৫১ সনের হিসাব অনুযায়ী মোট ১৮টি উপজাতি জনগোষ্ঠীর পরিসংখ্যান পাওয়া যায় কিন্তু পরবর্তী সময়ে ১৯৫৬ সনে উপজাতি ও তফসিল জাতি জনগোষ্ঠীর সংশোধনী অনুসূচী অনুযায়ী ১৯৬১ সনে দেখা যায় ত্রিপুরারাজ্যে ১৯টি উপজাতি সম্প্রদায় বিদ্যমান, সেগুলি হল (১) ত্রিপুরী (২) রিয়াং (৩) জমাতিয়া (৪) নোয়াতিয়া (৫) লুসাই (৬) মগ (৭) কুকি (৮) চাকমা (৯) গারো (১০) হালাম (১১) চাইমল (১২) খাসী (১৩) ভুটিয়া (১৪) মুণ্ডা (১৫) ওরাং (১৬) ভিল (১৭) উচই (১৮) সাঁওতাল (১৯) লেপছা।

ত্রিপুরারাজ্যের ১৯৩১ সনের জনগণনা অনুসারে পুরাতন ত্রিপুরী, দেশী ত্রিপুরী, জমাতিয়া, রিয়াং এবং নোয়াতিয়া জনগোষ্ঠীগুলিকে এক সঙ্গে "ত্রিপুর ক্ষত্রিয়" হিসাবে দেখানো হয়। কিন্তু ১৯৪১ সনের জনগণনা অনুযায়ী দেখা যায় ত্রিপুর ক্ষত্রিয়ের সংখ্যা কম। এর প্রধান কারণ জনগণনার সময় অনেক উপজাতি জনগোষ্ঠী ১৯৪১ সনে ত্রিপুর ক্ষত্রিয় হিসাবে পরিচয় দেয় নাই। অন্যদিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ১৯৭১ সনের জনগণনা অনুসারে নোয়াতিয়া সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা ত্রিপুরার মোট ১৯টি উপজাতি সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার তুলনায় সপ্তম স্থানে। ১৯৬১ সনের জনগণনা পরিসংখ্যানের তুলনায় ১৯৭১ সনে প্রায় ৩৫·৬৮% নোয়াতিয়া উপজাতি সম্প্রদায়ের এক অংশকে ভুলে ত্রিপুরী উপজাতি জনসংখ্যার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে অথবা নোয়াতিয়া উপজাতি সম্প্রদায়ের জন্মের হারের চেয়ে মৃত্যুর হার বেশি অথবা নোয়াতিয়া উপজাতি সম্প্রদায় নতুন জুমের জমির খোঁজে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে অন্যত্র সরে গেছে। প্রাচীন ত্রিপুরার ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় মহারাজা ধর্মমাণিক্য ১৫১২ সালে আরাকান জয় করেন এবং ঐ সময়ে কিছু ত্রিপুরী সৈন্য আরাকানে বসতি স্থাপন করে। তারপর মহারাজা বিজয়মাণিক্য (১৫২৯-১৫৬৫) পার্বত্য চট্টগ্রাম জয় করেন। পরবর্তী সময়ে মোগলরা যখন সমতল অঞ্চল দখল করে নেন, তখন অনেক ত্রিপুরী উপজাতি পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং আরাকান থেকে ত্রিপুরায় ফিরে না এসে ঐ স্থানের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যায় বিশেষ করে "নাইটং" অঞ্চলে, তারপর ঐ অঞ্চলের ত্রিপুরার উপজাতির সঙ্গে বর্ম্মাবাসীদের বিবাহ বন্ধন শুরু হয় এবং বার্মিজ পদবী যেমন নাইটং, মোঁঙ্গবাই, ঢোঁহবাই এবং খাকলু ইত্যাদি তাদের নামের সঙ্গে ব্যবহার করতে শুরু করে। অন্যদিকে ঐ সময়ে আরাকান এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা এবং মগদের প্রাধান্য ছিল। ফলে ঐ অঞ্চলের ত্রিপুরী উপজাতিরা বর্ম্মী, মগ এবং চাকমাদের সাথে মিলেমিশে নতুন ত্রিপুরী উপজাতি জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি করে। দীর্ঘদিন পর যখন এই নূতন ত্রিপুরী উপজাতি জনগোষ্ঠী স্বদেশে ফিরে আসে তখন তাদের সামাজিক রীতিনীতির মধ্যে নূতনত্ব পরিলক্ষিত হয়। এই নূতন উপজাতি জনগোষ্ঠী

দক্ষিণ ত্রিপুরায় প্রথম বসতি স্থাপন করে এবং পাহাড়ি ত্রিপুরীদের সঙ্গে মিশতে শুরু করে। কিন্তু পাহাড়ি ত্রিপুরীর সামাজিক রীতিনীতির সঙ্গে তাদের অনেক তারতম্য পরিলক্ষিত হয়।

এই নবাগত জনগোষ্ঠীকে "নোয়াতিয়া" অথবা "কাতাল" উপজাতি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। ককবরক ভাষায় "কাতাল" শব্দের অর্থ "নূতন"। দক্ষিণ ত্রিপুরার চলতি বাংলা ভাষায়ও "নূতন" কে "নোয়াত্যা" বলা হয়। এই কারণে ধারণা করা হয় নোয়াতিয়া উপজাতি সম্প্রদায় মিশ্র উপজাতি সম্প্রদায় যার মধ্যে ত্রিপুরী, বর্ম্মী, চাকমা এবং মগ সম্প্রদায়ের সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়। ত্রিপুরায় নোয়াতিয়াদের জনসংখ্যার মধ্যে দেখা যায় ১৯৭১ সনের হিসাব মতে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার খোয়াই মহকুমার ১৯৯৪ জন এবং সোনামুড়া মহকুমায় ১৭৮৪ জন, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার উদয়পুর মহকুমায় ১৮৮৯ জন, অমরপুর মহকুমায় ২৩১৪ জন এবং বিলোনীয়া মহকুমায় ৯২৫ জন, বর্তমান ধলাই জেলার কমলপুর মহকুমায় ১২৮৮ জন বসবাস করতো। ১৯৮৭ সনের জুমিয়া উপজাতি পরিসংখ্যানে দেখা যায় ত্রিপুরারাজ্যে নোয়াতিয়া জুমিয়া পরিবারের সংখ্যা ১০০৯৭, এদের মধ্যে ৩৬৮১ পরিবার গোঁড়া জুমিয়া এবং ৬৪১৬ পরিবার আংশিক জুমিয়া, মোট নোয়াতিয়া জুমিয়া জনসংখ্যা ৫০১৬০ জন।

অন্যদিকে ত্রিপুরারাজ্যের উপজাতি পরিসংখ্যান লক্ষ্য করলে দেখা যায় ১৯৫১ সন, ১৯৬১ সন, ১৯৭১ সন এবং ১৯৮১ সনে নোয়াতিয়া উপজাতি সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৪৯৯২ জন, ১৬০১০ জন, ১০২৯২ জন এবং ৭০৭৩ জন। নোয়াতিয়া উপজাতি জনসংখ্যার ক্রমে হ্রাস পাওয়ার কারণগুলি আগে আলোচনা করা হলেও বিভ্রান্তিকর পরিসংখ্যানও এর সঙ্গে যুক্ত করা সঙ্গত হবে। কারণ অনেক নোয়াতিয়া উপজাতি সম্প্রদায় তাদের পদবি নোয়াতিয়ার পরিবর্তে "ত্রিপুরা" ব্যবহার করে। পদবি পরিবর্তনের প্রবণতা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে ফলে অনেক নোয়াতিয়া উপজাতি গোষ্ঠী "ত্রিপুরী" উপজাতি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে পরিসংখ্যানে দেখানো হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন সাব্রুম এবং কৈলাশহর মহকুমায় যদিও যথাক্রমে প্রায় ২০০০ এবং ১৫০০ নোয়াতিয়া সম্প্রদায়ের বাস তথাপি ও ১৯৭১ সনের জনগণনা রিপোর্টে তাদের দেখানো হয় নি অথবা ভুলক্রমে "ত্রিপুরী" সম্প্রদায়ের সঙ্গে দেখানো হয়েছে।

ত্রিপুরারাজ্যে বসবাসকারী নোয়াতিয়া উপজাতি সম্প্রদায় মঙ্গোলিয়ান এবং তিব্বত বার্ম্মার বসবাসকারীদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। নোয়াতিয়া উপজাতির মাথা বড়, চোখ ছোট, নাক চ্যাপ্টা, মুখে এবং বুকে চুল কম। মুখমণ্ডল চ্যাপ্টা এবং ঠোঁট পুরু। গায়ের রঙ ফর্সা থেকে শ্যামলা। মহিলারা সাধারণত সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী, তবে পুরুষদের তুলনায় সামান্য বেঁটে হয়। নোয়াতিয়া মহিলারা কেশ বিন্যাস এবং সৌন্দর্য্য পরিচর্যা করতে পছন্দ করে। রূপার অলংকার এবং ফুল ব্যবহার করে সাজগোজ করে। কানে এবং চুলে ফুল ব্যবহার করে। বিবাহ উৎসবে নোয়াতিয়া রমণীরা বিভিন্ন

ধরণের অলংকার পরিধান করে। মহিলারা গলায়, হাতে, পায়ে এবং হাতের আঙ্গুলে অলংকার পড়ে।

নোয়াতিয়া উপজাতি সম্প্রদায় টিলার উপর ঘর বাড়ি তৈরি করে। সমতলে বসবাসকারী নোয়াতিয়া পরিবার আজকাল মাটির দেওয়ালের ঘর তৈরি করে থাকে। মাটির ঘরের ওপরের ছাউনি মুলি বাঁশের কাঠামোর ওপর ছন দিয়ে ঢেকে করে থাকে। কোনোকোনো বাড়িতে বাঁশের বেড়ার ঘর অথবা ছন বাঁশ বেঁধে বেড়া তৈরি করে তার ভিতর ও বাইরের দিক মাটি অথবা কাঁচা গোবরের প্রলেপ দিয়ে তৈরি করে। গৃহপালিত পশুপাখির জন্য নোয়াতিয়া সম্প্রদায়েরা আলাদা ঘর তৈরি করে থাকে।

প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী জুমিয়া নোয়াতিয়া পরিবারগুলি এখনও টংঘরে বসবাস করে। নোয়াতিয়াদের টংঘর ৭—৮ ফুটের মতো উঁচু মাচার ওপর তৈরি করা হয়। টংঘরগুলির উপর ছনের ছাউনি এবং দু চালা বিশিষ্ট হয়।

অনেকে নীচু টং ঘর ২-৩ ফুট উঁচু বাঁশের মাচার ওপরও তৈরি করে। মাচার উপর ঘরের উচ্চতা প্রায় ৯-১০ ফুট। টংঘরের এক-চতুর্থাংশ থেকে এক-তৃতীয়াংশ জায়গা খোলামেলা থাকে এবং বিভিন্ন জিনিসপত্র শুকানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। টংঘরের বাকি অংশ বাঁশের বেড়া দ্বারা ঢাকা থাকে। বেশির ভাগ টং ঘরে শুধু মাত্র একটি দরজা থাকে এবং জানলা থাকে না। টং ঘরের মাচার নীচে গৃহপালিত পশুপাখির আস্তানা হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

নোয়াতিয়া মহিলারা বুকে রিসা ও রিহা ব্যবহার করে। যা বক্ষাবরণীর কাজ করে এবং কোমরে জড়িয়ে কোমর তাঁতে তৈরি পাছড়া ব্যবহার করে। পুরুষেরা কোমরে জড়িয়ে হাঁটুর উপর পর্যন্ত গামছা অথবা কাপড় পরে। গায়ে গেঞ্জী অথবা শার্ট পরিধান করে।

ত্রিপুরারাজ্যে বসবাসকারী উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে গোষ্ঠী এবং বংশগুলি তাদের নেতা বা প্রধান বা বাসস্থান ইত্যাদির দ্বারা পরিচিতি লাভ করে। তবে কখনো কখনো দেখা যায় উপজাতিদের বাসস্থানের আশপাশের পাহাড়, নদী, ছড়া ইত্যাদির দ্বারাও বংশ বা গোষ্ঠী পরিচিত হয়, আবার এমনও দেখা যায় বৃক্ষ, জন্তুজানোয়ার, ফল, ফুল, উপজাতিদের দেবদেবী ইত্যাদির নাম থেকেও বংশ পরিচিতি লাভ করে থাকে। ত্রিপুরার নোয়াতিয়া উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে আরাকানের কিছু কিছু গোষ্ঠী, উপাধি, পদবী পরিলক্ষিত হয় যেমন নাইটং, গ্যাবাঙ, খাকলু, অ্যানাক, ফাটুং, মোঙ্গবাই, টেঙ্গ বাই, কেওয়া, খালভি, গাইগ্রা, হ্যারব্যাঙ, ড্যাইনডেক, কেয়াঙ ইত্যাদি। এছাড়া ত্রিপুরা মহারাজ দ্বারা ও নোয়াতিয়া উপজাতি সম্প্রদায় বিভিন্ন উপাধি, পদবি এবং গোষ্ঠী পরিচিতি লাভ করে। যেমন—মুড়াসিং, তোতারাম, আকলং, গর্জন ইত্যাদি।

নোয়াতিয়াদের প্রধান খাদ্য ভাত, শুকনো মাছ নোয়াতিয়াদের খুবই প্রিয়। এছাড়া

নোয়াতিয়া সম্প্রদায় মাছ এবং শাকসব্জী ইত্যাদিও খায়। বর্ষাকালে এবং অভাবের দিনে বাঁশের কচি চারা (বাঁশ করুল), বুনো আলু ইত্যাদি নোয়াতিয়ারা বিকল্প খাদ্য হিসাবে বহুল ব্যবহার করে। মুড়াসিং এবং তোতারাম গোষ্ঠীর নোয়াতিয়া পরিবারগুলি বৈষ্ণব ধর্ম পালন করে এবং মুরগী ও শূকরের মাংস খায় না।

পানীয়ের মধ্যে ভাত থেকে তৈরি চোলাই মদ নোয়াতিয়াদের খুবই প্রিয়। দেশীমদ তৈরির জন্য নোয়াতিয়ারা জুমে উৎপাদিত ধানের একটি ভাল অংশ ব্যয় করে। দুই ধরণের মদ "চুয়াক" অর্থাৎ পরিস্রুত দেশীমদ এবং "বুটুক" (লাঙ্গী) নোয়াতিয়া সম্প্রদায়ের উপজাতিরা তৈরি করে। লাঙ্গী তৈরির জন্য ২-৩ কিলোগ্রাম আতপ চাউল জলে সিদ্ধ করে কয়েক ঘণ্টা পরে গাঁজানোর জন্য "চুয়ান" মেশানো হয়। এই মিশ্রণ মাটির কলসির (লাঙ্গী) মধ্যে রেখে কলা পাতা দিয়ে কলসির মুখ ঢেকে রাখা হয়। তিন-চার দিন পর এই মিশ্রণ লাঙ্গী হিসাবে পান করার জন্য ব্যবহার করা হয়। লাঙ্গী বিভিন্ন সামাজিক এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বহুল ব্যবহৃত হয়।

নোয়াতিয়া সমাজে এক বিবাহ বহুল প্রচলিত তবে বহু বিবাহেও বাধা নিষেধ নেই। অভিভাবকদের আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিবাহ ঠিক করা হয়। কনে পছন্দ হলে বরপক্ষের অভিভাবকেরা কনের বাড়ি গিয়ে বিয়ের দিন ক্ষণ ইত্যাদি স্থির করে। অচাই বা নোয়াতিয়া গ্রাম্য পুরোহিত বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিয়ের কাজ সম্পাদন করে।

এছাড়া প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী জুমিয়া পরিবারগুলিতে কাজের বিনিময়ে বিবাহ "জামাই খাটা" পদ্ধতি অর্থাৎ বর নির্দিষ্ট কয়েক বছর কনের বাপের বাড়িতে শ্রম প্রদানের মাধ্যমে বিবাহ করার পদ্ধতি ও নোয়াতিয়া সমাজে বিরাজমান। নোয়াতিয়া সমাজে বাল্য বিবাহ বিরল। বিবাহ বিচ্ছেদ এবং বিধবা বিবাহ নোয়াতিয়া সমাজে গ্রহণযোগ্য। তবে বিবাহ বিচ্ছেদ শুধু মাত্র গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং প্রধানের অনুমতিতে গ্রহণযোগ্য।

নোয়াতিয়া উপজাতি সম্প্রদায় হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী। এদের মধ্যে বৈষ্ণব মতাবলম্বীদের প্রাধান্য দেখা যায়। নোয়াতিয়াদের উপগোষ্ঠী মুড়াসিং এবং তোতারামদের কাছে মুরগী, ছাগল, শূকর ইত্যাদি মাংস এবং ডিমের জন্য লালনপালন ধর্মীয় ভাবে নিষিদ্ধ। তবে চাষ বাস করার জন্য এবং দুধের জন্য গরু ও মহিষ লালন পালন করা যায়। বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী নোয়াতিয়াদের মৃতদেহ দাহ করা হয় না, সাধারণত কবর দেওয়ার রীতি বিদ্যমান। নোয়াতিয়া সম্প্রদায়ের উপজাতিরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন তীর্থস্থানে দলবদ্ধ হয়ে তীর্থ ভ্রমণও করে থাকে এবং বিষ্ণু পূজা করে।

অন্যদিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় অন্যান্য নোয়াতিয়া উপজাতি গোষ্ঠীগুলি তাদের চিরাচরিত পদ্ধতিতে বিভিন্ন পাহাড়ি পূজা পার্বণ করে। তাদের পূজা পার্বণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল (১) লাম্প্রা পূজা (২) তুইমা পূজা (৩) কের পূজা (৪) গড়িয়া পূজা (৫) নাকরি পূজা ইত্যাদি। এছাড়া শিব, কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ইত্যাদি

দেবদেবীর পূজা ও নোয়াতিয়ারা করে থাকে। পুরাতন আগরতলাস্থিত চতুর্দশ দেবতার পূজা, উদয়পুরের মাতা ত্রিপুরীসুন্দরী দেবীকে ও ভক্তিনিষ্ঠার সঙ্গে পূজা করে থাকে।

মাঙ্গলিক পূজা হিসাবে লাম্প্রা পূজা নোয়াতিয়া পরিবারগুলি যে-কোনো শুভকার্যের আগে সম্পাদন করে। বিবাহ, গৃহপ্রবেশ, নতুন বাড়িঘর তৈরি, নবজাত শিশু ও মায়ের শুদ্ধীকরণ ইত্যাদি কার্যের আগে সাধারণত নোয়াতিয়া অচাই এর দ্বারা লাম্প্রা পূজা করা হয়। লাম্প্রা পূজার সময় পূজাপ্রার্থী পরিবারের আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী ডিম, পাঁঠা, হাঁস, মুরগী, কবুতর ইত্যাদি ঠাকুরকে উৎসর্গ করার রেওয়াজ বিদ্যমান।

তুইমা নোয়াতিয়াদের জলদেবী হিসাবে গণ্য হয়। জলদেবীর পূজা নোয়াতিয়ারা হিন্দুধর্ম গ্রহণের আগে থেকে করে আসছে এমন ধারণা করা হয়, নোয়াতিয়া সমাজে এমন বিশ্বাস বিদ্যমান যে, সমস্ত প্রাণী জল থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এই কারণে বিশুদ্ধ জল বিভিন্ন ধর্মীয় এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে শুদ্ধীকরণের উদ্দেশ্যে ছিটিয়ে ব্যবহার করার রীতি নোয়াতিয়া সমাজে বিদ্যমান, তুইমা দেবী বা জলদেবীর পূজার সময় নদীর মধ্যে বাঁশের কারুকার্য্যখচিত মণ্ডপ তৈরি করা হয়। তাদের ধারণা জলের দ্বারা মহামারী রোগ জীবাণু ছড়ায় তাই তুইমা সন্তুষ্ট হলে মহামারী রোগের হাত থেকে তারা রক্ষা পাবে। তুইমার পূজায় পাঁঠা অথবা মহিষ উৎসর্গ করা হয়।

কের পূজা সাধারণত ফাল্গুন-চৈত্র মাসে করা হয়। কের পূজার আগে গ্রামের চারপাশে সীমানা নির্দ্ধারণ করা হয়। পূজার জন্য নির্দ্ধারিত সময়সীমা অতিক্রম করার আগে বাইরের কারো পক্ষে এই সীমানার ভেতর প্রবেশ করা নিষিদ্ধ। যদি কেউ এই আইন ভঙ্গ করে, তবে শাস্তি দেওয়া হয় এবং পুনরায় পূজার ব্যবস্থা করা হয়। কের পূজা নোয়াতিয়ারা সামাজিক পূজা বা বারোয়ারী পূজা হিসাবে গ্রামের সকলে মিলেমিশে চাঁদা দিয়ে সম্পাদন করে থাকে। এই পূজা গ্রামবাসীদের সমৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এবং মহামারী রোগ থেকে মুক্ত রাখার জন্য করা হয়।

শুভনববর্ষে অর্থাৎ ১লা বৈশাখ থেকে সাতদিন গড়িয়া পূজা করা হয়। নোয়াতিয়া সমাজের ধারণা গড়িয়া ঠাকুর সন্তুষ্ট হলে নববর্ষে তাদের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে। ১লা বৈশাখ গড়িয়া ঠাকুরের জলপূর্ণ ঘট স্থাপন করা হয় এবং ৭দিন পূজা হয়। সাতদিনের দিন পূজার কার্য সমাপ্ত হলে সকলে নাচ গানে মেতে ওঠে। পূজার উপকরণের মধ্যে ভাত থেকে তৈরি দেশীমদ অত্যাবশ্যকীয়। গড়িয়া ঠাকুরকে মোরগ উৎসর্গ করা হয় এবং প্রতিদিন যতক্ষণ পূজার কাজ সুষ্ঠু ভাবে না সম্পাদন হয় অচাই বা পুরোহিত অভুক্ত থাকে।

নাকরী ঠাকুরকে পূজা করার উদ্দেশ্য গ্রামের সমৃদ্ধি এবং নোয়াতিয়া সমাজকে বিভিন্ন বিপদ আপদ থেকে মুক্ত রাখা। নাকরী ঠাকুরকে দেশী মদ, একটি মুরগী অথবা পাঁঠা উৎসর্গ করা হয়।

এছাড়া নোয়াতিয়া উপজাতি সম্প্রদায় ক্ষতিকর দুষ্ট প্রেতাত্মা, ভূতপেত্নী, ডাইনি

ইত্যাদির ওপর বিশ্বাসী। গ্রাম্য অচাই বিভিন্ন রকমের যাদুমন্ত্র তন্ত্র এবং সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নোয়াতিয়া সমাজকে এই সকল ক্ষতিকারক শক্তির হাত থেকে রক্ষা করতে পারে বলে তারা বিশ্বাস করে।

প্রাচীনকালে নোয়াতিয়া গ্রামীন সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে গ্রামের সর্দারকে বলা হত "নারান"। নারান প্রাচীনকালে নোয়াতিয়া সমাজের সর্বময় কর্তারূপে পরিগণিত হত। নারান এর প্রধান সাহায্যকারীকে বলা হত "পুমাঙ্গ"। নোয়াতিয়া যুবসমাজের নেতাকে বলে "মৌলভী"। পুমাঙ্গকে সাহার্য্য করার জন্য একজন পুরুষ "শোভামালী" এবং একজন মহিলা "খেমরাঙ মালী" থাকে। নোয়াতিয়া সমাজ ব্যবস্থায় "খেমরাঙমালী" প্রধানত মেয়ে সংক্রান্ত ঝুট ঝামেলার ব্যাপারগুলি তদারকি করে। প্রতিটি নোয়াতিয়া পাড়ার প্রধানদের বলে "রোয়াজা"। রোয়াজাদের কাজকর্মের প্রতি নজরদারি করার জন্য একজন "চৌধুরী" থাকে। প্রতি পাড়ায় রোয়াজার সঙ্গে একজন উপকর্তা থাকে যাকে বলে "ডাব্যাঙ্গ" এবং রোয়াজাদের উপদেষ্টা হিসাবে "কারবারী" থাকে। এছাড়া প্রতিটি পাড়ার বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি দেখাশুনার জন্য "সিংহবুড়া" এবং খবরাখবর আদানপ্রদানের জন্য "মুড়চুই" থাকত। পরবর্তী সময়ে উপরোক্ত সমাজব্যবস্থা লোপ পায় এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রতি পাড়ার প্রধানকে বলা হত "রোয়াজা" অথবা "চৌধুরী'। রোয়াজা বা চৌধুরী পাড়ার অন্যান্য বয়স্কদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা ক্রমে নোয়াতিয়া সমাজের ঝগড়া বিবাদ, বিবাহ বিচ্ছেদ, মেয়ে সংক্রান্ত ঘটনা, চুরি, সামাজিক আইনকানুন ইত্যাদির নিষ্পত্তি করত। বর্তমানে ত্রিপুরারাজ্যে পঞ্চায়েত রাজব্যবস্থা চালু হওয়ায় এই সমস্ত বিষয়গুলি পঞ্চায়েতের মাধ্যমে দেখাশোনা করা হয়। নোয়াতিয়া সমাজ ব্যবস্থায় নোয়াতিয়া পাড়াগুলির নাম সাধারণত "রোয়াজা" অথবা "চৌধুরীর" নাম অনুসারে পরিচিতি লাভ করে যেমন গকুল রোয়াজা পাড়া, জয়রাম চৌধুরীর পাড়া ইত্যাদি।

নোয়াতিয়া সমাজ ব্যবস্থায় ছেলেরা পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হয়। মেয়েরা সম্পত্তির কোনো অংশ পায় না। মাও কোনো সম্পত্তি পায় না তবে মায়ের প্রতি ছেলেরা শ্রদ্ধাশীল থাকে। মৃত্যুর পর হিন্দুদের ন্যায় নোয়াতিয়া উপজাতি শবদাহ করে থাকে। নোয়াতিয়া সমাজে শবদাহের ব্যাপারে কতকগুলি নিয়মকানুন মানা হয় যেমন শ্মশানে শবদেহ তোলার আগে শবদেহকে স্নান করানো হয় এবং নতুন কাপড় পরিধান করানো হয়। রবিবার অথবা বুধবার মৃত্যু হলে সেই দিন শবদাহ না করে পরদিন করা হয়। নোয়াতিয়া সমাজে কেউ কলেরা, বসন্ত, যক্ষ্মা, অথবা কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলে সেই শব দাহ না করে মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়। নবজাত শিশু অথবা জন্মের এক মাসের মধ্যে শিশুর মৃত্যু হলে শব একটি দোলনার মধ্যে রেখে গভীর জঙ্গলে বড় গাছের ওপর ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। শবদাহের সময় পুরুষদের ক্ষেত্রে পাঁচটি এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে সাতটি লাকড়ির স্তর ব্যবহার করা হয়। মৃতের ছেলে পিতার

মুখাগ্নি করে থাকে। ছেলে না থাকলে ভাই অথবা ভাগ্নেরা মুখাগ্নির কাজ সম্পাদন করতে পারে।

নোয়াতিয়া উপজাতিদের অবস্থাপন্ন কেউ মারা গেলে শবদেহ রথের ওপর বসিয়ে শ্মশানে টেনে নেওয়া হয় এবং শ্মশান যাত্রীরা সকলে দেশী মদ্য পান করে। শবদাহ সম্পন্ন হলে মৃতের অস্থি এবং ছাই নদী অথবা ছড়ার জলে ফেলার জন্য সংগ্রহ করা হয়। শবদাহের চারদিন পর শ্মশান ধৌত করা হয় এবং শ্মশানের চারপাশে বেতের তৈরি কিছু পাখীর প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয়। যদি মৃতব্যক্তি অবস্থাপন্ন এবং নামীকামী হয় তবে শ্মশানের পাশে লম্বা গাছের মাথায় একটি লাল অথবা সাদা রঙের পতাকা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। মৃতের আত্মাকে ভাত, তরকারি এবং দেশীমদ উৎসর্গ করার রেওয়াজ নোয়াতিয়া উপজাতিদের মধ্যে দেখা যায়। নোয়াতিয়ারা আর্থিক ক্ষমতা অনুসারে এক বছরের মধ্যে শ্রাদ্ধের কাজ সম্পন্ন করে।

ত্রিপুরার নোয়াতিয়া উপজাতি জন্মসূত্রে পাহাড়ি চাষী, প্রত্যন্ত অঞ্চলের নোয়াতিয়া পাড়ার বেশির ভাগ এখনো জুম চাষের ওপর নির্ভরশীল। নোয়াতিয়া সম্প্রদায়ের পর্বত সন্তানরা জুম চাষপদ্ধতিতে যে সকল কার্য সম্পাদন করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল (১) জমি নির্বাচন (২) বনজঙ্গল কাটা (৩) কাটা শুকনো বনজঙ্গল পোড়ানো (৪) জুম পরিষ্কার করা (৫) বীজ বপন (৬) আগাছা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি। জুম জমি নির্ব্বাচনের সময় নোয়াতিয়া সম্প্রদায়ের উপজাতি জুমিয়ারা পাহাড়ের ঢালু জায়গা এবং বাঁশবন অধিক পছন্দ করে। নোয়াতিয়া-জুমিয়া-পরিবারগুলি শ্রম বিনিময়ের মাধ্যমে জুমচাষে একে অপরকে সাহায্য করে। জুম চাষ সম্পূর্ণ বৃষ্টি নির্ভর ফসল। বীজ বপনের কাজ প্রাক্ মৌসুমী বৃষ্টির সুযোগ নিয়ে শুরু করা হয়। বিভিন্ন ধরণের সব্জী বীজ, তুলো, মেস্তা, ভূট্টা এবং এক জাতের ধান বীজ এক সঙ্গে মিশ্রিত করে, সঙ্গে সামান্য ঝুরো মাটি ও বীজের মিশ্রণের সঙ্গে মেশানো হয়। বীজ বপনের দিন পরিবারের সকলে স্নান করে জুমের জমিতে প্রবেশ করে। এখন মিশ্রিত বীজের ভাণ্ডার থেকে ভাগ করে প্রত্যেকে বাঁশের তৈরি বিশেষ ধরনের খাঁচা "চেম্পাই" এর ভিতর মিশ্র বীজ কোমরে বাঁধে। বীজ বপনের সময় সকলে সারিতে পর পর দাঁড়ায় এবং তাক্কালের সাহায্যে মাটিতে গর্ত করে ৩-৪টি বীজ প্রতি গর্তে বপন করে। জুমে কাজ করার সময় একজন উচ্চৈঃস্বরে জুমের বীজ বপনের পদ্ধতি যেমন গর্তের গভীরতা, গর্ত থেকে গর্তের দূরত্ব, প্রতিগর্তে কয়টি বীজ বপন করতে হবে ইত্যাদি নির্দেশ সম্বলিত গান গায় অন্যরা তার সঙ্গে সুর মেলায়, আনন্দ উপভোগ করে এবং জুমে কাজ করে। বীজ বপনের পর বৃষ্টি হলে সহজে বীজগুলি মাটিতে ঢাকা পড়ে এবং বীজগুলি পাখি ও পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়।

বীজ গজানোর পর তিন বার আগাছা বাছাই করা হয় জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ এবং শ্রাবণ মাসে। এই সময় ছেলেমেয়ে, বয়স্ক পুরুষ মহিলা পরিবারের সকলে সক্রিয় ভাবে

অংশ গ্রহণ করে। এই সময়ে ফসল বন্য প্রাণী ও পাখীর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য জুমের মধ্যে টংঘর (মাচাং ঘর) তৈরি করে। মাচাং ঘরে থেকে বন্যপ্রাণী তাড়ায়। জুম ফসল সম্পূর্ণ ঘরে না তোলা অবধি মাচাং ঘরে জুমিয়া বসবাস করে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের নোয়াতিয়া পাড়ার পার্শ্ববর্তী বাজার যা সপ্তাহের দুদিন বসে সেখানে পুরুষ এবং মহিলারা মাথায়ও পিঠে ঝুলিয়ে বাঁশের খাঁচার মধ্যে করে অথবা মাথায় বহন করে বিভিন্ন জুম কৃষি জাতসামগ্রী বাজারে নিয়ে আসে। এই গুলি বিক্রি করে জুমিয়া উপজাতিরা তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী যেমন লবণ, কেরোসিন তেল, শুকনো মাছ, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি ক্রয় করে থাকে। বাজারের দিন উপজাতি জুমিয়ারা বহুসংখ্যক বাজারে মিলিত হয় এবং দুপুরের মধ্যে বেচা-কেনা সেরে বিকালের আগেই বাড়ি ফিরতে শুরু করে। বেলা প্রায় ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত জুমিয়া উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের বাজারগুলি রমরমা থাকে। বাজারে আসার সময় নোয়াতিয়া মহিলারা অলংকার বিশেষ করে গলায় মালা, হাতে চুড়ি, পায়ে খাড়ু, চুলে ফুল ইত্যাদি দিয়ে মোটামুটি সেজেগুজে আসে, বাজার বার দিন উপজাতিরা তাদের সাধ্য অনুসারে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভাল কাপড়-চোপড় পরে বাজারে আসে। জুমিয়া মহিলারা বাজারে আসার সময় তাদের ছোট ছোট শিশুদের কাপড়ে বেঁধে পিঠে ঝুলিয়ে নিয়ে আসে। খুব সকাল বেলা থেকে বিভিন্ন উপজাতি জুমিয়া পাড়ার লোকজন ছোট ছোট দলে বাজারের উদ্দেশ্যে রওনা হয় এবং বাজার সেরে সন্ধ্যার আগে বাড়ি ফিরে যায়। যাদের বাড়ি দূরে এবং ফিরতে রাস্তায় রাত হয় তারা বাজার থেকে কাঁচা মুলি বাঁশের চোঙে কেরোসিন পুড়ে মশাল অথবা পাটকাঠি, বাঁশের কুঞ্চি ইত্যাদি দিয়ে মশাল জ্বালিয়ে বাড়ি ফিরে। ত্রিপুরারাজ্যের উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় হাট বাজার হল এমন একটি স্থান যেখানে বিভিন্ন জুমিয়া পাড়ার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাত এবং খবরাখবর আদান-প্রদান হয়।

নোয়াতিয়া উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পূর্ণ জুমের ওপর নির্ভরশীল (Hard core) ব্যতীত আংশিক জুমিয়া পরিবারও দেখা যায়। আংশিক জুমিয়ারা সমতলে চাষবাসের পাশাপাশি অল্পস্বল্প জুম চাষ করে থাকে। পশুপাখি পালন ও নোয়াতিয়া উপজাতি জুমিয়াদের আর্থিক সংস্থানের অন্যতম সম্বল। বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী নোয়াতিয়া ছাড়া অন্যরা ছাগল, শূকর এবং মুরগী পুষে থাকে। এছাড়া দুধের গরু, মহিষ, হালের বলদ এবং হাঁস, কবুতর ইত্যাদি সমতলে বসবাসকারী নোয়াতিয়া বাড়িতে দেখা যায়। আজকাল উঁচু পাহাড়ি জায়গায় অথবা বসতবাড়ির আশপাশে নোয়াতিয়া উপজাতিরা বিভিন্ন ধরণের ফল ও বাগিচা ফসল বিশেষ করে কলা, পেঁপে, নারিকেল, সুপারী, আদা, হলুদ ইত্যাদির চাষ করে থাকে এবং স্থানীয় বাজারে এইগুলি বিক্রি করে থাকে।

জমি, শ্রম এবং মূলধন কৃষিকাজে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নোয়াতিয়া উপজাতিদের জমি তাদের নিজস্ব সম্পত্তি, তারা জমি বিক্রি, বন্ধক, দান এবং টাকার বিনিময়ে স্বল্পকালীন

ভাড়া খাটাতে পারে। বর্তমানে উপজাতি অধ্যুষিত প্রত্যন্ত অঞ্চলে জমির অভাব নেই। কৃষি উৎপাদনের জন্য শ্রম ও অত্যাবশ্যকীয় এই প্রসঙ্গে বলা যায় উপজাতি পরিবারের পুরুষ, মহিলা, যুবক যুবতী এমন কি ছোট ছেলে মেয়েরা সকলে কৃষিকাজে অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু মূলধন হল উপজাতি পরিবারের কৃষি উৎপাদনের প্রধান অন্তরায়। বর্তমানে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী নোয়াতিয়া উপজাতি বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি এবং নিজস্ব সঞ্চয় সংস্থা থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। সরকারি সংস্থার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হয় উন্নয়নমূলক ঋণ, জুমিয়া পুনর্বাসন ঋণ, কৃষি ঋণ, সমবায় ব্যাঙ্ক ঋণ ইত্যাদি। বেসরকারি সংস্থার মধ্যে আছে গ্রামের মহাজন, ধান ব্যবসায়ী, গ্রামের প্রতিবেশী, এছাড়া উপজাতিদের সমাজব্যবস্থায় নিজস্ব সঞ্চয় সংস্থা যেমন ধর্মগোলা থেকেও অভাবের দিনে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। সমতল অঞ্চলে মূলধন প্রধানত প্রয়োজন হয় উৎপাদনসামগ্রী যেমন হালের বলদ, সার, বীজ, কীটনাশক ঔষধ, কৃষি যন্ত্রপাতি লাঙ্গল, মই, কোদাল, বিদা, কাঁচি, তাক্কাল, দা ইত্যাদি ক্রয় করার জন্য।

সমতল অঞ্চলে বসবাসকারী নোয়াতিয়া উপজাতিদের মধ্যে "বর্গা" বা ভাগ চাষের পদ্ধতি বিরাজমান। এই পদ্ধতিতে ভাগচাষী মালিকের জমিতে চাষ আবাদ করে এবং উৎপাদিত ফসল সমান দুভাগে ভাগ করে জমির মালিক এবং ভাগচাষী ভোগ করে। ভাগচাষীকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে জমির মালিক বীজ ও সার ইত্যাদি দিয়ে থাকে তবে ভাগচাষী হালের বলদ, লাঙ্গল, ফসল উৎপাদনের এবং তোলার জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমের ব্যবস্থা করে।

ভাগচাষ ব্যতীত নোয়াতিয়া সমাজে ফসল উৎপাদনের "বারতার" পদ্ধতিও বিরাজমান। এই পদ্ধতিতে জমির মালিক প্রতিবেশীর কাছ থেকে লাঙ্গল এবং হালের বলদ ধার করে নেয় এবং নিজের জমি চাষ করে ফসল উৎপাদন করে। পরিবর্তে জমির মালিক লাঙ্গল এবং বলদের ভাড়া বাবদ উৎপাদিত ফসলের একটি অংশ লাঙ্গল ও বলদের মালিককে দিয়ে থাকে।

নোয়াতিয়া উপজাতি সম্প্রদায় চাষ আবাদের দ্বারা যে ফসল উৎপাদন করে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সারা বছরের খাদ্যের সংস্থান হয় না, ফলে পরিবারের খাদ্যের ঘাটতি মেটাতে টাকা ধার করে থাকে। এছাড়া অসুখ বিসুখ, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, বিভিন্ন পূজা পার্বণ ইত্যাদির জন্যও নোয়াতিয়া উপজাতি টাকা ধার করে থাকে। অন্যদিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় বেশির ভাগ উপজাতিরা ভবিষ্যৎ এর কথা চিন্তা করে না যতক্ষণ ঘরে খাওয়ার সংস্থান থাকে ততক্ষণ অমিতব্যয়ী হয় এমন কি আমোদ ফূর্তির ভেতর মশগুল হয়ে কাজকর্ম করা থেকে বিরত থাকে। এই সকল কারণে উপজাতি পরিবারগুলি শুধু মাত্র কৃষিকাজের উপর নির্ভর করে স্বনির্ভর হতে পারছে না এবং অভাবের দিনে সরকারি অনুদান, বনজঙ্গল থেকে বাঁশ, ছন, লাকড়ি ইত্যাদি বিক্রি করে অথবা রাস্তাঘাটে, বনবিভাগে, অন্যের কৃষি জমিতে দিন মজুরের কাজ অথবা টাকা ধার করে

কৃষিকাজে গারো রমনী

জীবিকা নির্বাহ করতে বাধ্য হয়। এই ঋনের বোঝা দিন দিন বাড়তে থাকে এবং শুধুমাত্র শ্রম প্রদান করে ঋণের বোঝা লাঘব করতে ব্যর্থ হয়। তাই কৃষি কাজের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য আনুষাঙ্গিক জীবিকার মাধ্যমে সারা বছর কর্মসংস্থানের এবং আয়ের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন।

অন্যদিকে নোয়াতিয়া উপজাতির জুমিয়া পরিবারগুলি যেহেতু স্থান হতে স্থানান্তরে ভ্রমণশীল জীবন যাপন করে তাই তারা স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টিতে কোনো প্রকার আগ্রহ প্রকাশ করে না। এই কারণে লক্ষ্য করলে দেখা যায় তারা দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পে বিশেষ করে ফল ও বাগিচা ফসল চাষে প্রথমদিকে নগদ আর্থিক অনুদানে আকৃষ্ট হয়ে সাময়িক চারা রোপণ করলেও পরবর্তী সময়ে তেমন যত্ন পরিচর্যা করে না। এছাড়া পশুপাখি পালনেও কম আগ্রহ প্রকাশ করে। আবার নোয়াতিয়া সম্প্রদায়ের মুড়াসিং, তোতারাম এবং বৈষ্ণবেরা বেশির ভাগ বৈষ্ণব ধর্মে বিশ্বাসী এবং শূকর, মুরগী, ছাগল ইত্যাদি পালনে অনিচ্ছুক তাদের জন্য পুনর্বাসন প্রকল্পে দুগ্ধবতী গাভী এবং হালচাষের জন্য বলদ দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানে লক্ষ্য করলে দেখা যায় গাভী এবং বলদ বিতরণ পদ্ধতিতে স্থানীয় বাজারে সরকারি কর্মচারীর উপস্থিতিতে জুমিয়া চাষী গাভী বা বলদ ক্রয় করে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সরকারি কর্মচারীর অজান্তে টাকা আদান প্রদানের মাধ্যমে বাজারে গাভী বা বলদ সরকারি কর্মচারীর উপস্থিতিতে নাটকীয় ক্রয় বিক্রয় হয়। প্রকৃত পক্ষে জুমিয়া চাষী কিছু টাকা গচ্চা দিয়ে প্রকারান্তরে নগদ টাকা নিয়ে অন্য কাজে ব্যয় করে থাকে। ফলে প্রকল্পের সুষ্ঠু লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভবপর হয় না।

❒ নবম অধ্যায়

কুকি

কুকি উপজাতি সম্প্রদায় ত্রিপুরারাজ্যে বহু প্রাচীন কাল থেকে বসবাস করে আসছে, এমন তথ্য বিদ্যমান, কুকি সম্প্রদায় নিজেদের রেম (Hre-em) নামে পরিচয় দেয়। সমতলে বসবাসকারী বাঙালি এবং মণিপুরীদের কাছে এই উপজাতি সম্প্রদায় যথাক্রমে "কুকি" এবং "খংজাই" এক কালে ভীতির কারণ ছিল। সংস্কৃত পুস্তকাদি এবং মহাভারতে "কিরাত" জাতি হিসাবে বহুল পরিচিত। ত্রিপুরী উপজাতি সম্প্রদায় কুকিদের বলে "সিকাম" এবং ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ বলে ডারলং কুকি। ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাসকারী কুকি উপজাতি সম্প্রদায়কে প্রধানত দুই গ্রুপে বিভক্ত করা হয়। যেমন ডারলং কুকি এবং রোখুম কুকি। কুকি সম্প্রদায়ের মতামত অনুসারে ডারলং কুকি হল "মার-মি" অর্থাৎ উত্তরে বাসিন্দা এবং রোখুম কুকি হল "সেম-মি" অর্থাৎ দক্ষিণের বাসিন্দা। বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাসকারী কুকি উপজাতি সম্প্রদায়ের আদিস্থান কোথায় ছিল বলা মুশকিল। তবে ত্রিপুরার ইতিহাসে মহারাজা ধন্যমাণিক্য ১৪৬৩ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সিংহাসনে বসেন। সেই সময় থানাংচি একটি পাহাড়ি কুকি রাজ্য ছিল। ঐ রাজ্যের প্রজারা জুম চাষের ওপর নির্ভর করতো, পাহাড়ের ঢালে ধান, তুলো, ভুট্টা ইত্যাদির চাষ করতো। এছাড়া থানাংচি রাজ্যের পাহাড়ের ঢালু অঞ্চলে সারি সারি কমলা বাগান ছিল। মহারাজ ধন্যমাণিক্য রিয়াং বীর রায়কাচগ কে পাঠিয়ে থানাংচি রাজ্য জয় করেছিলেন। ঐ সময়ে ত্রিপুরার সৈন্যদের অত্যাচারে থানাংচি রাজ্য থেকে বহু প্রজা জয়ন্তিয়া এবং মণিপুরে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। আবার ত্রিপুরার উপজাতি জমাতিয়া সম্প্রদায়ের ছোট গড়িয়া ঠাকুরকে কুকি দেশ থেকে এক সাহসী জমাতিয়া বীর পুব নারায়ণ এনেছিলেন, এমন তথ্যও পাওয়া যায়। তবে থানাংচি রাজ্য বা কুকি দেশ কোথায় ছিল তা আজও রহস্যে আবৃত। অন্যদিকে "রাজমালায়" দেখা দেয়, ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী রাঙ্গামাটি (বর্তমান উদয়পুর) কিরাত রাজার রাজধানী ছিল এবং কোনো এক প্রতাপশালী ত্রিপুরী মহারাজ কুকিদের কাছ থেকে রাঙ্গামাটি দখল করেছিলেন। কোনো কোনো লেখকের মতেও চীনদেশে একটি সরোবরের নাম "কু"। চীনা ভাষায় "কু" সরোবরের আশপাশে বসবাসকারী জন সম্প্রদায় হল কুকি।

ডারলং ভাষায় "ডার" অর্থ স্কন্ধ বা কাঁধ এবং "লেঙ্গ" অর্থ "কাটা" তাই ডারলং শব্দের অর্থ দাঁড়ায় যারা স্কন্ধ বা কাঁধ ছেদন করতো তারা হল ডারলং। আসলে ডারলেং শব্দ থেকে "ডারলং কুকি" শব্দের বুৎপত্তি। সে যাই হোক কুকি সম্প্রদায়ের ভাষ্য অনুসারে দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের মেকং নদীর ধারে সিমলং নামক স্থান ছিল কুকিদের আদি বাসস্থান। সেখান থেকে শান দেশ, বর্মাদেশ হয়ে লুসাই পাহাড় (বর্তমান

মিজোরাম) অতিক্রম করে ত্রিপুরা, আসামের কাছাড় এবং মিকির পাহাড়, নাগা পাহাড় (বর্তমান নাগাল্যান্ড) হয়ে মণিপুর রাজ্যে প্রবেশ করে এবং এই সমস্ত অঞ্চলে স্থায়ী ভাবে বসবাস করার সুবাদে এখনো কুকিরা মিজোরাম, ত্রিপুরার রাজ্যের উত্তর পূর্বাঞ্চল, মণিপুরের দক্ষিণ অঞ্চল, পার্বত্য চট্টগ্রামের পূর্বাঞ্চলে এবং বর্মার (বর্তমান মায়ানমার) কিয়দংশে বসবাস করে। ত্রিপুরারাজ্যের মধ্যে কৈলাশহর, ধর্ম্মনগর, খোয়াই, উদয়পুর, কমলপুর, লংথরাই ভ্যালী, অমরপুর এবং সদর মহকুমায় অধিক সংখ্যায় বসবাস করে। ১৯৭১ সনের হিসাব অনুযায়ী ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ৭৭৭৫ জন বসবাস করতো, তার মধ্যে ৩২২৭ জন উত্তর জেলায় এবং কৈলাশহর মহকুমায় ২৪০৪ জন বসবাস করতো। প্রাচীনকালে ত্রিপুরায় বসবাসকারী কুকি উপজাতি সম্প্রদায় সম্পূর্ণ ভাবে জুমচাষ ও শিকারী জীবন জীবিকার উপর নির্ভরশীল ছিল। সেই সময়ে তারা জুমের ফসল বিক্রি করে, বাজার থেকে লবণ, কেরোসিন এবং শুকনো মাছ ক্রয় করতো। ত্রিপুরারাজ্যে ১৯৩১ সন পর্যন্ত কোনো কুকি পরিবার সমতলে চাষবাস করতো না। ত্রিপুরারাজ্যে ১৯৮৭ সনের জুমিয়া পরিসংখ্যান দেখা যায় সে সময় ১৬৬ পরিবার কুকি উপজাতি সম্প্রদায় সম্পূর্ণ জুম চাষের ওপর এবং ১৫৭ পরিবার আংশিক জুম চাষের ওপর নির্ভরশীল ছিল। ত্রিপুরারাজ্যে কুকি সম্প্রদায়ের জুমিয়া জনসংখ্যা ছিল মোট ১৮৯৬ জন, তাদের মধ্যে ১৭৭৯ জন উত্তর ত্রিপুরা জেলায়, ১১৫ জন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় এবং মাত্র ২ জন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় বসবাস করতো। বর্তমানে উত্তর ত্রিপুরা, ধলাই জেলায় বসবাসকারী ডারলং কুকি সম্প্রদায় ফলচাষ বিশেষ করে আনারস চাষে খুবই পারদর্শী। উঁচু-নীচু পাহাড়ের ওপর আনারস চাষ করে প্রধানত জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।

এমন শোনা যায় প্রাচীন কাল থেকে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত কুকি সর্দারদের মৃত্যুর পর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় মানুষের মাথা উৎসর্গ করা হত, কুকি সর্দারের মৃত্যুর পর শবদেহ সমাধিস্থ করার সময় বেশ কিছু মানুষের মাথাও সমাধিস্থ করা হত। সেই সময়ে এমন ধারণা করা হত যে সর্দারের মৃত্যুর পর অন্যজগতে সর্দারের আদেশ পালন করার জন্য কয়েকজন গোলাম সর্দারের সঙ্গে যাওয়া উচিত। এই কারণে সর্দারের কবরের মধ্যে বেশ কিছু মানুষের মাথা উৎসর্গ করা হত। সেই সময় মণিপুরী এবং বাঙালি সম্প্রদায়ের মধ্যে কুকিভীতি বিদ্যমান ছিল। ভয়াভয় কুকি থানাদারেরা যে লুঠতরাজ, বাড়ি ঘরে অগ্নি সংযোগ, হত্যাকাণ্ড, মুণ্ডচ্ছেদ, অপহরণ ইত্যাদি সংঘটিত করত তারও নিদর্শন পাওয়া যায়। ত্রিপুরার মহারাজ কৃষ্ণকিশোর-মাণিক্যের সময় ১৮৪৪ সনের ১৬ এপ্রিল কুকি সর্দার লাল ছোকলার নেতৃত্বে প্রতাপগড়ের মণিপুরী গ্রাম কোছাবাড়িতে এক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। লাল ছোকলা তার পিতার মৃত্যুর পর প্রাক্তন কুকি সর্দারের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদনের উদ্দেশে কুড়িজন নিরীহ মণিপুরী গ্রামবাসীর মুণ্ডচ্ছেদ করেছিল এবং পাঁচ জনকে

অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। তৎকালীন স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের মহারাজ কুকি বিদ্রোহ দমনের জন্য বৃটিশ সরকারের শরণাপন্ন হলে সিলেট থেকে ক্যাপটেন ব্ল্যাকউড এর নেতৃত্বে এক পদাতিক সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে লাল ছোকলাকে বন্দী করা হয়েছিল।

কুকি হানার পরবর্তী ঘটনার বিবরণে জানা যায় কুকি হানাদারেরা ১৮৬০ সালের ১ জানুয়ারি সমতল ছাগলনাইয়া এবং খণ্ডলে মারাত্মক ধরণের হানা সংঘটিত করেছিল। এই হানার সময় কুকিরা সংখ্যায় ছিল্ল প্রায় ৪০০-৫০০ জন, তারা ছাগলনাইয়া অঞ্চলের পনেরটি গ্রামে লুঠতরাজ, হত্যা এবং অপহরণ করে। ফলে প্রায় ১৮৫ জন সমতলবাসীর মৃত্যু হয় এবং প্রায় শতাধিক মহিলাকে বন্দী করে নিয়ে যায়। ঐ সময়ে সমতলের স্থানীয় সর্দার গুণা গাজী আশপাশের অঞ্চল থেকে কয়েকটি গাদা বন্দুক সংগ্রহ করে কুকিদের আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করে। এই কুকি হানার নেতৃত্ব দিয়েছিল জনৈক রতুন পুইয়া নামক একজন কুকি। তারপর ১৮৬১ সালের জুলাই মাসে বৃটিশ বাহিনী ক্যাপ্টেন রবণের নেতৃত্বে একদন ইংরেজ সৈন্য কুকি নেতা রতুন পুইয়ার গ্রাম আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুতি নেয়। এই খবর পেয়ে রতুন পুইয়ার নিজ গ্রাম থেকে কুকিরা জঙ্গলে পালিয়ে যায়। ইংরেজ বাহিনীর অভিযান চলাকালীন সময়ে কুকি হানাদারেরা ত্রিপুরার তৎকালীন রাজধানী উদয়পুর আক্রমণ করে। কুকি দস্যুরা প্রায় ১৫০ জনকে গণহত্যা করে এবং প্রায় ২০০ জনকে বন্দী করে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার সময় প্রচুর ধনসম্পত্তি নষ্ট করে যায়, এই কুকি হানাদার বাহিনী দেশে প্রত্যাবর্তনের সময় পথে চাকমা রাণী কালিন্দী দেবীর অধীনের বেশ কিছু সংখ্যক চাকমা অধ্যুষিত গ্রামে অগ্নি সংযোগ করে, শেষ পর্য্যন্ত কুরকুরিয়া নামক স্থানের পুলিশ বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে কুকি হানাদার বাহিনী জঙ্গলে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

ত্রিপুরার মহারাজাদের শাসনকালেও দেখা যায় ত্রিপুরায় বসবাসকারী প্রতাপশালী কুকি সর্দারদের "রাজা" উপাধি দেওয়া হত। এই সকল কুকি উপজাতি সর্দার "রাজা" নিজ নিজ এলাকার প্রশাসন দেখাশুনা করত। তবে, তারা ত্রিপুরা মহারাজের আনুগত্য স্বীকার করে প্রতি বছর একবার অথবা দুইবার মহারাজের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করত। ত্রিপুরার মহারাজ তাদের এলাকা স্বশাসন ব্যবস্থাপনায় তেমন হস্তক্ষেপ করতেন না। কুকি ভাষায় ত্রিপুরার রাজাকে বলা হত "বেং" এবং কুকি রাজাকে বলা হত "লাল"।

ভারত সরকারের তফসিল জাতি ও উপজাতির তালিকায় কুকিরা সাঁইত্রিশটি শ্রেণী বা বিভাগে বিভক্ত। সেগুলি হল—১। বেইটে ২। গাংটো ৩। রাংখল ৪। কিপগেন ৫। লুফেং ৬। ঢাংসেন ৭। চোংলোই ৮। ডাউঙ্গেল ৯। গামলহাউ ১০। গাইটে ১১। হানলেং ১২। হাউপিপ ১৩। হাউলাই ১৪। হেংলা ১৫। হংসুং ১৬। জংবে ১৭। খায়েংং ১৮। খায়াতলাং ১৯। খেলমা ২০। খোলহাউ ২১। কুকি ২২। লেংথাং ২৩। লাংগুন ২৪। লাউজেম ২৫। লাউভুন ২৬। মংজল ২৭। মিসাউ ২৮। ভাইফেই ২৯। উইবুহ ৩০। থাংগো ৩১। থাডো ৩২। সুক্তে ৩৩। সিভল্লাউ ৩৪। সিংসন ৩৫। সেমনাম ৩৬। সাইরেন ৩৭। রিয়াং।

ত্রিপুরারাজ্যে ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট গেজেটারসে পনেরটি কুকি গোষ্ঠীর উল্লেখ করলেও ত্রিপুরা রাজ্যে মাত্র পাঁচটি গোষ্ঠী যেমন ১। পায়তু, ২। লেলাথ্যাট ৩। থ্যাংগুলাস ৪। লালিফ্যাং ৫। ব্যাঙ্গখাই বসবাস করে বলা হয়েছে।

প্রাচীন কালে কুকি উপজাতি সম্প্রদায় পোশাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করতো না। অথবা, কদাচিৎ সামান্য বস্ত্র ব্যবহার করতো, এমন শোনা যায়। তারপর তখনকার দিনে কুকি সম্প্রদায়ের পুরুষ এবং মহিলারা লম্বা চুল রাখত। আজকাল প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী পুরুষেরা ল্যাংটি পড়ে এবং মহিলারা পাছাড়া (ঘাগরা) দিয়ে কোমরের নিম্নাংশ ঢেকে রাখে এবং বুকের উপর এক টুকরা কাপড় দিয়ে বক্ষাবরণী ব্যবহার করে। তবে হাটে বাজারে অথবা অনুষ্ঠানে আসার সময় পুরুষেরা গেঞ্জী, জামা (পমপুর) এবং গামছা বা ধুতি (পম্‌সেং) পরিধান করে। কুকি মহিলারা ব্লাউস, ঘাগরা, পাছড়া পরিধান করে হাটে বাজারে আসে। কুকিরা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করার পর পশ্চিমী আদব কায়দা গ্রহণ করেছে। আজকাল বেশির ভাগ শিক্ষিত কুকি পুরুষেরা প্যান্টসার্ট, জুতা মোজা ব্যবহার করে এবং মহিলারা ছায়া, ব্লাউস, বক্ষাবরণী, গাউন, ঘাগরা, ওড়না, চাদর ইত্যাদি ব্যবহার করে। কৃষিকাজের সময় মাঠে কুকি মহিলারা কালো রঙের কাপড় অধিক ব্যবহার করে এবং কোমর তাঁতের সাহায্যে মহিলারা সুন্দর নক্সা করা পাছড়া নিজ হাতে এখনও বুনতে দেখা যায়।

প্রত্যন্ত অঞ্চলের কুকি মহিলারা কানের মধ্যে বড় ছিদ্র করে বাঁশের দুল ব্যবহার করে। এমন ধারণা করা হয় কানের দুলের ছিদ্র যে মহিলার যত বড়, সে মহিলা তত সুন্দরী। কুকি রমণীরা লালচে কাঁচের টুকরো দিয়ে তৈরি মালা গলায় পরিধান করে। এছাড়া পুঁতির মালা বা রাথই বীচির মালাও কুকি মহিলাদের খুব পছন্দ। তবে আজকাল আধুনিক শিক্ষিত মহিলারা সোনার হার, কানের দুল এবং বালা, ঘড়ি ইত্যাদি ব্যবহার করে। কুকি উপজাতি সম্প্রদায় প্রধানত তন্তু জাতীয় শস্য যেমন ধান, ভুট্টা ইত্যাদি ফসল জুমে চাষ করে এবং বছরের প্রায় ছয়মাস এইগুলি খেয়ে জীবন ধারণ করে। এছাড়া কুকি রমণীরা বনজঙ্গল থেকে ফল, মূল, সব্‌জী, বুনো আলু, বুনো কলার মোচা, মাশরুম ইত্যাদি সংগ্রহ করে। বাঁশের কচি চারা (বাঁশ করুল) কুকি উপজাতি সম্প্রদায়ের অভাবের দিনে খাদ্য সমস্যা মেটাতে সাহায্য করে। শুকনো মাছ, মাংস, মাছ, কাঁকড়া ইত্যাদিও কুকিদের প্রিয় খাদ্য।

খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে কুকি উপজাতি সম্প্রদায়ের কোনো প্রকার বাছ বিচার নেই। কারণ এরা প্রাচীন কালে নরখাদক ছিল এমনও শোনা যায়। বর্তমানে গৃহপালিত পশুপাখি ব্যতীত এরা বন্য হরিণ, শূকর, হাতি, বানর, হনুমান, বাঘ, ভোঁদর, নেউল, শিয়াল, উদ, কাঠবিড়াল, সজারু, খরগোস ইত্যাদি এবং পাখির মধ্যে বুলবুল, চড়াই, দোয়েল, টুনটুনি, বাবুই, কাঠঠোকড়া, মাছরাঙ্গা, তোতা, টিয়া, ময়না, কোকিল, ঘুঘু, বনমোরগ, সারস, বক, ডাউক, পানকৌড়ি, অজগর সাপ, ব্যাঙ, কচ্ছপ, কাঁকড়া, শামুক,

চিংড়ি, কুছিয়ামাছ এবং অন্যান্য সব ধরণের মাছ শিকার করে খেতে অভ্যস্ত। মোটকথা কুকি উপজাতি সর্বভুক। পশুপাখি শিকারের জন্য বন্দুক এবং বিভিন্ন ধরণের ফাঁদ ব্যবহার করে থাকে। এছাড়া পাহাড়ি নদী, ছড়া এবং মাঠ থেকে বাঁশ বেতের তৈরি বিভিন্ন প্রকার ফাঁদ ব্যবহার করে মাছ ধরে।

ত্রিপুরায় বসবাসকারী কুকি উপজাতি সম্প্রদায় কন্যা সন্তান অপেক্ষা পুত্র সন্তান আকাঙ্ক্ষা করে। সন্তান জন্মের সময় কোনো প্রকার সামাজিক অনুষ্ঠান পালন করা না হলে ও পুত্রসন্তান জন্মের তিন দিন পর এবং কন্যা সন্তানের জন্মের পাঁচ দিন পর সামাজিক ভোজের ব্যবস্থা করে থাকে। শিশুদের খাদ্য দেওয়ার সময় প্রথমে মায়ের মুখ থেকে খাদ্য নিয়ে শিশুর মুখে পুরে দেওয়ার সংস্কার প্রচলিত আছে। শিশুর জন্মের পর এক মাস পর্যন্ত অশুচি পালন করা হয় ফলে এই সময়ে মা কোনো প্রকার ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং পূজাপার্ব্বণের দ্রব্যসামগ্রী স্পর্শ না করার ধর্মীয় বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়।

প্রাচীন কালে কুকি উপজাতি হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী ছিল এবং বিভিন্ন ধরনের উপজাতি পূজাপার্বণ করতো, বিশেষ করে জুম চাষের সময় বিভিন্ন দেবদেবীর পূজাপার্বণ করা হত। বর্তমানে বেশির ভাগ কুকি সম্প্রদায় খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাসী এবং গির্জায় গিয়ে ভগবান যীশুখ্রিস্টের আরাধনা করে।

কুকিদের বিবাহ ত্রিপুরায় বসবাসকারী রিয়াং, সম্প্রদায়ের বিয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বাল্য বিবাহ সাধারণত হয় না। বিধবা বিবাহের প্রচলন আছে। বিবাহ বিচ্ছেদ স্বামী স্ত্রী উভয় পক্ষের ইচ্ছায় সমাজে অনুমোদিত হয়। কুকিদের বিবাহে সাধারণত বরের বয়স কনের বয়স অপেক্ষা বেশি হয়। বিবাহের পূর্বে ছেলে মেয়ের মতামত প্রাধান্য পায়। পাত্রপাত্রীর প্রাথমিক নির্বাচন স্থির হলে ঘটকের মাধ্যমে বিয়ের প্রস্তাব পাঠায় এবং বরের পিতামাতা কনের পিতামাতাকে আট টাকা জমা দিয়ে বিয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়। কুকি সমাজে রিয়াং সম্প্রদায়ের ন্যায় ঘর জামাই বা জামাই ঘাঁটা পদ্ধতিও প্রচলিত আছে। তবে আধুনিক খ্রিস্টধর্ম্মাবলম্বী যুবক-যুবতীরা গির্জায় গিয়ে বিয়ের কাজ সম্পাদন করে এবং গির্জা থেকে বৈধ বিবাহের প্রমাণ পত্র সংগ্রহ করে। পুরুষেরা প্রথম স্ত্রীর বর্তমানে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু প্রথম স্বামীর বর্তমানে স্ত্রী দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করতে পারে না। তবে স্বামীর মৃত্যুর এক বছর পর দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করতে বাধা নিষেধ নেই। উপজাতি সম্প্রদায়ের মতো বিবাহপদ্ধতিতে অচাই বা পুরোহিত মন্ত্রউচ্চারণ করে বিয়ের কাজ সম্পন্ন করে। বিয়ের সময় দুই বোতল মদ এবং একটি মোরগ উৎসর্গ করা হয়। এছাড়া বিবাহে উপস্থিত সকলে ভুড়িভোজন, মদ্যপান, নাচ, গান ইত্যাদির মাধ্যমে আনন্দ উৎসব করে থাকে।

দশম অধ্যায়

লুসাই

ত্রিপুরারাজ্যে বসবাসকারী লুসাই এবং কুকি সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশ সামঞ্জস্য দেখা যায় এবং একই জাতিভুক্ত বলে মনে করা হয়। ত্রিপুরারাজ্যে লুসাই এবং কুকি সম্প্রদায়কে পূর্বে একই সঙ্গে গণনা করা হত। লুসাইরা সম্ভবত তিব্বত-বার্মা জাতি থেকে উদ্ভূত জনজাতি। বর্ম্মার পৌরাণিক গুহা সিনলুং থেকে লুসাইদের আগমন বলে লোককথা বিদ্যমান। থ্লানর‍্যপা নামে এক শক্তিশালী লুসাই বীর প্রথম মিথুন নামক প্রাণীকে পোষ মানাতে সক্ষম হয় (মিথুন হল গরু এবং বাইসনের সংকর জাত), এই মিথুন লুসাইদের কাছে খুবই প্রিয় ছিল। অন্যদিকে পৌরাণিক কিংবদন্তীর বর্ণনা অনুসারে লুসাই উপজাতি রাজকুমার চীন লং এর বংশধর। চীনলং চীনদেশের রাজবংশ জাত হলেও ঐতিহাসিক চীনের প্রাচীর অতিক্রম করা তাঁর জন্য নিষিদ্ধ ছিল। আসামের কাছাড় জেলার লোকদের কাছে কুকি সম্প্রদায় লুছাই অথবা লুসাই নামে বহুল পরিচিত ছিল। 'লু' শব্দের অর্থ "মাথা" এবং ছাই শব্দের অর্থ "কাটা"। তাই কাছাড় জেলার লোকজনদের কাছে এই উপজাতি "মাথাশিকারী বা মুণ্ড শিকারী" বলে বিশেষ পরিচিত ছিল। "লুসাই" শব্দ পরবর্তী সময়ে "লুছাই" শব্দ থেকে এসেছে এমন ধারণা বিদ্যমান।

বর্তমান লুসাই প্রধানরা "থাং উরা" নামক ব্যক্তির বংশধর যিনি সম্ভবত আঠারশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। থাং উরার পর ছয়টি থাংউর প্রধান যেমন (১) রোকুম (২) জাডেং (৩) থাং লুইয়া (৪) প্যাল্লিয়ান (৫) রিভংগ এবং (৬) সাইলো গোষ্ঠী বিদ্যমান। ঐ সময়ের খাদ্যাভাব, বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীর বিবাদ এবং জুমের জমির খোঁজে সম্ভবত পরবর্তী সময়ে লুসাইরা বার্ম্মাদেশ থেকে স্থানান্তরিত হতে শুরু করে এবং ভারতবর্ষের মিজোরাম, মণিপুর, আসামের কাছাড়, ত্রিপুরা এবং বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করে।

ত্রিপুরারাজ্যের জম্পুই পাহাড় ত্রিপুরা এবং মিজোরামের প্রাকৃতিক সীমানা। এই পাহাড়ে ত্রিপুরার বেশির ভাগ লুসাই উপজাতির বাস। জম্পুই ব্যতীত সাখান পাহাড়ে ও লুসাইদের বসবাস করতে দেখা যায়। ত্রিপুরারাজ্যের জম্পুই পাহাড়ে লুসাই অধ্যুষিত গ্রামগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মনপুই, মনচুয়ান, ত্লাক্সি, ভাঙমুন, বেলিয়ান চীপ, বাংলা, ত্লাংসাং, সাবুয়াল, ফুলডংসি, কোম্পুই, খাম্তলাং এবং সাকান পাহাড়ে লালডিঙ্গাবাড়ি ইত্যাদি। জাম্পুই পাহাড়ে ফুলডংসি গ্রাম ১৯১২ সালে সাইলানপুইয়া সাইলোর পুত্র হ্যারঙ্গভুঙ্গা সাইলো প্রতিষ্ঠা করে। হ্যারঙ্গভুঙ্গা সাইলো সর্বপ্রথম ১৯০৬ সালে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে এবং লুসাই পাহাড়ে ১৯১১ সালে দুর্ভিক্ষের সময় প্রায় ৩০০ জন লুসাইকে সঙ্গে নিয়ে প্রথম লঙ্গাই নদী পার হয়ে ত্রিপুরায় এসে জাম্পুই পাহাড়ের ফুলডংসি গ্রামে বসবাস শুরু করে। তৎকালীন ত্রিপুরার মহারাজকে লুসাইয়া "রেঙ্গপুই" বলে সম্বোধন করত। তৎকালীন ত্রিপুরা মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য

বাহাদুর ১৯২২ সালে হ্যারঙ্গভুঙ্গা সাইলোকে "রাজা" উপাধিতে ভূষিত করেন। হ্যারঙ্গভুঙ্গা সাইলো প্রথম ত্রিপুরায় ১৯১৪ সালে জাম্পুই পাহাড়ে কমলালেবুর চাষের সূত্রপাত করেন। লুসাই রাজা চা এবং কফি চাষ ও জাম্পুই পাহাড়ে শুরু করেন। তৎকালে লুসাই রাজাকে তার এলাকার প্রত্যেক প্রজা প্রতি বছর ছয় টিন (৭২ কিলোগ্রাম) জুম ধান রাজস্ব হিসাবে প্রদান করত। লুসাই রাজার ঐ সময়ে ১২০ জন ক্রীতদাস ছিল। ১৯৩১ সালের ১৮ মার্চ থাংলুরা নামক এক লুসাই ডাক্তার লুসাই, কুকি এবং রিয়াংদের পক্ষ থেকে উত্তর ত্রিপুরায় ফটিকরায়ে তৎকালীন ত্রিপুরা মহারাজের দেওয়ান বাহাদুর বি. কে. সেন মহাশয়ের সংবর্ধনা সভায় উল্লেখ করেন, ডারলং কুকিরা প্রায় গত এক শতাব্দী ধরে এই অঞ্চলে বসবাস করে আসছে। এবং কৃষিকাজই (জুম চাষ) তাদের প্রধান জীবিকা, ঐ সময়ে লুসাইরা স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং কৃষিবিজ্ঞান সম্পর্কে সচেতন ছিল এবং মাননীয় দেওয়ান বাহাদুরের কাছে আবেদন করেছিল ঐ এলাকার উপজাতি একজন ছাত্রকে এল. এম. এফ (ডাক্তারী) এবং একজনকে কৃষি পরিদর্শক (এগ্রিকালচার ইন্সপেকটর) এর ট্রেনিং এ পাঠানোর জন্য। ১৯৭১ সনের জনগণনার পরিসংখ্যানে দেখা যায় ত্রিপুরা রাজ্যের জাম্পুই পাহাড় লুসাইদের প্রধান বাসভূমি এবং লুসাইদের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা মহিলাদের সংখ্যা বেশি (পুরুষ-১৯২২, মহিলা-২৪৬৬) মোট লুসাই জনসংখ্যা = ৪৩৮৮ জন।

ভাত লুসাইদের প্রধান খাদ্য। লুসাই পরিবার দিনে তিনবার সাধারণত সকাল, দুপুর এবং সন্ধ্যা সময় ভাত খায়। যারা জুমে কাজ করে তারা সকাল বেলা বাড়িতে ভাত খায়। কলাপাতা দিয়ে জড়িয়ে দুপুরের ভাত জুমে নিয়ে খায় এবং জুমের কাজ শেষ করে বিকেল ৩-৪টার মধ্যে বাড়ি ফিরে আসে এবং সন্ধ্যা ৫টার সময় রাত্রের ভাত খেয়ে নেয়। যারা জুমে কাজ করে না তারা দিনে দুবার সকালে এবং সন্ধ্যা সময় ভাত খায়। দুপুরবেলা বাড়িতে ভুট্টা সিদ্ধ, শিমুল আলু সিদ্ধ ইত্যাদি খায়। ত্রিপুরারাজ্যে বসবাসকারী লুসাইদের সর্ব্বভূক বলা যায়। কারণ, যে কোন বন্য পশুপাখী শিকার করে খেতে অভ্যস্ত। জাম্পুই পাহাড়ের ওপর লুসাই গ্রামের আশপাশে কোন প্রকার বন্য পশুপাখী আজকাল নজরে পড়ে না। কারণ লুসাইরা এইগুলি শিকার করে শেষ করে দিয়েছে।

লুসাইরা চা, কফি ইত্যাদি পান করে। মদ পান শুধুমাত্র অবসর সময়ে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে করে থাকে। জাম্পুই পাহাড়ে বসবাসকারী লুসাই পরিবারগুলি দেশীমদ নিজেদের বাড়িতে তৈরি করে না। প্রয়োজনে পার্শ্ববর্তী রিয়াংদের কাছ থেকে মদ সংগ্রহ করে খায় এবং অবস্থাপন্ন লুসাই পরিবারের লোকজন বাজার থেকে বিলেতি মদ ক্রয় করে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে নিরিবিলি পান করে।

লুসাইদের মধ্যে ধূমপান অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীনকালে লুসাই সম্প্রদায় জুমে অথবা বাড়িতে উৎপাদিত কড়া তামাক পাতার সরাসরি চুরুট তৈরি করে ধুমপানে অভ্যস্ত ছিল। বাঁশের বা পিতলের তৈরী বিশেষ ধরণের পাইপ ব্যবহার করে

ও দখিন লুসাইরা ধূমপান করে। পুরুষ, মহিলা এবং ছেলে মেয়ে সকলে ধূমপানে অভ্যস্ত। তবে আজকাল চিরাচরিত কড়া তামাকের চুরুট অথবা পাইপে ধূমপান করার চেয়ে বাজার থেকে অথবা স্থানীয় দোকান থেকে বিড়ি, সিগারেট ক্রয় করে ধূমপানে অধিক অভ্যস্ত। এছাড়া লুসাইদের মধ্যে খৈনি ব্যবহারের প্রচলনও আজকাল পরিলক্ষিত হয়।

লুসাই উপজাতি শক্তিশালী, গায়ের রঙ ফর্সা, পুরুষ এবং মহিলার গড় উচ্চতা যথাক্রমে ১৬১ সেমি এবং ১৫১ সেমি এবং গড় ওজন যথাক্রমে ৫২ কিলোগ্রাম এবং ৪৬ কিলোগ্রাম। পুরুষের ঘাড়, হাত ও পায়ের মাংসপেশী বেশ উন্নত। মহিলারা আধুনিক প্রসাধনী দ্রব্যসামগ্রী ব্যবহার করে। মহিলারা চুল লম্বা রাখে। তবে কোনো প্রকার অলংকার পরে না। জাম্পুই পাহাড়ে বসবাসকারী লুসাই সম্প্রদায় সুস্বাস্থ্য সম্পর্কে বিশেষ সচেতন। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন থাকতে পছন্দ করে। বাড়িতে তারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে খাওয়ার জল ফুটিয়ে অথবা ফিলটারের মাধ্যমে পরিস্রুত করে পান করে।

ত্রিপুরা রাজ্যে জাম্পুই পাহাড়ে বসবাসকারী অবস্থাপন্ন লুসাইদের ঘর কাঠের দ্বারা তৈরি এবং কাঠের খুঁটির ওপর টং ঘর বিশেষ, বেশির ভাগ লুসাই ঘরের ওপর টিনের ছাউনি বিদ্যমান এবং চারপাশে টিনের চোঙ লাগিয়ে এক জায়গায় টিনের ওপরের জল সংগ্রহের ব্যবস্থা দেখা যায়। মধ্যবিত্ত লুসাই পরিবারগুলির ঘর কাঠের টংঘর হলেও চার পাশে বাঁশের বেড়া দ্বারা ঘেরা। আজকাল কিছু কিছু বাড়িতে ইটের কাজও দেখা দেয়। লুসাইদের ঘরে কাঠের আসবাবপত্র পরিলক্ষিত হয়। রান্নাঘর লুসাই পরিবারের প্রাণকেন্দ্র। রান্নাঘরে বড় উনুন বিদ্যমান। শীতের সময় পরিবারের সকলে উনুনের পাশে বসে বিশেষ করে রাত্রে তাপ গ্রহণ করে, আড্ডা মারে, গল্প গুজবকরে সময় কাটায়। রান্না ঘরে বাঁশের বা কাঠের তাক বিদ্যমান, যার মধ্যে বিভিন্ন রান্নার জিনিসপত্র সাজিয়ে রাখা হয়। অনেক পরিবারে রান্না ঘরের এককোণে কোমর তাঁতের সরঞ্জাম থাকে যা মহিলারা অবসর সময় কাপড় বোনার জন্য বহুল ব্যবহার করে থাকে। চাউল এবং বিভিন্ন প্রকার শাকসব্জী বাঁশের বিভিন্ন ধরণের খাঁচার মধ্যে রান্নার ঘরেই মজুদ করে রাখা হয়। রান্না ঘরের পিছনের দিকে একটি উঁচু বাঁশের বা কাঠের মাচা থাকে এবং রান্নাঘরের আবর্জনা, তরকারির খোসা ইত্যাদি এবং বাসনপত্র ধোয়া এবং খাওয়ার পর মুখ ধোয়ার জন্য এই মাচা বহুল ব্যবহৃত হয়। এই মাচার নীচে এবং আশপাশ নোংরা থাকে এবং বাড়ির শূকরগুলি প্রায় সবসময় এই স্থানে আনাগোনা করে। প্রতিটি লুসাই বাড়িতে ঘরের মধ্যে ধর্মীয় ছবি, ভগবান যিশুখ্রিস্টের বাণী ইত্যাদি দেওয়ালে কম বেশি পরিলক্ষিত হয়। ঘরের দরজায় এবং জানলায় কাপড়ের পর্দাও কম বেশি দেখা যায়। অবস্থাপন্ন লুসাইদের বাড়িতে টেলিফোন, সেলাই মেশিন, প্রেসার কুকার, রেডিও, টি.ভি, ভি.সি.পি, ভি.সি.আর, টেপ রেকর্ডার, মোটর সাইকেল, স্কুটার এমন কি মোটর গাড়ি ইত্যাদি ও নজরে পড়ে।

লুসাই মেয়েরা তাঁতে তৈরি সুনক্সাপূর্ণ পাছড়া কোমরে জড়িয়ে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ঢেকে পরিধান করে এবং গায়ে শার্ট বা জামা পরে। পুরুষেরা প্যান্ট শার্ট

পরে মাথায় বাঁশের বা কাপড়ের টুপি পরে। লুসাই পুরুষদের চিরসঙ্গী কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ। এই ব্যাগ শক্ত কাপড় দিয়ে তৈরি করা হয় এবং নানাধরণের কারুকার্য খচিত। লুসাইরা কাপড়ের ব্যাগের মধ্যে করে নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তুসামগ্রী যেমন তামাক ছুরি, ধূমপানের নল, এবং ঐ দিনের প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে বহন করে। শীতের সময় কোট, সোয়েটার পরে এবং মেয়েরা চাদর পরে। আধুনিক লুসাই ছেলেমেয়েরা পাশ্চাত্ত্য ধাঁচের পোশাক পড়ে। লুসাই মেয়েরা পাছড়া, ব্লাউজ, সুয়েটার, শাল ইত্যাদি ব্যবহার করে। মেয়েরা লেডিস ছাতা বহুল ব্যবহার করে। মেয়েরা কোনো প্রকার অলংকার পরিধান করে না। আধুনিক ছেলেমেয়েরা পাশ্চাত্ত্য দেশের অনুকরণে চুল ছাঁটে কিন্তু বিবাহিত মহিলারা লম্বা চুল রাখে। বিবাহিত লুসাই মহিলারা শাল পিঠের ওপর ঝুলিয়ে ছোট বাচ্চাদের পিঠের ওপর ঘুম পাড়ায়। বিবাহিত মহিলারা রূপচর্যায় আগ্রহ অবিবাহিত মেয়েদের অপেক্ষা কম দেখায়। লুসাই মেয়েদের পাছড়া, বালিশের ওয়ার, বেডকভার, টেবিল চেয়ারের ঢাকনা, কাপড়-চোপড়ের নক্সার মধ্যেও পাশ্চাত্ত্য দেশের ছাপ পরিলক্ষিত হয়।

লুসাইদের মধ্যে বাল্য বিবাহ দেখা যায় না। তবে যে-কোনো পুরুষ যে কোনো মহিলাকে বিবাহ করতে পারে। আজকাল রিয়াংদের সঙ্গেও লুসাইদের বিবাহ হয়। তাদের বিবাহ খ্রিস্ট ধর্মমতে গির্জায় সম্পন্ন হয়। বিবাহ বিচ্ছেদ লুসাই সম্প্রদায়ের মধ্যে গ্রহণযোগ্য। তবে স্ত্রীর কোনো দোষ না থাকলে যদি স্বামী বিবাহ বিচ্ছেদ করে তবে প্রথম স্ত্রীকে স্বামী টাকা দিতে বাধ্য।

ত্রিপুরারাজ্যে বসবাসকারী লুসাই সম্প্রদায় খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী। রবিবারে লুসাই পাড়ায় বসবাসকারী সকলে ছুটির মেজাজে থাকে এবং গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা করে। এছাড়া বুধবার ও বৃহস্পতিবারেও গির্জায় যায়। গির্জায় প্রার্থনা করার সময় সকলে সমবেত সুরে গান গায়। লুসাইদের গান-বাজনার মধ্য ও পাশ্চাত্ত্য সুর, ড্রাম এবং গিটার ইত্যাদির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। ত্রিপুরারাজ্যে বসবাসকারী সমস্ত লুসাই উপজাতিদের প্রধান পর্বের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ক্রিশ্চমাস অর্থাৎ খ্রিস্ট জন্মোৎসব বা বড়দিন পর্ব, গুড ফ্রাইডে অর্থাৎ যিশু খ্রিস্টের ক্রুশে বিদ্ধ হওয়ার দিবস এবং যিশুর পুনরভ্যুত্থানের পর্ব ইত্যাদি। বড়দিনের পর্বে লুসাই উপজাতি প্রত্যেক পরিবার থেকে চাঁদা তুলে বড় শূকর, মহিষ ইত্যাদি কাটা হয়। প্রত্যেক বাড়ী থেকে ভাত রান্না করে কলাপাতা দিয়ে জড়িয়ে পিকনিক স্পটে জলাধারের নিকট সকলে মিলিত হয়। বড় পাত্রে মাংস সিদ্ধ করা হয় এবং সকলে মিলেমিশে খায়, গান গায়। জাম্পুই পাহাড়ে প্রতি লুসাই পাড়ায় ইয়ুথ ক্লাব বিদ্যমান। ক্লাবের সদস্যরা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ কর্মের সঙ্গে, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, গান-বাজনা ইত্যাদির মাধ্যমে আমোদ প্রমোদ করে।

ত্রিপুরারাজ্যে লুসাই অধ্যুষিত গ্রামগুলির মধ্যে এবং আশপাশে জুম চাষ, ফলের বাগান, ঘরোয়া সব্জী বাগান, গৃহপালিত পশুপাখি পালন, বন জঙ্গল থেকে খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করে জীবন ধারণ প্রধানত পরিলক্ষিত হয়। ত্রিপুরায় বসবাসকারী লুসাই

বাজার থেকে বাড়ির পথে

গ্রামের কুমড়ো বিক্রি (আমবাসা)

উপজাতি অধ্যুসিত এলাকায়
শুকর বাজার (আমবাসা)

গ্রামের সবজি বিক্রি (হালাহালি)

উপজাতি সম্প্রদায় চাষের মাধ্যমে যে সকল কৃষিজ ফসল উৎপাদন করে সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—ধান (বুহ), বিনি ধান (বুহবন), কাওনধান (বুহলান), ভুট্টা (ভাইমিন), অড়হর (বেহলিং), কুমড়ো (মাই), লাউ (উমেই), চালকুমড়ো (মাইপাওন), ঝিঙ্গা (অ্যামপাওঙ্গ), চিচিঙ্গা (বেরুল), করলা (চাঙখা), বেগুন (ব্যওখ্যাওন), সীম (বেপুই), বরবটী (বেহলই), ট্যমাটো (সপবাউক বাউন), কচু (বল), শশা (ফ্যাঁঙমা), ঢ্যাঁড়স (পানালা), মরিচ (হমরছা), মিষ্টি আলু, (কালবাহরা), খাম আলু (বাশরা), আদা (সহথিং), হলুদ (এ্যইঙ্গ), তরমুজ (ড্যাওনফঔ), সরিষার ফুল (অ্যানতামপর), চা (থিংপুই), কমলা (সেরথলাম), লেবু (সেরথুর), বাতাবিলেবু (সেরপুই), কলা (বাল্‌লা), তুঁত (থেইমেক), আম (থেইহাই), আনারস (লগুইথেই) ,পেঁপে (নুহলাম), তেঁতুল (টেঙ্গফেরে) ইত্যাদি।

জাম্পুই পাহাড়ের লুসাই উপজাতি প্রধানত জুমচাষ, কমলালেবু এবং আদার চাষ করে থাকে। জাম্পুই পাহাড়ের ঢালু জমিতে জুম এবং কমলালেবু চাষ অধিক পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেক বছর জুম চাষের আগে ভিলেজ কাউন্সিল সকল গ্রামবাসীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা ক্রমে স্থির করে এই বছর পাহাড়ের কোন চালে জুম চাষ করা হবে। জুমের জমি নির্বাচনের জন্য বাঁশ বনকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। একবার বাঁশ বন কেটে জুম করা হলে পাঁচ বছর সময় নেয় বাঁশ বন পুনরুজীবিত হতে এবং মাটিতে আবার জৈব পদার্থে ভরপুর হতে। জুম জমি নির্বাচন পর্বশেষ হলে নির্বাচিত স্থানকে তিন ধরণের যেমন বড়, মাঝারি এবং ছোট প্লটে বিভক্ত করা হয়। অনুরূপ ভাবে ঐ বছর জুম চাষে ইচ্ছুক জুমিয়া পরিবারগুলিকেও পরিবারের লোক সংখ্যা অনুযায়ী বড়, মাঝারি এবং ছোট পরিবারে চিহ্নিত করা হয়। তারপর বিভিন্ন গ্রুপের জুমিয়া পরিবারগুলির মধ্যে লটারির মাধ্যমে ঠিক করা হয় কোন পরিবার কোন প্লটে জুমচাষ করবে। যদি কোনো পরিবার লটারির মাধ্যমে প্রাপ্ত প্লটে পরবর্তী সময় জুম চাষ করতে অনিচ্ছুক হয় তবে ঐ প্লট নিলাম করে দেওয়া হয়। কিন্তু পাহাড়ের যে সকল স্থানে বাঁশবন নেই, সেই সকল জমিতে লটারির মাধ্যমে জমি বিতরণ করার নীতি নেই। জে. শেক্সপিয়ার ১৯১২ সালে লক্ষ্য করেছিলেন ধান, তুলো, কুমড়ো, খাম আলু ইত্যাদির বীজ লোহার তৈরি হাতিয়ারের সাহায্যে ছোট ছোট গর্ত করে ঐ সময় জুমে বপন/রোপণ করত। জাম্পুই পাহাড়ে জুম চাষের জন্য বনজঙ্গল কাটা হয় পৌষ-মাঘ মাসে, ফাল্গুন-চৈত্র মাসে আগুন দিয়ে শুকনো বন জঙ্গল পোড়ানো হয়। বৈশাখ মাসের প্রথম পক্ষকালে জুম বীজ বপন করা হয়। বৈশাখ থেকে আশ্বিন মাসের মধ্যে প্রয়োজন অনুসারে তিন-চার বার আগাছা বাছাই করা হয়। জুমের ফসলের মধ্যে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে ভুট্টা এবং শাকসব্জী তোলা শুরু হয়, ভাদ্র-আশ্বিন মাসে ধান এবং কার্ত্তিক মাসে অন্যান্য ফসল তোলার কাজ চলে।

যে সকল জমিতে বাঁশ বন নেই ঐ সকল জমিতে লুসাই উপজাতি ধান ব্যতীত অন্যান্য ফসল যেমন আদা, কমলালেবু ইত্যাদির চাষ করে থাকে। লুসাই সম্প্রদায় জুম চাষ, আদা, সাতকরা, এবং কমলালেবুর বাগান করা ব্যতীত পার্শ্ববর্তী জঙ্গল থেকে বিশেষ করে বর্ষাকালে বাঁশ করুল, বুনোফল, শাকসব্জী, মধু ইত্যাদি সংগ্রহ করে। এছাড়া দূরদূরান্তে গিয়ে বন্য পশুপাখি যেমন হরিণ, বুনোছাগল, বুনো মোরগ বিভিন্ন ধরণের পাখী শিকার করে। বন্য প্রাণী বন্দুক দিয়ে অথবা ফাঁদ পেতে শিকার করে। লুসাই ঘরবাড়ির আশপাশে তামাক, চা, কফি, ইত্যাদি নেশাজাত ফসল কম বেশি দেখা যায় এবং কমলা গাছ ও বাড়ির মধ্যে চোখে পড়ে। লুসাই উপজাতি পুষ্পপ্রেমী, প্রতিটি বাড়িতে ফুলের কদর খুব বেশি। লুসাই বাড়িতে ঘরের সামনে অথবা পাশে অথবা বাড়ির সীমানায় রাস্তার ধারে রকমারি ফুলগাছ এবং অর্কিড দেখা যায় এবং বাড়ির পেছনে ঘরোয়া সব্জী বাগান বিদ্যমান। শেক্সপিয়ার ১৯১২ সালে লুসাই উপজাতির প্রধান জীবিকা কৃষি অর্থাৎ জুম চাষকে চিহ্নিত করেছিলেন। বর্তমানে কৃষিকাজ যেমন জুমচাষ, কমলাবাগান, আদা ও শাকসব্জী চাষ ব্যতীত, কৃষি শ্রমিক, সরকারি চাকুরি, ব্যবসাবাণিজ্য ইত্যাদি জীবন জীবিকাও পরিলক্ষিত হয়। ব্যবসাবাণিজ্যের মধ্যে কন্টেকটর, রেশন শপ ডিলার, সুদে টাকা লগ্নী করা বা মহাজনি করা, পশুপাখি পালন এবং গাড়ির ব্যবসা ও করে থাকে। লুসাইদের জুমে প্রধান ফসল ধান, শাকসব্জী, লংকা, তুলো, আদা এবং কচু ইত্যাদি। ধান এবং শাকসবজী প্রধানত নিজেরা খাওয়ার জন্য বহুল ব্যবহার করে। লংকা, তুলো এবং আদা বাজারে বিক্রি করে। লুসাইরা জুমের ধান প্রধানত "জেম" নামক এক ধরণের বাঁশের তৈরি খাঁচার মধ্যে মজুদ করে। এই বাঁশের তৈরি ধান মজুদ ভাণ্ডার সমতলবাসীর ধান মজুদের "ডোলের" অনুরূপ। অন্যদিকে জুমে উৎপাদিত সব্জী কুমড়ো, খাকলু, লংকা, ভুট্টা, ইত্যাদি বাঁশের তৈরি মাচার উপর মজুদ করে রাখে।

লুসাই মহিলারা জুমের ফসল, বনজঙ্গল থেকে লাকড়ি, শাকসবজী, জলের হাঁড়ি, কলসি ইত্যাদি বাড়িতে পরিবহণ করার জন্য অথবা বাজারজাত দ্রব্যসামগ্রী পরিবহণের জন্য মাথায় এবং পিঠে ঝুলিয়ে এক বিশেষ ধরণের বাঁশের খাঁচা "থুল" ব্যবহার করে। এই বাঁশের খাঁচাগুলি ত্রিপুরারাজ্যের অন্যান্য উপজাতিদের ব্যবহৃত বাঁশের খাঁচা অপেক্ষা স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। লুসাই বাঁশের খাঁচার তলায় বাঁশের খুঁটির চারটি পা বিদ্যমান : খাঁচার তলার দিক একবর্গফুট এবং উপরের গোলাকার খোলা অংশের ব্যাস প্রায় ৩০ ইঞ্চি এবং উচ্চতা প্রায় ৩ ফুট। জাম্পুই পাহাড়ের লুসাই পরিবারগুলি কম পক্ষে ০.৪ একর এবং ঊর্ধ্বে ৪ একর জমিতে জুম ধান চাষ করে এবং পরিবার পিছু ন্যূনতম এক কুইন্টাল থেকে তিন টন পর্যন্ত ফলন পায়। বর্তমানে লুসাই উপজাতি জুম ফসলে সার ব্যবহার করে এবং রোগ-পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য রোগ ও পোকার ঔষধও ব্যবহার করে। জম্পুইয়ের লুসাই উপজাতি কমলা প্রধানত মহাজনদের বা ব্যাপারীর কাছে বিক্রি করে। মহাজনেরা সাধারণত ভাদ্র মাসে কমলা বাগান ঘুরে

ফিরে দেখে এবং বাগানের মালিককে অগ্রিম কিছু টাকা দিয়ে কথাবার্তা পাকা করে, বাকি টাকা স্বর্থ অনুসার ফসল সংগ্রহের সময় দেয়। মহাজন এবং বাগানের মালিকদের মধ্যে মোটামুটি ভাল সমঝোতা থাকায় একই মহাজনের কাছে একই কমলা বাগানের মালিক বছরের পর বছর বিক্রি করে থাকে। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন জাম্পুই পাহাড়ের পুরাতন কমলা বাগানগুলির ফলন কমে যাচ্ছে। এর প্রধান কারণ সঠিক যত্ন পরিচর্যার অভাব, এছাড়া সার ও রোগ-পোকার ঔষধ ও লুসাই উপজাতি সরকারি সাহায্য ব্যতীত ব্যবহার করতে চায় না। ঠিকমত যত্ন পরিচর্যা, সঠিক পরিমাণ সার, সময়মত প্রয়োগ এবং রোগ-পোকামাকড়ের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। অন্যদিকে বহু পুরাতন বাগানের ফল উৎপাদনে অক্ষম গাছগুলি অপসারিত করে নূতন বাগান গড়ে তোলা প্রয়োজন।

বর্তমানে লুসাই উপজাতি শূকর, ছাগল, মুরগী এবং গরু পালন করে। তবে বেশির ভাগ গৃহপালিত পশুপাখি লুসাইরা নিজেদের খাওয়ার জন্য পুষে থাকে সাধারণত বাজারে বিক্রি করে না।

অন্যদিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় জাম্পুই পাহাড়ে লুসাই সম্প্রদায় ব্যতীত রিয়াং উপজাতি সম্প্রদায়ও বহুল বসবাস করে। বর্তমানে জাম্পুই পাহাড়ের আশাপাশে বসবাসকারী বেশির ভাগ রিয়াং উপজাতি ধর্মান্তরিত হয়ে হিন্দুধর্ম থেকে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে এবং লুসাই নামে পরিচিতি লাভ করছে। ধর্মান্তরিত, লুসাই নাম ও পদবিধারী রিয়াং উপজাতি সম্প্রদায় ও স্থানীয় ভিলেজ কাউন্সিলের সদস্যপদ পায় এবং জুম চাষের জমি বণ্টনের সময় লটারিতে অংশগ্রহণ করে। যদিও বেশির ভাগ রিয়াং সম্প্রদায় খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে লুসাই নামে পরিচিতি লাভ করে তথাপি ও লক্ষ্য করলে দেখা যায়, রিয়াংরা লুসাইদের বাড়ীতে দিনমজুরি করে জীবিকা নির্বাহ করে। এছাড়া রিয়াংলুসাইয়া বাঁশ বন ব্যতীত অন্যান্য বনজঙ্গল পরিষ্কার করে জুম চাষ করে, ফলে, ফলন কম পায়। জাম্পুই পাহাড়ে বসবাসকারী রিয়াং-লুসাই এবং লুসাইদের মধ্যে লুসাইরা অর্থনৈতিক দিক থেকে রিয়াংদের তুলনায় অগ্রসর। কারণ লুসাইদের জুমের জমির ফলন রিয়াং-লুসাইদের জুম অপেক্ষা অধিক হয়। লুসাই সম্প্রদায় বেশির ভাগ কমলাবাগানের মালিক এবং কমলা বিক্রি করে রিয়াংদের অপেক্ষা অধিক আয় করে। লুসাইরা রিয়াংদের শ্রম ব্যবহার করে কিন্তু রিয়াংরা লুসাইদের শ্রম পায় না। লুসাইরা কৃষিজ ফসল উৎপাদন ব্যতীত অন্যান্য কাজ যেমন রেশনসপের ডিলারশিপ, যানবাহনের ব্যবসা, কন্ট্রাকটর, দোকান পাট চালানো, সুদে টাকা খাটানো ইত্যাদির মাধ্যমে রিয়াংদের অপেক্ষা অধিক আয় করে। মোট কথা জাম্পুই পাহাড়ে বসবাস কারী রিয়াংলুসাইদের মাথা পিছু আয় লুসাইদের অপেক্ষা কম এবং লুসাইদের মধ্যে শিক্ষিতের হার তুলনামূলক ভাবে অনেক বেশি।

❒ একাদশ অধ্যায়

উচই

রূপকথার বর্ণনা অনুসারে যে উপজাতি সম্প্রদায় রিয়াং উপজাতি সম্প্রদায়ের পশ্চাদ্‌পদ অনুসরণ করে ত্রিপুরায় আসে তাদেরকে "উলছই" বলা হত। ককবরক ভাষায় "উল্ল" অর্থাৎ পশ্চাদ "ছই" অর্থ অনুসরণ। পরবর্তী সময়ে উলছই শব্দ উচ্চারণে বিকৃত হয় উছই বা উচুই বা উচাই বা উচই নামে পরিচিতি লাভ করে। অন্যমতে যে উপজাতি সম্প্রদায় উচ্ছার বংশধর তাদেরকে উচই বলা হয়। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, প্রাচীনকালে ত্রিপুরার কোন এক মহারাজার সঙ্গে পার্শ্ববর্তী আরাকান রাজার যুদ্ধ হয়েছিল। যুদ্ধে কিছু সংখ্যক বন্দী ত্রিপুরার সৈন্য আরাকান রাজার বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয় এবং আরাকান রাজ ত্রিপুরার সৈন্যদের তার রাজ্যে বসবাস করার অনুমতি দেয়। ফলে, ত্রিপুরার সৈন্যরা আরাকানবাসীদের সঙ্গে মিলেমিশে বংশ বৃদ্ধি করে যে উপজাতি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করে, তারা হল উচই। এই সম্প্রদায় আরাকানের উঁচু পাহাড় গং দ্রং এ বসবাস করত। একদিন উচইদের এক বিবাহ ভোজকে কেন্দ্র করে আরাকান রাজার সৈন্যরা উচইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করলো। আরাকান সৈন্যদের অত্যাচারে গং দ্রং পাহাড়ের ওপর বসবাসকারী সমস্ত জনজীবন স্তব্ধ হয়ে যায়। আরাকান রাজার ছোট বোন এই খবর পেয়ে ঐ পাহাড়ে গিয়ে দুই শিশুপুত্রকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করে এবং নিজ ঘরে এনে পুত্রস্নেহে লালন পালন করে। এই দুই শিশুর নাম রাখেন যথাক্রমে "উচ্ছা" এবং "রিংসা"। এই উচ্ছা এবং রিংসার বংশ ধরেরা হল যথাক্রমে উচই এবং রিয়াং। তাই অনেকের ধারণা উচই এবং রিয়াংরা হল দুই ভাইয়ের বংশধর। এই কারণে উচই এবং রিয়াং সম্প্রদায়ের উপজাতি গোষ্ঠীগুলির মধ্যে ভাষা, আচার অনুষ্ঠান এবং সংস্কৃতির সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় রিয়াং সম্প্রদায়ের "হজাগিরি" বা লক্ষ্মী পূর্ণিমার পূজা উচই সম্প্রদায়ের মধ্যেও দেখা যায়।

ত্রিপুরার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোরমাণিক্য বাহাদুরের রাজত্বকালে উচই সম্প্রদায় পার্বত্য ত্রিপুরায় প্রবেশ করে এবং দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনীয়া মহকুমার চড়কবাই অঞ্চলে প্রথম বসতি স্থাপন করে। এমনও শোনা যায়, চড়ক বাই এর নামের কারণ উচই সম্প্রদায়ের পুনর্বাসনের সময় তাদের একজনের হাত থেকে একটি মাটির সরা (পাতিলের ঢাকনা) মাটিতে পড়ে ভেঙ্গে যায়। উচই ভাষায় "স্রক" শব্দের অর্থ "সরা" আর "বাই" শব্দের অর্থ হল "ভেঙ্গে যাওয়া"। তাই যে স্থানে মাটির সরা ভেঙ্গে ছিল সেই স্থানের নামকরণ হয় "স্রকবাই"। "স্রকবাই" শব্দ পরবর্তী সময়ে উচ্চারণে বিকৃত হয়ে চড়কবাই নামে পরিচিতি লাভ করে। এই চড়কবাই থেকে উচই সম্প্রদায় পার্শ্ববর্তী মুহুরীপুর এবং রতনপুরে ছড়িয়ে পড়ে।

ডারলং কুকি আনারস চাষে পারদর্শী

অন্যদিকে জুমের জমির খোঁজে চড়কবাই থেকে উচই সম্প্রদায় অমরপুর মহকুমার তীর্থমুখ, চেলাগাং, যতনবাড়ি, শান্তিনগর, রাঙ্গাছড়া, পশ্চিম ডেপাছড়া ইত্যাদি অঞ্চলে এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুর মহকুমার দশদা এবং পার্শ্ববর্তী জাম্পুই পাহাড়ের নীচে বসতি স্থাপন করে। তাই আজও ত্রিপুরারাজ্যের বিলোনীয়া, অমরপুর এবং কাঞ্চনপুর মহকুমায় উচই উপজাতি জনগোষ্ঠী অধিক সংখ্যায় বসবাস করতে দেখা যায়। বয়স্ক উচই উপজাতিদের কারো কারো মতে প্রাচীনকালে পার্বত্য চট্টগ্রামে "দুয়ারপাথর" নামক এক স্থান হল উচইদের প্রাচীন বাসভূমি। দুয়ার পাথর থেকে তারা রামানন্দ উচই সর্দারের নেতৃত্বে উনিশ শতকের প্রথমদিকে ত্রিপুরারাজ্যে আসে। উচই উপজাতির মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ এবং খ্রিস্টান ধর্মের প্রভাব বর্তমানে পরিলক্ষিত হয়। আবার হিন্দু উচই সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী লোকজনও দেখা যায়। ত্রিপুরারাজ্যে উচই উপজাতির সংখ্যা খুবই কম। ত্রিপুরারাজ্যে ১৯৬১, ১৯৭১ এবং ১৯৮১ সালে মোট উচই উপজাতির জনসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৭৬৬, ১০৬১ এবং ১২৯৫ জন। অন্যদিকে ১৯৮৭ সনে উচই উপজাতি জুমিয়া পরিবারের সংখ্যা ছিল মাত্র ৯৪ পরিবার। সম্পূর্ণ জুমিয়া পরিবারগুলি দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় বসবাস করে এবং মোট জুমিয়া উচই সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৪২৬ জন।

ত্রিপুরারাজ্যে বসবাসকারী উচই উপজাতি মঙ্গোলীয়দের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। এদের নাক চ্যাপ্টা, চোখ ছোট, মুখমণ্ডলে এবং বুকে লোম কম। এরা ত্রিপুরার ককবরক ভাষায় কথা বলে।

উচই উপজাতির পুরুষেরা নিম্নাঙ্গে "কাঁসা" ব্যবহার করে এবং গায়ে জামা (খুতাইতাক বরক) পরিধান করে। মহিলারা কোমরে জড়িয়ে পাছড়া (রিগলাই) এবং গায়ে বক্ষাবরণী (রিসা) অথবা ব্লাউস ব্যবহার করে। উচই সম্প্রদায়ের মহিলারা গলাভর্তি পুতির মালা পরে এবং এক ছড়া টাকার মালা পরে।

অন্যদিকে রিয়াং মহিলারা গলাভর্তি টাকার মালা ব্যবহার করে। রিয়াং মহিলাদের কোমরে জড়িয়ে পরিধানের কাপড় বা পাছড়া উচই মহিলাদের পাছড়া অপেক্ষা পাশে ছোট। অর্থাৎ রিয়াংদের পাছড়ার পাশ হাঁটুর কাছাকাছি থাকে কিন্তু উচইদের পাছড়া (রিগলাই) কোমর থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে থাকে। এছাড়া উচই রমণীরা মাথায় পাগড়ির ন্যায় জড়িয়ে কাপড় ব্যবহার করে, মাথার চুল লম্বা রাখে, খোপা বাঁধে এবং চুলের মধ্যে ফুল গুঁজে সাজে। উচই শিশুরা ৪-৫ বছর পর্যন্ত উলঙ্গ ঘোরাফেরা করে। বালকেরা কর্টিবস্ত্র পরিধান করে এবং মেয়েরা পাছড়া, রিসা, ব্লাউস পরিধান করে।

উচই পরিবারের প্রায় সকলে ধূমপানে অভ্যস্ত। ধূমপানের ব্যাপারে উচইদের মধ্যে কোনো প্রকার বাছবিচার নেই। মা, বাবা, দাদু, দিদিমা, ছেলে, মেয়ে, নাতিনাতনী সকলে এক সঙ্গে ধূমপান করে থাকে। প্রত্যেক বাড়িতে বাঁশের তৈরি হুক্কা থাকে। আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব বাড়িতে এলে ধূমপানের হুক্কা দিয়ে অভ্যর্থনা জানায়। এছাড়া গল্প

গুজব, বিবাহ অথবা পূজাপার্বণেও উচই উপজাতি ধূমপান করে আমেজ ও আনন্দ উপভোগ করে।

ত্রিপুরারাজ্যে বসবাসকারী অন্যান্য উপজাতি গোষ্ঠীর ন্যায় উচই উপজাতি গোষ্ঠীর জীবনে মদ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ধূমপানের ন্যায়, মদ্য পানেও উচইদের মধ্যে বাছবিচার নেই। ছোট বড় সকলে একসঙ্গে মদ্যপানে অভ্যস্ত। পূজা পার্বণ, জন্ম, মৃত্যু বিবাহ ইত্যাদি সকল অনুষ্ঠানে উচই সম্প্রদায় মিলেমিশে মদ পান করে।

ত্রিপুরার অন্যান্য উপজাতি সম্প্রদায়ের ন্যায় উচইদেরও ভাত প্রধান খাদ্য। উচই উপজাতি ভাতছাড়া বাঁশের করুল (কচি বাঁশের চারা) বন আলু, বুনো মাশরুম, মাছ, মাংস ইত্যাদিও খায়।

রান্না করা তরকারির মধ্যে গুদক বা গোদক বা গদক এবং চাখুয় উচইদের খুবই প্রিয়।

গুদক বা গোদক বা গদক তৈরির জন্য কাঁচা বাঁশের চোঙ্গ যার এক প্রান্ত গাঁট দ্বারা বন্ধ তার মধ্যে কাঁচা তরিতরকারিগুলি এক সঙ্গে কুচি কুচি করে কাটা অবস্থায় সিঁদল (বিশেষ পদ্ধতিতে গাঁজানো পুঁটি মাছ), নুন, মরিচ, জল ঢুকিয়ে চোঙের খোলা মুখ কলাপাতা দিয়ে এঁটে বন্ধকরা হয় এবং বাঁশের চোঙ উত্তপ্ত কাঠ কয়লার ওপর রেখে তরকারি সিদ্ধ করা হয়। তারপর সিদ্ধ করা তরকারি উনুন থেকে নামিয়ে একটি শক্ত বাঁশের কাঠি চোঙের ভিতর ঢুকিয়ে উত্তমরূপে ঘুটে নেওয়ার পর গুদক ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করা হয়।

চাখুয় তৈরির জন্য উচই উপজাতিরা বাঁশ বেতের তৈরি একটি পাত্রে বাঁশের কয়লা নিয়ে তার উপর জল ঢেলে পরিস্রুত জল সংগ্রহ করা হয়। বাঁশের কয়লার মধ্য দিয়ে পরিস্রুত জল ক্ষারধর্মী হয়। এই ক্ষার জল কাঁচা তরকারি, নুন, মরিচ এবং সিঁদল (বেরমা) সহযোগে সিদ্ধ করে চাখুয় রান্না করা হয়। ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাসকারী উচই উপজাতি সম্প্রদায়ের পাড়াগুলিতে একজন "চদিরি" বা চৌধুরী থাকেন। চৌধুরী "চুউাক" অথবা "চ-ক" এবং "দারি" শব্দ থেকে ব্যুৎপত্তি। "চুয়াক বা চ-ক" শব্দের অর্থ "মদ" এবং "দারি" শব্দের অর্থ "ধার্য" করা। তাই যিনি মদ ধার্য করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত তিনিই "চদিরি" বা চৌধুরী। উচই পাড়াগুলি চৌধুরীর নেতৃত্বে গড়ে উঠে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে চৌধুরীর নাম অনুসারে পাড়ার নামকরণ পরিলক্ষিত হয়। উচই সমাজে চদিরি বা চৌধুরী পদ বংশ পরাক্রমে ভোগ করে। গ্রাম্য বিচার যেমন সাধারণ ঝগড়া বিবাদ, চুরি, অসামাজিক কাজকর্ম, বিবাহ বিচ্ছেদ ইত্যাদির বিচার চৌধুরী করে থাকে। চৌধুরীকে সাহায্য করার জন্য "কারবারি" পদ বিদ্যমান। কোনো পাড়ায় চৌধুরীর মৃত্যুর পর চৌধুরীর উপযুক্ত ছেলে না থাকলে "কারবারি" বিচার কার্য পরিচালনা করে থাকে। অথবা পাড়ার সকলে মিলে উপযুক্ত লোককে পাড়ার চৌধুরী নিযুক্ত করে থাকে।

উচই পাড়ায় বিচারপদ্ধতির মধ্যে দেখা যায় বিচারপ্রার্থী ব্যক্তি দু টাকা ফিস চৌধুরীর

কাছে জমা দিয়ে থাকে। চৌধুরী নির্দিষ্ট দিনে নিজ বাড়িতে বিচার সভা ডাকেন। চুরির অপরাধে ৬০ টাকা জরিমানা করা হয়। চোর যদি ঐ টাকা দিতে দেরী করে, তবে দ্বিতীয় বিচারে আরো ৩০ টাকা এবং ২ টাকা বিচার ফিস দোষী ব্যক্তিকে দিতে বাধ্য করা হয়। অর্থাৎ দ্বিতীয় বিচারে (৬০ + ৩০ + ২) = ৯২ টাকা দোষী ব্যক্তি জমা দিবে। চৌধুরী এই টাকা আদায়ের জন্য প্রয়োজনে বিবাদী পক্ষের অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিতে পারে। বিচারে ধার্য আদায়কৃত জরিমানার অর্থের অর্ধেক বাদীকে দেওয়া হয় এবং বাকি অর্ধেক অর্থ চৌধুরী এবং বিচারক মন্ডলীর মধ্যে চিরাচরিত নিয়ম অনুসারে ভাগ বাটোয়ারা করে নেয়। অথবা সকলে একসঙ্গে মিলেমিশে ভুরিভোজে মদ সহ আমোদ ফুর্তির মাধ্যমে ব্যয় করে।

উচই সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের অবৈধ মিলনের জন্য সামাজিক বিচারে ছেলে মেয়েকে ৫টাকা এবং একটি শূকর জরিমানা করা হয়। তারপর সামাজিক নিয়মে বৈধ বিবাহের ব্যবস্থা সম্পাদন করা হয়।

অন্যান্য উপজাতি সম্প্রদায়ের ন্যায় উচই উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যেও বিভিন্ন প্রকারের বিবাহপদ্ধতি, যেমন, কাজের বিনিময়ে বিবাহ, প্রেমের বিবাহ এবং অভিভাবকদের আলাপ আলোচনাক্রমে বিবাহ স্থির হয়ে থাকে। কাজের বিনিময়ে বিবাহ পদ্ধতিতে ভাবী বর কনের বাড়িতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কাজে যোগ দেয়। এই সময় কনে পক্ষ এবং কনে ভাবী বরের স্বভাব চরিত্র, চালচলন ইত্যাদি লক্ষ্য করে যদি বরকে কনে অপছন্দ হয় তবে বিভিন্ন প্রকার ভাবে জব্দ করে বরকে বিয়ের আগে তাড়িয়ে দেয়।

অন্যদিকে বরকে কনের এবং পরিবারের সকলের পছন্দ হলে নির্দিষ্ট সময়ে বিয়ের কাজ সুসম্পন্ন হয়। উচই সম্প্রদায়ের কনেকে বর বিয়ের পণ হিসাবে ৬০ টাকা প্রদান করে থাকে। উচইদের মধ্যে বিধবা বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদের প্রচলন আছে। প্রত্যেক পুরুষ এবং নারী এক বিবাহ করে থাকে। উচই সমাজে দূর সম্পর্কের ভাইবোনের মধ্যে বিবাহে বাধা নেই। তবে ভাইয়ের মৃত্যুর পর ভাইয়ের স্ত্রীকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ। উচই সম্প্রদায়ের সঙ্গে রিয়াং সম্প্রদায়ের বিবাহ ত্রিপুরা রাজ্যে দেখা যায়, উচই সম্প্রদায় রিয়াং সম্প্রদায়ের ন্যায় ঠাকুর দেবতা, ভূত, প্রেতাত্মা, তন্ত্রমন্ত্র, তাবিজ মাদুলি ইত্যাদি বিশ্বাস করে। বিশেষ করে রোগ নিরাময়ের জন্য নতুন বাড়ি ঘর তৈরি, জুম ফসল রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদির জন্য উচইরা বিভিন্ন পূজাপার্বণ করে থাকে।

ত্রিপুরার অন্যান্য জুমিয়া উপজাতিদের ন্যায় উচই সম্প্রদায়ও জুম চাষের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করত। আজকাল বেশির ভাগ সমতলে চাষবাস করে তবে প্রত্যন্ত অঞ্চলে এখনও গোঁড়া এবং আংশিক জুমজীবী উচই পরিবার দেখা যায়। উচই ভাষায় জুমকে বলা হয় ''ওক'' অথবা ''হুউ''। জুমচাষের সময় উচই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের পূজা এবং সংস্কার পালিত হয়। উচই জুমিয়া সম্প্রদায় জুম চাষ কতকগুলি

ধাপে সম্পন্ন করে থাকে। যেমন (ক) জুমের জমি নির্বাচন (খ) নানা ধরণের ধর্মীয় সংস্কার পালন (গ) নির্বাচিত স্থানের বনজঙ্গল কাটা (ঘ) কাটা বনজঙ্গল শুকানো (ঙ) জুম পোড়ানো (চ) পোড়া যায়নি এমন বনজঙ্গল পরিষ্কার করা (ছ) জুমে গাইরিং তৈরি করা। (জ) জুমের বীজ সংগ্রহ (ঝ) বীজ বপন (ঞ) আগাছা বাছাই (ট) কৃষিশত্রুর হাত থেকে ফসল রক্ষা করা (ঠ) ফসল তোলা (ঢ) ফসলের মাড়াই, ঝাড়াই এবং শুকানো (ড) গোলাজাতকরণ (ন) বাজার জাতকরণ ইত্যাদি।

জুমের জমি নির্বাচনের জন্য বর্ষার পর থেকেই উচই উপজাতি পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায়। প্রাথমিক ভাবে বাছাইকৃত জমির মধ্যে "ওয়াখা" অথবা "ওয়াখক" পুঁতে জমির স্বত্ব স্থাপন করে। চিরাচরিত পদ্ধতি অনুসরণ করে উচই জুমিয়ারা নির্বাচিত জুমের এলাকার চার পাশে বাঁশের খুঁটি পুঁতে তার মাথায় আড়াআড়ি দু টুকরো বাঁশ বেঁধে অর্থাৎ ক্রস চিহ্ন তৈরি করে "ওয়াখা" বা "ওয়াখক" স্থাপন করে এবং নির্বাচিত জমির স্বত্ব অন্যদের অবহিত করে। ফলে অন্য কোনো জুমিয়া ওয়াখক পোঁতা স্থানে জুম চাষ করা থেকে বিরত থাকে। জুমের জমি নির্বাচন এবং জুমের জায়গা দখলের এই চিরাচরিত পদ্ধতি ত্রিপুরায় বসবাসকারী পাহাড়ি উপজাতি জুমিয়া পরিবারগুলি নির্দ্বিধায় মেনে চলে। জুমের জমির প্রাথমিক নির্বাচনের পর উচই জুমিয়া সম্প্রদায় স্বপ্নের মাধ্যমে মাটি পরীক্ষা করে থাকে। নির্বাচিত জমি থেকে একটি মাটির দলা সংগ্রহ করে জুমিয়া নিজের বালিসের নীচে রেখে রাত্রে একাকী ঘুমাবে। যদি রাত্রে খারাপ স্বপ্ন দেখে তবে ঐ প্রাথমিক ভাবে নির্বাচিত জমি জুম চাষের অযোগ্য বিবেচিত হয়। আবার সুস্বপ্ন দেখলে জুম দেবতার নামে মোরগ উৎসর্গ করে "অচাই" বা "ওঝা" বা পুরোহিত দ্বারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়, অচাইর (পুরোহিতের) বিচারে ঐ স্থান জুম চাষের 'অনুকূল' রায় পেলে উচই জুমিয়া নির্বাচিত জমিতে জুম চাষের প্রাথমিক কাজ শুরু করে অন্যথায় নূতন জুম জমির খোঁজ চলতে থাকে। তবে অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে জুমের জমি নির্বাচনের কাজ উচই জুমিয়া পরিবার শেষ করে থাকে। জুমের জমি নির্বাচন পর্ব শেষ হলে উচই উপজাতি জুমিয়া সম্প্রদায়ের পুরুষেরা জঙ্গল কাটার কাজ শুরু করে। জুমের জঙ্গল কাটার সময় পাড়ার সকলে পরস্পর শ্রম বিনিময় করে সংঘবদ্ধ হয়ে যৌথভাবে কার্য সম্পাদন করে। শ্রম বিনিময়ের এই প্রথাকে বলে "য়াগুল খিললাইমানি"। জুম কাটার সময় লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বাঁশ, ঝোপঝাড় ইত্যাদি একেবারে মাটি সংলগ্ন স্থানে না কেটে জুম কাটার সময় পাহাড়ের নীচ থেকে শুরু করে ওপরের দিকে অগ্রসর হয়। এমনও শোনা যায় আগেকার দিনে জুমিয়ারা জুম কাটার ব্যাপারে এত দক্ষ ছিল, যে পদ্ধতি অনুসরণ করে বাঁশ এবং অন্যান্য গাছ-গাছড়া কাটার পরও খাড়া অবস্থায় মাটির ওপর দাঁড়িয়ে থাকতো। ফলে উত্তম রূপে শুকানোর সুযোগ পেত। এই জুম কাটার পদ্ধতিকে বলা হত "তাগার হোগা"। জুমিয়াদের ধারণা জুমের কাটা জঙ্গল যত ভাল ভাবে শুকাবে তত ভাল পুড়বে এবং

পর্যাপ্ত পরিমাণ ছাই হয়ে সারের যোগান বৃদ্ধি পাবে। ফলে অধিক ফলন সুনিশ্চিত হয়। সাধারণ ভাবে কাটা বনজঙ্গল, বাঁশ, বুনো কলাগাছ ইত্যাদি যথাস্থানে পড়ে থাকে। পৌষ মাঘ মাসের মধ্যে জুম কাটার কাজ শেষ করা হয়। ফাল্গুন-চৈত্র পর্যন্ত কাটা বন জঙ্গল শুকানো হয়। কাটা বনজঙ্গল উত্তমরূপে শুকানোর পর চৈত্র মাসে জুমে আগুন দেওয়া হয়। বনজঙ্গল আগুনে পোড়ানোর পরও কিছু কিছু অর্ধপোড়া বাঁশ, গাছ ইত্যাদির কাণ্ড ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভাবে জুমের জমিতে পড়ে থাকে। জুমিয়ারা সেগুলি সংগ্রহ করে জুমের জমির সুবিধামত স্থানে জড়ো করে স্তূপীকৃত করে রাখে এবং আগুন দিয়ে পুনরায় পোড়ায় অথবা বাড়িতে নিয়ে, লাকড়ি হিসাবে ব্যবহার করে। জুম পোড়ানোর পর পোড়া যায়নি এমন বাঁশ, গাছ ইত্যাদির টুকরোগুলো পরিষ্কার করার পদ্ধতিকে বলা হয় "হুক রোগু"।

জুম ফসল রক্ষণাবেক্ষণ এবং দেখাশোনা করার জন্য জুমিয়া পরিবার জুমের জমির মধ্যে বাঁশ, গাছ এবং ছন ব্যবহার করে বাঁশের মাচার উপর টংঘর তৈরি করে। জুম পাহারা দেওয়ার জন্য যে টংঘর তৈরি করে তাকে বলে "গাইরিং"। এই সময়ের ত্রিপুরারাজ্যের প্রাক মৌসুমী বৃষ্টির সুযোগ গ্রহণ করে চৈত্রের শেষ এবং বৈশাখের প্রথম পক্ষ কালের মধ্যে জুম ফসল বপনের কাজ শুরু হয়। জুম বীজ বপনের আগে জমির অবস্থান এবং উর্বরতা অনুযায়ী উপজাতি জুমিয়ারা বিভিন্ন ফসলের বীজ রোপণের জন্য পরিকল্পনা তৈরি করে এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী বীজ বপনের/রোপণের কাজ শুরু করে। জুমের ভিতর সহজে চলাফেরা করার জন্য জুমের রাস্তার জায়গা বাদ দিয়ে বীজ বপন করে। তবে জুমের রাস্তার ধারে পরিকল্পনা মাফিক জুমে ধান, লংকা এবং গাঁদা ফুল ইত্যাদি বপন করে থাকে। এছাড়া জুমে মিশ্র ফসলের চাষ হয় বলে বিভিন্ন ফসলের বীজ যেমন ধান, ভুট্টা, তুলো, সাদা তিল, জুমের আড়হর, মিষ্টি কুমোড়ো, কাওয়ন, শশা, মারফা, চিনার, খাকলু (জুমের চালকুমড়ো) কচু, বেগুন, লংকা ইত্যাদি বপন অথবা রোপণ করে থাকে। ত্রিপুরার জুমিয়া উপজাতিরা ফুল পছন্দ করে এবং গাঁদা ফুল বীজও জুমে বপন করে। গাঁদাফুল বপন করা হলে জুম ফসলের শিকড়ফোলা কৃমির প্রাদুর্ভাব কম হয়। এছাড়া, সৌন্দর্য্যপ্রেমী জুমিয়া মহিলারা মাথায় চুলের মধ্যে ফুল গুঁজে হাটে বাজারে আসে। ত্রিপুরারাজ্যে লক্ষ্য করলে দেখা যায় জুমিয়ারা কত পরিমাণ জমিতে জুম চাষ করে, তা সাধারণত ব্যক্ত করে কি পরিমাণ বীজ ধান বপন করেছে তার ভিত্তিতে। যেমন এক কেরোসিন টিন ভর্তি ধানকে বলে এক কাঠা (প্রায় ১২ কিলোগ্রাম) অথবা বাঁশ বেতের তৈরি ধান পরিমাপক ঝুড়ি যাকে বলে রাঙ্গিসা (প্রায় সাড়ে সাত কিলোগ্রাম)। ত্রিপুরা রাজ্যে কোনো জুমিয়া পরিবার কত কাঠা অথবা কত রাঙ্গিসা জুম ধান বপন করেছে তার হিসাব করে জুমের জমির পরিমাণ ব্যক্ত করার সাধারণ নিয়ম পর্বতসন্তানদের মধ্যে প্রচলিত আছে। জুম ধানের মধ্যে ব্যবহার অনুযায়ী "মাইছা" অর্থাৎ ভাত খাওয়ার ধান, "মাইমি"

অর্থাৎ মদ তৈরির ধান, "গুইরামা" অর্থাৎ পিঠে তৈরির ধান ইত্যাদি শ্রেণী বিন্যাস পরিলক্ষিত হয়। ত্রিপুরা রাজ্যে জুমিয়া উপজাতি সম্প্রদায় ব্যবহার করে এমন বিভিন্ন চিরাচরিত এবং প্রচলিত জাতগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—গেলং, বেতি, গারোমালতি, রং মালতি, গারো কচোক, রেনলিং, কাঞ্চালী, মাঘুমাই মাশল, জুম, তারোকা মাই, অ্যাবোমা, অ্যাডোমা, মমি থোটরো (সৌগন্ধক ধান) মামি ওয়াসলোক, মামি অ্যালাম্পা, মামি হাঙ্গার (ঔষধি ধান) লিকাজোক, মাইগুড়ি, কিসকী বাদাম, সরং, মাই বারাক ইত্যাদি। জুম রোপণের সময় জমির উর্ব্বর স্থানগুলি চিহ্নিত করে কুষ্মাণ্ড গোত্রের ফসল যেমন খাকলু, মিষ্টিকুমোড়ো, লাউ, শশা, চিনার, মারফা ইত্যাদির বীজ বপন করা হয়। জুমের জমির চারপাশে বেগুন, লংকা, অড়হর, গাঁদাফুল ইত্যাদির বীজ বপন করা হয়।

এক একর জুমের জমির মধ্যে ফসলের প্রকার ও জাত অনুযায়ী ধান ২৫-৩০ কিলোগ্রাম, তুলো ২-৩ কিলোগ্রাম, ভুট্টা ২-৩ কিলোগ্রাম, জুমের সাদা তিল আধ থেকে এক কিলোগ্রাম, মেস্তা ১-২ কিলোগ্রাম, কাওয়ন (মাসোই) আধ থেকে এক কিলোগ্রাম বীজ মিশ্র ফসল হিসাবে বপন করে থাকে। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, ফসলের জাত অনুসারে বীজের পরিমাণের তারতম্য করে থাকে। যেমন গুড়িমাই ২৫ কিলোগ্রাম ব্যবহার করা হয় কিন্তু গেলং জুমমালতি, গারো মালতি ইত্যাদি জাত একর প্রতি ৩০ কিলোগ্রাম বীজ বপন করার প্রয়োজন হয়। জুমে বীজ বপনের আগে বিভিন্ন ফসলের বীজ এক সঙ্গে মিশিয়ে বাঁশ বেতের তৈরি ছোট ঝুড়ি (চেম্পাই বা কাসলেং) এর মধ্যে নিয়ে জুমিয়া চাষী কোমরের বাম পাশে বেঁধে নেয়। ডান হাতে একটি পুরাণো তাক্কাল (দামরা) নিয়ে মাটিতে আনুমানিক ২০ সেমি. পরপর ৩-৫ সেমি গভীর গর্ত করে বাম হাতে ৩-৪টি মিশ্রফসলের বীজ প্রতি গর্তে বপন করে পায়ের সাহায্যে মাটি চাপা দিয়ে অগ্রসর হয়। জুম বপনের কাজ পুরুষ, মহিলা সকলে মিলে মিশে যৌথভাবে সম্পাদন করে।

জুমের বীজ বপনের তিন সপ্তহের মধ্যে চারা গাছ গজায়। জুমের ফসল গজানোর পর উচই উপজাতি জুমিয়া জুম ফসল রক্ষা করার জন্য "উরিখুউ" ঠাকুরের পূজা করে। জুম ফসল গজানোর পর দেখা যায় নানা রকমের বনজ লতা, ঘাস, বাঁশ, ছন ইত্যাদি ও প্রচুর পরিমাণে জুমে জন্মায়। তাই জুম ফসলের আগাছা নিয়ন্ত্রণ অত্যাবশ্যক। সাধারণত বৈশাখের শেষ অথবা জৈষ্ঠের প্রথম পক্ষকালে, আষাঢ় এবং শ্রাবণ মাসে তিন বার হাত নিড়ি দিয়ে জুমের আগাছা পরিষ্কার করা হয়। প্রয়োজনে ভাদ্র-আশ্বিন মাসে চতুর্থবার আগাছা বাছাই করা হয়। আগাছা নিয়ন্ত্রণের সময় পাড়ার সকল নারীপুরুষ, যুবক যুবতী যৌথ ভাবে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। জুমের কাজের সময় তারা হাসি, ঠাট্টা, গান করে আনন্দ উপভোগ করে। জুমের ফসল তোলার কাজ চলে, আষাঢ় থেকে পৌষ মাস পর্যন্ত। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে মারফা, চিনার ইত্যাদি

রিয়াং নৃত্য

রিয়াং নৃত্য

লুসাই বাঁশ নৃত্য

কুষ্মাণ্ডগোত্রীয় ফসল তোলার কাজ শুরু হয়। এই সকল ফল প্রথম তোলার পর "বালাকা" ঠাকুরের পূজা দিয়ে উৎসর্গ করা হয়, তারপর উচই উপজাতি জুমিয়ারা জুমের ফল খায়। জুমের অন্যান্য ফসল তোলার কাজ চলে, যথাক্রমে ভুট্টা-আষাঢ়-শ্রাবণ, ধান জলদি জাত-শ্রাবণ, মধ্যমজাত-ভাদ্র এবং নাবিজাত আশ্বিন, বেগুন-শ্রাবণ-ভাদ্র, মেস্তা-আশ্বিন-কার্তিক, তুলো, অগ্রহায়ণ-মাঘ মাস পর্যন্ত। লংকা, বেগুন ইত্যাদি ফসল পরের বছরও অনেক সময় তোলা হয়। জুম-ধান পাকার সময় উচই উপজাতি জুমিয়ারা "মাইফাউ খুফাঙ" ঠাকুরের পূজা করে এবং ধান ফসল ঘরে তোলার পর "মাইরুম" পূজা করে। "মাইফাঙ গুফাঙ" এবং "মাইরুম" ঠাকুরকে উচইরা মোরগ উৎসর্গ করে। জুম ধান গোলাজাত করার সময় "মায় কৌতাল" বা নবান্ন উৎসব পালন করে। এই সময়ে তারা "রনতক" বা "রন্দক" বা লক্ষ্মীপূজাও করে থাকে। "রন্দক" পূজার সময় দুটি মাটির বড় ঘট চাউলের গুঁড়োর লেই দিয়ে চিত্রিত করা হয়। এই ঘট বা পাতিল জুমের ধান থেকে তৈরি আতপ চাউল দ্বারা পূর্ণ করে মাটির সরা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। ঘটের ঘাড়ে জুমে উৎপাদিত তুলো দিয়ে সূতা তৈরি করে বেঁধে দেওয়া হয়। রন্দক পূজার সময় উচই উপজাতিরা নারী পুরুষ সকলে মিলেমিশে মদ্যপান, নাচ, গান এবং ভূরিভোজে মেতে ওঠে। বর্তমানে পর্যাপ্ত জুমের জমির অভাবে জুমচক্র কমে যাচ্ছে অর্থাৎ আগে একস্থানে ১৫-২০ বছর পর পর জুম চাষ করা হত। বর্তমানে জুমচক্র কমে দাঁড়িয়েছে ৩-৫ বছর। জুমচক্র হ্রাস পাওয়ার প্রধান কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং বেশির ভাগ বনভূমি সংরক্ষিত বনের আওতায় নিয়ে আসা, উপরন্তু জুম ফসলের বীজগুলির গুণগত মান ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে দিনে দিনে খারাপ হচ্ছে। তাছাড়া বর্তমানে জুম ফসলে রোগ-পোকামাকড় এবং অন্যান্য কৃষি শত্রুর আক্রমণও বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিসংখ্যানে দেখা যায় ১৯৩৪-১৯৩৮ সনে এক একর জুম ধানের ফলন ছিল প্রায় ১০০০ কিলোগ্রাম বর্তমানে কমে দাঁড়িয়েছে ৪০০ কিলোগ্রাম। ঐ সময়ে সমতল জমিতে চাষবাসে উৎপাদিত ধানের ফলন এবং জুম ধানের ফলন প্রায় সমান সমান ছিল। ফলে জুমিয়া পরিবারগুলি আগে জুম চাষের মাধ্যমে স্বচ্ছল জীবন ধারণ করতে পারলেও বর্তমানে শুধু মাত্র জুম চাষের ওপর নির্ভর করে জীবন ধারণ করতে পারছে না।

❒ দ্বাদশ অধ্যায়

ত্রিপুরার রাজার আমলের কৃষি

"ত্রিপুরার ককবরক ভাষায় "তুই" অর্থ জল এবং "প্রা" অর্থ নিকটে বা কাছে। এককালে ত্রিপুরা রাজ্যের সীমানা উত্তর-পূর্ব ভারতের গারো পাহাড় থেকে আরাকান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং ঐ সময়ে ত্রিপুরারাজ্যের পরিধি ছিল সমগ্র কুকি রাজ্য, মণিপুর, অসম, লুসাই অঞ্চল এবং বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম পর্যন্ত, অর্থাৎ ত্রিপুরারাজ্যের পাশেই ছিল বঙ্গোপসাগর। তাই জলের ধারে যে রাজ্য ছিল তাকে ত্রিপুরা বলা হত। সমুদ্র গুপ্তের সময়ে অর্থাৎ খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে ত্রিপুরারাজ্যের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐ সময়ের শিলায় উৎকীর্ণ লিপিতে দেখা যায়, তৎকালে ভারতবর্ষে ত্রিপুরা রাজ্যের খ্যাতি ও যশ ছিল।

ত্রিপুরার মহারাজা ধন্যমাণিক্য ১৪৬৩ সালে সিংহাসনে বসেন। সে সময়ে থানাংচি একটি পাহাড়ি কুকি রাজ্য ত্রিপুরার অন্তর্গত ছিল। ঐ রাজ্যের প্রজারা সম্পূর্ণ জুমের ওপর নির্ভরশীল ছিল এবং পাহাড়ের ঢালু অঞ্চলে সারি সারি কমলা বাগান ছিল এমন তথ্য পাওয়া যায়। ধন্যমাণিক্যের প্রিয় কন্যা ফুলকুমারী রতনকুমার নামক এক সৈনিককে বিবাহ করায় মহারাজ রাগান্বিত হয়ে রাজধানী রাঙ্গামাটি (বর্তমান উদয়পুর) এর বাইরে বনকুমারীর নিকট একটি গ্রাম ফুলকুমারীর নামে বন্দোবস্ত করে দেয়। তারপর ফুলকুমারী এবং রতনকুমার ফুলকুমারীর গ্রামে কৃষিকাজ করে জীবনযাপন করতে শুরু করে। ফুলকুমারী এবং রতনকুমার দুজনে অক্লান্ত পরিশ্রম করে সেখানে একটি আশ্রমের পরিবেশ সৃষ্টি করে। রতনকুমার একটি সুন্দর ফুল বাগান তৈরি করেছিল। কিন্তু অনাবৃষ্টির কারণে প্রচণ্ড খরায় ত্রিপুরার আদিবাসী প্রজাগণ তিন বছর যাবত জুম চাষ করতে না পেরে বনআলু এবং বাঁশের করুল খেয়ে জীবন ধারণ করতে বাধ্য হয়েছিল। মহারাজ ধন্যমাণিক্যের আদেশে ফুলকুমারীর কিছু ধানের জমিতে এবং ফুলবাগানে একটি দীর্ঘি খনন করার সময় রতনকুমারের সহিত সংঘর্ষ হয় এবং রতনকুমারকে জ্যান্ত কবর দেওয়া হয়।

মহারাজা বিজয়মাণিক্য (১৫৩২-১৫৬৪) তাঁর রাজত্বকালে ত্রিপুরার কৃষিক্ষেত্রে জলসেচের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে জিনাতপুরে একটি খাল খনন করান। যা রাজমালায় উল্লেখ আছে—

জিনাতপুরেতে রাজা খাল কাটি দিল।
ত্রিপুরার খাল বলি নাম তার হৈল।।

বিজয়মাণিক্যের সময়ে বন্যা প্রতিরোধ করে মাঠের ফসল রক্ষা করার জন্য বিজয়নদীর বিভিন্ন স্থানে বাঁক কেটে সোজা করে দিয়েছিলেন।

গোবিন্দমাণিক্য ১৬৬০ সালে ত্রিপুরার রাজ সিংহাসনে বসেন এবং কৃষিব্যবস্থার উন্নতির জন্য মেহেরকুল (বর্তমান কুমিল্লা) এর বিশাল পতিত এলাকা আবাদির ব্যবস্থা

করে ফসল ফলানোর ব্যবস্থা করে ছিলেন। এ ছাড়া গোমতীর বন্যায় প্রতি বছর ফসলের যে বিশাল ক্ষতি হত, তার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য গোমতী নদীর পাড়ে বন্যা নিরোধক "গাঙ আইল" নামক বাঁধ তৈরি করে দেন।

গোবিন্দমাণিক্যের সময়ও ত্রিপুরার উপজাতি সম্প্রদায় জুম চাষের ওপর নির্ভরশীল ছিল। জুমিয়া রিয়াং সম্প্রদায়ের ওপর তখন খুব উৎপীড়ন করা হত। ফলে রিয়াংরা রাজদ্রোহী হয়ে ওঠে। কিন্তু রাজমহিষী গুণবতী দেবীর গুণপণার জন্য বিদ্রোহী রিয়াং জুমিয়া প্রজারা শান্ত হয়।

মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্য বাহাদুরের রাজত্বকালে ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষির উন্নতির জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বীরচন্দ্রমাণিক্যের সময় ১৮৮৫ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর নগেন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে ত্রিপুরারাজ্যে কৃষি শাখার কাজকর্ম শুরু হয়। ঐ সময়ে কৃষি, পশুপালন, মৎস্যচাষ, রেশমচাষ ইত্যাদি সকল কৃষি সম্পর্কীয় কারিগরি বিভাগগুলি একসঙ্গে কৃষি শাখা থেকে দেখাশুনা করা হত।

রাধাকিশোরমাণিক্য ১৮৯৬ সালে ত্রিপুরার রাজা হন এবং ঐ সময়ে ত্রিপুরারাজ্যে রেশম চাষ এবং শিল্প বিকাশের জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ করেন। মহারাজা রাধাকিশোরমাণিক্য আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি প্রয়োগের উদ্দেশ্যে তুঁত (রেশম শিল্প), আলু, আখ ইত্যাদি চাষের খামার স্থাপন করেন। ১৯০৪ সালে রেশমের গুটি পোকা পালন কর্মসূচীও ত্রিপুরারাজ্যে শুরু করেন। ১৯০১ সালে সোনামুড়া এবং উদয়পুর মহকুমায় ফসল প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে নষ্ট হওয়ায় উনি দুঃস্থ কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে চাউল এবং বীজধান বিতরণ করেন এবং কৃষিব্যবস্থা পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে ঐ এলাকায় কৃষি ঋণ বণ্টনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এমন প্রমাণ পাওয়া যায়। রাধাকিশোর মাণিক্যের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বীরেন্দ্র কিশোরমাণিক্য ১৯০৯ সালের ২৫শে নভেম্বর ত্রিপুরার রাজ সিংহাসনে বসেন। মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর ত্রিপুরারাজ্যে কৃষির উন্নতির জন্য কৃষি শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং ঐ সময়ে আগরতলায় একটি কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করেছিলেন। ত্রিপুরায় রেশম চাষ এবং শিল্প প্রসারের উদ্দেশ্যে একটি রেশম বয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেন। ত্রিপুরার বিস্তীর্ণ পতিত জমিকে কৃষিকাজে সুষ্ঠ ভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে তিনি প্রথম ত্রিপুরার মাটি পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। তৎকালে ডঃ এ. সি. ভট্টাচার্য্য মহাশয় ত্রিপুরার পতিত জমির মাটি পরীক্ষা করে পতিত জমিতে চা বাগান গড়ে তোলার উপদেশ দেন। বীরেন্দ্র কিশোরমাণিক্যের বিশেষ উদ্যোগে ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে মাত্র এগারো বছরের মধ্যে প্রায় চল্লিশটি চা বাগান গড়ে ওঠে। বীরেন্দ্র কিশোরের কৃষি উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টায় কৃষির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের সুযোগ ত্রিপুরারাজ্যে বৃদ্ধি পায় এবং কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে রাজস্বও উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পায়।

বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্যের মৃত্যুর পর ১৯২৩ সালে বীরবিক্রমকিশোরমাণিক্য ত্রিপুরার রাজা হন। মহারাজ বীরবিক্রম প্রথম ত্রিপুরার ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার জন্য বিশেষ করে

কৃষি, পশুপালন, রেশমশিল্প ইত্যাদিতে অধ্যয়নের জন্য বহিঃরাজ্যে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। বীর বিক্রমের রাজত্বকালে ১৯৩১ সালের ১৮ মার্চ থাংলুরা নামক একজন লুসাই ডাক্তার উত্তর ত্রিপুরার ফটিকরায়ে মহারাজের দেওয়ান বি. কে. সেন মহাশয়ের নিকট লিখিত ভাবে জানান ডারলং কুকিরা প্রায় গত এক শতাব্দী ধরে এই অঞ্চলে বসবাস করিয়া আসিতেছে এবং কৃষিকাজই তাদের প্রধান জীবিকা। ঐ সময়ে কুকিরা স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং কৃষি বিজ্ঞান সম্পর্কে সচেতন ছিল। লুসাই ডাক্তার তার প্রতিবেদনে মাননীয় দেওয়ান বাহাদুরের কাছে আবেদন করেছিল ঐ এলাকার একজন উপজাতি ছাত্রকে এল. এম. এফ (ডাক্তারি) এবং একজনকে কৃষি পরিদর্শক (এগ্রিকালচার ইন্সপেক্টর) এর ট্রেনিং এ পাঠানোর জন্য। মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর প্রথম ত্রিপুরার পাহাড়ি এলাকায় কৃষির উন্নতির জন্য উন্নত মানের জুম ধান ও তুলো বীজ বহিঃরাজ্য থেকে আনয়ন করেন। সমতল অঞ্চলে পাট তামাক, আখ, আলু, সরিষা ইত্যাদি ফসলের উন্নত চাষ প্রযুক্তি চালু করেন। পাহাড়ে একস্থান থেকে স্থানান্তরে ভ্রমণশীল জুমচাষ থেকে আদিবাসী জুমিয়াদের সমতল জমিতে স্থায়ী চাষে আকৃষ্ট করার জন্যও কর্মসূচী গ্রহণ করেন।

ত্রিপুরারাজ্যের জুমিয়াদের উন্নতিকল্পে মহারাজা বীরবিক্রমকিশোরমাণিক্য বাহাদুর (১৯২৩-১৯৪৭) পুরান তিপ্রা, নোয়াতিয়া, জমাতিয়া, রিয়াং এবং হালাম জুমিয়াদের স্থায়ী চাষ আবাদে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে জুমিয়া পুনর্বাসন প্রকল্প শুরু করেন ১৯৩০-৩১ সালে। বর্তমান পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার খোয়াই মহকুমার কল্যাণপুরে জুমিয়াদের জন্য ঐ সময়ে মোট ২৮৪৯০ হেক্টর জমির বন্দোবস্ত করেন। পরবর্তী সময়ে ১৯৪৩ সালে জুমিয়া পুনর্বাসন প্রকল্পের সুষ্ঠ রূপায়ণের জন্য আরো অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। মহারাজার আমলে ইমিগ্রেশন এবং রিক্লেমেশন ডিপার্টমেন্ট স্থাপন করে বর্তমান ধলাই জেলার কুলাই হাওড় এবং ধলাই ভ্যালি ইত্যাদি স্থানে বিস্তীর্ণ এলাকার বন্দোবস্ত ব্যবস্থা করেন।

মহারাজা বীরবিক্রমমাণিক্য বাহাদুরের সময়ে কৃষি বিভাগ সমতল এবং উঁচু টিলা জমিতে স্থায়ী চাষ বাসের জন্য উচ্চ গুণগতমান সম্পন্ন বীজ বিশেষ করে ধান, কার্পাস, পাট, তামাক, আখ, আলু ইত্যাদির বীজ কৃষক ভাইদের মধ্যে বিতরণের কর্মসূচী গ্রহণ করেন। জুমিয়া উপজাতি কৃষক ভাইদের সমতলে এবং উঁচু টিলা জমিতে স্থায়ী চাষবাসে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে এবং প্রয়োজনীয় কৃষি তথ্য সরবরাহ করার জন্য তৎকালীন আগরতলা বাজারে একটি কৃষি অনুসন্ধান কেন্দ্র স্থাপন করেন। এই কৃষি অনুসন্ধান কেন্দ্র থেকে উন্নতমানের বীজ এবং কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ এবং গবাদি পশুর রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হত। এছাড়া উন্নত কৃষি প্রযুক্তির তথ্য কৃষক ভাইদের কাছে সরবরাহ করা হত। এই সকল কৃষি উন্নয়ন মূলক কাজের জন্য ১৯৩৭ সালে রাজকোষ থেকে মোট ১২৩৯ টাকা ১০ আনা খরচ করা হয়েছিল।

কাপড়ের দোলনায় উপজাতি শিশু

এছাড়াও মহারাজা সে সময়ে টেন্যানসি অ্যাক্ট এ সমতল জমিতে স্থায়ী চাষ আবাদে উপজাতি জুমিয়াদের আকৃষ্ট করার জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা উপজাতি প্রজাদের জন্য ব্যবস্থা করেছিলেন। যেমন ঐ সময়ে কোনো পাহাড়ি এলাকায় বন জঙ্গল পরিষ্কার করে স্থায়ী চাষ আবাদ করলে তিন বছরের জন্য খাজনা মুকুবের ব্যবস্থা ছিল। অন্যদিকে জুম চাষ নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং বনভূমি সুরক্ষার জন্য ১২৯৭ ত্রিপুরাব্দে (১৮৪৭) ত্রিপুরায় রিজার্ভ ফরেস্ট অ্যাক্ট চালু ছিল। সে সময়ে রিজার্ভ ফরেস্টের পাশে আধ মাইল এলাকার ভিতর জুম চাষ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। এমন কি বনে আগুন দেওয়া, আইন মোতাবেক নিষিদ্ধ ছিল এবং আইন অমান্যকারীকে ছয় মাসের কারাদণ্ড অথবা ১০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা দুটি শাস্তি একই সঙ্গে দেওয়ার বিধান ছিল।

মহারাজা বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুর ত্রিপুরারাজ্যে ফলচাষের ওপর ও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন। উনি প্রথম বহিঃরাজ্যে থেকে লিচু আমদানি করে আগরতলার পাশে বর্তমান লিচু বাগান এলাকায় সুবিন্যস্ত ভাবে সুন্দর লিচু বাগানের সূচনা করেছিলেন। ঐ সময়ে বেসরকারি ভাবে আগরতলা আখাউরা রোডের পাশে প্যায়ারী বাবুর বাগানে লিচু, সফেদা, পেয়ারা, আম ইত্যাদি ফলের বাগান গড়ে উঠেছিল।

❐ দশম অধ্যায়

জুম চাষের সমস্যা

চীন দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের আদিম অধিবাসী যারা ভারতবর্ষে এসে পাহাড়ি এলাকায় বসতি স্থাপন করেছিল তাদের বলা হত "ছাও থিয়াস"। এই "ছাও থিয়াস" শব্দ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর উচ্চারণে বিকৃত হয়ে "জেহে থিয়াস" শব্দের উৎপত্তি যার অর্থ উঁচু পাহাড়ি অঞ্চল। চীন দেশ থেকে আগত পর্বতসন্তানরা পাহাড়ের ঢালে যে যাযাবর চাষপদ্ধতি অনুসরণ করত, তাকে বলা হত "জোহো মৌ"। পরবর্তী সময়ে "জোহো মৌ' শব্দ থেকে জুম শব্দের উৎপত্তি, যার অর্থ, পাহাড়ের ঢালে যাযাবর চাষবাস। আবার "জুমিয়া" শব্দ জুম বা জোম থেকে এসেছে। যে সকল জনজাতি জুম চাষের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে তাদের বলা হয় জুমিয়া।

জুমচাষ ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বিশ্বের অন্যান্য দেশ যেমন আফ্রিকা, রোডেশিয়ার বাম্বো এলাকায়, দক্ষিণ নাসাল্যান্ডের ইয়ো এলাকায়, আমাজনের বোড়ো এলাকায়, বোর্নিও, ইন্দোচীন, মায়েনমার, শ্রীলঙ্কা, ফ্রান্স, দক্ষিণ পূর্ব সোলোমান দ্বীপপুঞ্জে কমবেশি দেখা যায়। ভারতবর্ষের মধ্যে মণিপুর, অসম, নাগাল্যান্ড, মেঘালয়, সিকিম, মিজোরাম, অরুণাচল প্রদেশ, ওড়িষ্যা, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, মালাবার ইত্যাদি স্থানে কমবেশি দেখা যায়। জুম চাষ বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে পরিচিত যেমন, পশ্চিম আফ্রিকায়—"র্ফার্নিং" ফ্রান্সে- "স্যারট্যাগে", দক্ষিণ পূর্ব সোলোম্যান দ্বীপপুঞ্জে-"কাহালো", শ্রীলংকায়-"ছেনা", বার্মার পাহাড়ি এলাকায়-"ট্যাঙগ্যায়া", ভারতবর্ষের ওড়িষ্যার উত্তর অঞ্চলে "পামা ডোহী" "কোমোন", "ব্রীঙ্গা", "দাবী", দক্ষিণ ওড়িষ্যায়-"গুডিয়া", "ধোঙ্গারছার", মধ্যপ্রদেশে-"বেওয়ার", "দ্যায়া" বাস্তারের মারিয়াসদের কাছে-"পেনডা", মালাবারে-"কুমারী", মেঘালয়ে-"লায়েঙ্গখালুম", গারো পাহাড়ে-"অ্যাবাগামা" এবং ত্রিপুরায়-"হুকনি স্মোঙ" ইত্যাদি ইত্যাদি।

উত্তর পূর্ব ভারতে জুমচাষ খ্রিস্টপূর্ব সাত হাজার বৎসর আগে মানুষ যখন পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করে শিকারি জীবন যাপন থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ অথবা উৎপাদন শুরু করে, সেই সময় থেকে চলে আসছে বলে অনুমান করা হয়। জুম চাষপদ্ধতিতে পাহাড়ের খাড়া ঢালে বনজঙ্গল পরিষ্কার করে ফসল উৎপাদন করা হয় ফলে জুম চাষের এলাকায় ভূমি ক্ষয়ের পরিমাণ অন্যান্য চাষপদ্ধতি অপেক্ষা অধিক হয়।

জুম চাষের জন্য কোন সময়ে কি পরিমাণ ভূমি ক্ষয় হতে পারে উত্তর পূর্বাঞ্চলের ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের পরীক্ষা লব্ধ তথ্য অনুযায়ী আলোচনা করা হল—

কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে জুমের জমি নির্বাচনের উদ্দেশ্যে জুমিয়া কৃষক প্রথম জুমের জমিতে প্রবেশ করে, ঘুরে ফিরে দেখে, পছন্দ হলে স্বপ্নে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে মাটির

নমুনা সংগ্রহ করে। প্রাথমিক নির্বাচন পর্ব শেষ হলে ঐ স্থানে পূজা-পার্বণ করে, প্রকৃত পক্ষে এই সময় থেকে জুমের জমিতে ভূমিক্ষয় শুরু হয়। বিশেষ করে জুমিয়া চাষীর চলাফেরা করার জন্য পায়ের চাপে কেঁচোর মাটির ঢেলা, ছোট ছোট মাটির দানা ইত্যাদি পাহাড়ের ঢাল বরাবর গড়িয়ে সামান্য অপসারিত হয় এবং এইগুলি শুকনো পাতা ও গাছের গোড়ায় কিছুদূর এগিয়ে আটকা পড়ে।

পৌষ-মাঘ মাসে জুম চাষের জন্য নির্বাচিত স্থানের বনজঙ্গল কাটা শুরু হয়। এই সময় জুমিয়া কৃষকের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পায়। এই সময় জুমিয়া কৃষকের চলাফেরা করা এবং জঙ্গল পরিষ্কার করার ক্রিয়া কাণ্ডের জন্য পায়ের চাপে কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাস থেকে অধিক পরিমাণ মাটির অপসারণ বা স্থানচ্যুতি হয়, বিশেষ করে কেঁচোর মাটির ঢেলা, ছোট ছোট কাঁকর ইত্যাদি গড়িয়ে নীচের দিকে যায় তবে ভূপাতিত কাটা জঙ্গল ইত্যাদির মধ্যে আটকায়।

ফাল্গুন-চৈত্র মাসে শুকনো ভূপাতিত বনজঙ্গল পোড়ানো হয় এবং সম্পূর্ণ পোড়া যায় না এমন গাছের ডালপালা, কাণ্ড ইত্যাদি স্থানে স্থানে স্তূপীকৃত করে জুমের এলাকা পরিষ্কার করার সময় কেঁচোর মাটির ঢেলা, ছাই, মাটির দানা, কাঁকর ইত্যাদি জমির ঢাল বরাবর অধিক দূর গড়িয়ে যায়। এই সময় পৌষ-মাস অপেক্ষা মাটির অপসারণ এবং স্থানচ্যুতি অধিকতর হয়। পৌষ মাস থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত জুম জমিতে সর্বোচ্চ ভূমিক্ষয়ের পরিমান ৩·৭ টন হেক্টর প্রতি হতে পারে।

চৈত্র-বৈশাখ মাসে জুম ফসলের মিশ্র বীজ স্থানে স্থানে গর্ত করে বপনের কাজ চলে, ফলে জুমের জমির ওপরের স্তরের মাটি সহজে আলগা হয়। এই সময়ে প্রাক্ মৌসুমি বৃষ্টির জন্য এবং জুমিয়া কৃষকের কর্মতৎপরতার জন্য আলগা মাটি, ছাই ইত্যাদি বৃষ্টির জলের সঙ্গে নীচের দিকে সহজে গড়িয়ে পড়ে। তবে কিছু পরিমাণ মাটি নীচের গর্তগুলিতে আটকা পড়ে। তথাপি পরীক্ষার ফলাফলে দেখা যায় এই সময়ে জুমের জমির ভূমিক্ষয় ফাল্গুন-চৈত্র মাস অপেক্ষা অধিক হয় এবং হেক্টর প্রতি ২২·৪ টন মাটি অপসারিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে জুম ফসলের গাছ গজিয়ে মাটির ওপরে উঠে আসে এবং বৈশাখের শেষ-জ্যৈষ্ঠের প্রথম পক্ষকালের মধ্যে প্রথম দফে ফসল নিড়ানো এবং আগাছা বাছাই এর কাজ শুরু হয়। ফসল নিড়ানো, অতিরিক্ত অবাঞ্ছিত গাছ এবং আগাছা বাছাই করার সময় জমির মাটির ওপরের স্তর অধিকতর আলগা হয়। ফলে অধিক পরিমাণ মাটি, ছাই, বৃষ্টির গড়ানো জলের সঙ্গে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নীচের দিকে নেমে আসে এবং জুমের জমির ভূমিক্ষয় ত্বরান্বিত হয়। এই সময়ে সর্বোচ্চ ভূমিক্ষয়ের পরিমাণ হেক্টর প্রতি ৬১·৯ টন পরিলক্ষিত করা গেছে।

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে জুম ফসল মোটামুটি ভালভাবে বেড়ে ওঠে এবং মাটির ওপর ভাল ঢেকে রাখে। এই সময়ে মৌসুমি বৃষ্টিপাতও শুরু হয়, একই সঙ্গে দ্বিতীয় দফে

আগাছা বাছাইয়ের কাজ চলে। ফলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ফসলের গোড়ার মাটি ধুয়ে চলে যায় এবং গাছের শিকড় বাইরে থেকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দৃশ্য হয়, কিন্তু ফসলের বাড়ের জন্য ওপরের স্তরের মাটি ঢাকা থাকে। এই সময়ে সর্বোচ্চ জমি ক্ষয়ের পরিমাণ হেক্টর প্রতি ৪৫·৪ টন পরিলক্ষিত হয়।

আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে পুরোদমে মৌসুমি বৃষ্টিপাত হয়। এই সময়ে জুমের সব্জী ফসল তোলার কাজও শুরু হয়, তৃতীয় দফে আগাছা নিয়ন্ত্রণের কাজ চলে। ফলে, জুমক্ষেতে জুমিয়া চাষীর কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই সময় বেশির ভাগ ফসল সর্বোচ্চ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে জমির মাটি সম্পূর্ণ ঢেকে রাখে। ফলে, ভূমিক্ষয়ের পরিমাণ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ অথবা জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাস অপেক্ষা কম হয়। এই সময়ে সর্বোচ্চ ২১·৯ টন মাটি হেক্টর প্রতি অপসারিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ফসল তোলার কাজ চলতে থাকে, বিশেষ করে শাকসব্জী, ভুট্টা, জলদি জাতের ধান এই সময়ে মাঠ থেকে তোলা হয়। এই সময়ে বৃষ্টিপাতের পরিমাণও কমতে শুরু করে। প্রয়োজনে জুমিয়া চাষী চতুর্থ দফে আগাছা নিয়ন্ত্রণ করে। এই সময় জুমিয়া চাষীর জুমক্ষেতে কর্মতৎপরতা আষাঢ়-শ্রাবণ মাস অপেক্ষা বেশি হয় এবং ভূমিক্ষয়ের পরিমাণও অপেক্ষাকৃত অধিক পরিলক্ষিত হয়। এই সময় সর্বোচ্চ ২৯·৬ টন ভূমিক্ষয় হেক্টর প্রতি পরিলক্ষিত হয়।

ভাদ্র-আশ্বিন মাসে জুম জমির মাটি মোটামুটি ভাবে বসে যায়। কিছু কিছু ফসল তোলার কাজ চলে। ফসলের পরিত্যক্ত গাছ, শাখা-প্রশাখা, পাতা ইত্যাদি মাটিতে পচতে থাকে। নতুন বুনো আগাছা ইত্যাদি পুনরায় গজাতে শুরু করে। এই সময় জুমিয়া চাষীর কর্মতৎপরতা জুম জমিতে কমে আসে। ফলে ভূমিক্ষয়ের পরিমাণ নগণ্য হয়। সর্ব্বোচ্চ ভূমিক্ষয়ের পরিমাণ মাত্র ২·৭ টন প্রতি হেক্টর পরিলক্ষিত হয়েছে।

কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসেও ফসল তোলার কাজ চলে। এই সময় জুম জমির বেশির ভাগ ফসল তুলে নেওয়ার জন্য জমি ফসলের পরিত্যক্ত পচনশীল অবশিষ্টাংশ দ্বারা ঢাকা থাকে। জুম চাষীর কর্মতৎপরতা কমে আসে ফলে ভূমিক্ষয় হয় না বললে চলে।

অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে কন্দ জাতীয় ফসল তোলার কাজ চলে। ফলে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাটি গড়িয়ে নীচের দিকে আসে। ফসলের পরিত্যক্ত অবশিষ্টাংশ মাটিতে পচতে থাকে। নতুন ভাবে বন-জঙ্গল গজাতে শুরু করে। এই সময় বৃষ্টিপাত নগণ্য হওয়ায় ক্ষয়ের পরিমাণ কম হয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায়, যদিও জুম চাষ পদ্ধতিতে মাটি কর্ষণ করা হয় না। তথাপিও বনজঙ্গল কাটা-বীজ বপন, রোপণ, আগাছা নিয়ন্ত্রণ পাহাড়ের খাড়া ঢালে জুমিয়া চাষীর কর্মতৎপরতা, বৃষ্টিপাত এবং কন্দ জাতীয় ফসল মাটি খুঁড়ে তোলা ইত্যাদি কারণে এক হেক্টর জুম জমি থেকে বছরে জমির অবস্থান,

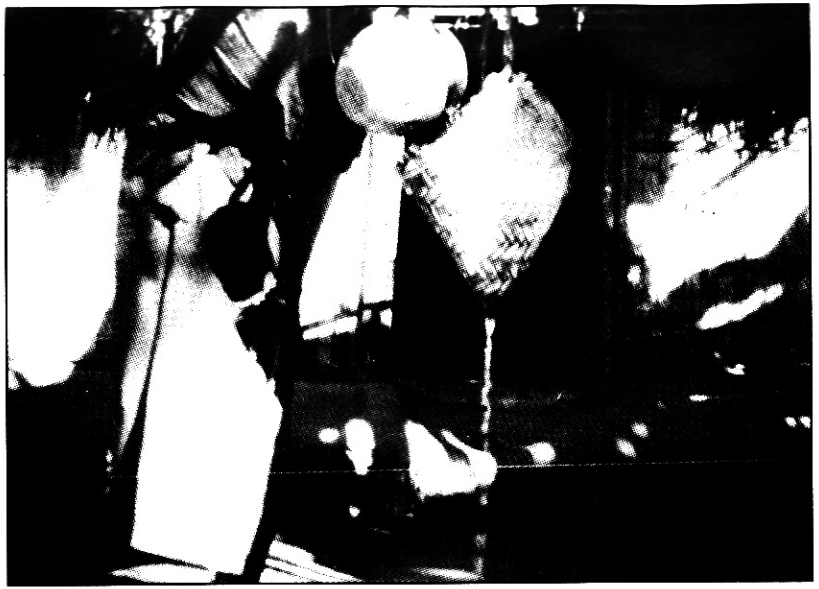

চাখুয় তৈরির জন্য ক্ষারজল সংগ্রহ

মাটির গঠন, প্রস্থন, ফসলের ঘনত্ব, ফসলের বাড় ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে সর্বনিম্ন ৩৩ টন এবং সর্বোচ্চ ২০১·৪ টন মাটির অপসারণ হয়। আবার ৫০-৬০ শতাংশ ঢালু পাহাড়ি জমিতে পরপর দুই বছর জুমচাষ করা হলে প্রথম বছর এবং দ্বিতীয় বছর যথাক্রমে ১৪৬·৬ এবং ১৭০·২ টন মাটি হেক্টর প্রতি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, উত্তর পূর্বাঞ্চলের ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের এক সমীক্ষায় জানা যায়, ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি থেকে প্রতি বছর জুম চাষের কারণে ১৯ মিলিয়ন টন ভূমি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এছাড়া ৬ মিলিয়ন টন জৈব কার্বন, ১·৭ টন লভ্য ফসফরাস এবং ৫৬৯০ টন লব্য পটাশ জুম চাষের জমির মাটির সঙ্গে প্রতি বছর হারায়।

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন উত্তর পূর্বাঞ্চলের ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের সুপারিশকৃত জুমের বিকল্প চাষপদ্ধতি মেঘালয়, সিকিম, নাগাল্যান্ড এবং অসামের কোনো কোনো অঞ্চলে প্রয়োগ করা সম্ভব হলেও ত্রিপুরারাজ্যে এর সুফল পাওয়া সম্ভবপর হচ্ছে না। কারণ, ত্রিপুরারাজ্যের জুম চাষের আওতায় পাহাড়ি এলাকাগুলির মাটি হালকা, পাথর নেই বললেই চলে। ফলে ত্রিপুরায় পাহাড়ি এলাকার বেঞ্চ টেরেস করা হলে বৃষ্টির জলে ধুয়ে মাটি সহজে ভেঙ্গে যায় এবং মাঠের মধ্যে বড় বড় নালা, গর্ত ইত্যাদির সৃষ্টি হয় এবং ভূমিক্ষয় প্রতিরোধ করা বাস্তবিক পক্ষে সম্ভবপর হচ্ছে না অন্যদিকে ত্রিপুরারাজ্যে ভূমি সংরক্ষণ করা হয়েছে, এমন প্রকল্পগুলির প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় প্রথম দুই-তিন বছর ঐ জমিতে ভাল ফসল উৎপাদন করতে পারলেও পরবর্তী সময়ে ফলন মারাত্মক ভাবে কমে যায়। ফলে ভূমি সংরক্ষিত এলাকায় বসবসকারী উপজাতি জুমিয়ারা অর্থনৈতিক ভাবে লাভবান হয় এমন ফসল উৎপাদনে ব্যর্থ হয় এবং প্রকল্প এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। তাই জুম চাষে ভূমিক্ষয় নিয়ন্ত্রণের জন্য জুমিয়াদের কৃষ্টি ও সামাজিক রীতিনীতি সুরক্ষা করে বিকল্প টেকসই চাষবাসের সুপারিশ অনুমোদন করা একান্ত প্রয়োজন।

জুম চাষের কুফল বিশেষ করে বনায়ন ধ্বংস, ভূমিক্ষয়, উদ্ভিদ খাদ্যের অপচয়, বন্যা, খরা ইত্যাদি সমস্যা এড়ানোর জন্য জুম চাষের বিকল্প চাষ আবাদের মধ্যে উত্তর পূর্ব ভারতের কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের সুপারিশ কৃত ভূমি ব্যবহার পদ্ধতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলে কৃষি, উদ্যান ও বাগিচা ফসল, পশুখাদ্য এবং অরণ্য সম্পদ উৎপাদনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া। পাহাড়ের ঢালু অঞ্চলের সর্বনিম্ন এক-তৃতীয়াংশ উচ্চতা পর্যন্ত উদ্যান ও বাগিচা ফসল এবং সর্ব উচ্চ এক-তৃতীয়াংশ এলাকা অরণ্য বৃক্ষ এবং পশুখাদ্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়। কৃষি কাজের জন্য পাহাড়ি জমি ব্যবহার করার জন্য ধাপ চাষপদ্ধতি, উদ্যান ও বাগিচা ফসল চাষের জমিতে অর্ধচন্দ্রাকৃতি টেরেস এবং কনটুর বাঁধ তৈরি করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কনটুর বাঁধ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পাথর দ্বারা অথবা ভেজিটেটিভ পদ্ধতি অনুসরণ করে তৈরি করা যায়।

'জুমচাষকে অপসারিত করার লক্ষ্যে বিকল্প সুপারিশকৃত ওয়াটার শেড ভিত্তিক ফার্মিং সিসটেমে গড়ানো জল, ভূমিক্ষয় এবং উদ্ভিদ খাদ্য উপাদানের যে পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয় তার হিসাব নিম্নরূপ ঃ

ফার্মিং সিসটেম	গড়ানো জল (মি.মি.)	ভূমিক্ষয় (টন/হেঃ)	জৈব কার্বন (কেজি/হেঃ)	লভ্য ফসফরাস (কেজি/হেঃ)	লভ্য পটাশ (কেজি/হেঃ)
চিরাচরিত জুমচাষ	১১৪	৪০·৯০	৬৯৮	০·১৫	৭·১০
কৃষি-উদ্যান বাগিচা ফসল চাষ (পাহাড়ের নীচের ১/৩ ভাগ বেঞ্চ টেরেস এবং ২/৩ ভাগ অর্ধচন্দ্রাকৃতি টেরেস।)	৫৬·৫০	২·৯৬	৩৯·৭৭	০·০২	০·৫৪
শুধুমাত্র কৃষিজ ফসল চাষ (বেঞ্চ টেরেস)	৯৫·১০	২·৩০	৩৩·৬৫	০·০১	০·৫৪

ত্রিপুরারাজ্যে অরণ্য সম্পদের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ১৮৮৭ সাল সর্বপ্রথম বন সংরক্ষণ এবং বন উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও ঐ সময়ে প্রকৃত পক্ষে কোনো নির্দিষ্ট জায়গা বনসংরক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট ছিল না, তারপর ১৯১৩ সালে বনদপ্তর সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ করে। ত্রিপুরারাজ্যের সমগ্র বনাঞ্চলকে বিভিন্ন বন বিভাগে বিভক্ত করে ঐ সময়ে ৩২টি প্রজাতির উদ্ভিদকে বন সংরক্ষণ কর্মসূচীর আওতায় নিয়ে আসা হয়। ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরা রাজ্যে বন সংরক্ষক (Conservator of Forest) পদে প্রথম একজন আধিকারিক নিযুক্ত করা হয়। ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত শাল, জারুল, সনালু ইত্যাদি গাছের বনায়ন সৃষ্টির ওপর জোর দেওয়ায় হয়। সেই সময় ত্রিপুরার বনাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকায় অবৈজ্ঞানিক প্রথায় জুম চাষ করা হত। জুম পোড়ানোর জন্য বনভূমি গভীর অরণ্য থেকে হাল্‌কা অরণ্যে পরিণত হতে শুরু করে। জুম চাষের জন্য যেহেতু বাঁশ বন প্রাধান্য পায় তাই ত্রিপুরার বিস্তীর্ণ বাঁশ বন এবং বনে বসবাসকারী বিভিন্ন বন্যপ্রাণী ও পাখি ধীরে ধীরে বিলুপ্তির দিকে অগ্রসর হয়। ত্রিপুরার উল্লেখযোগ্য বন্যপ্রাণী, পাখি এবং বাঁশের প্রজাতির সারণি দেখান হল ঃ

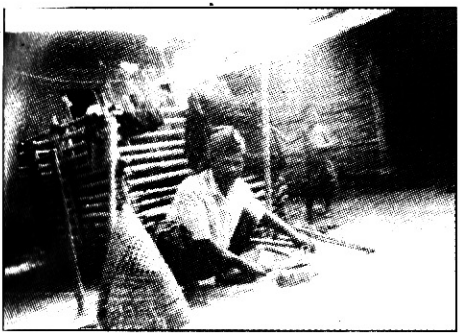

জুম চাষের প্রস্তুতি

জুমের জঙ্গল কাটা

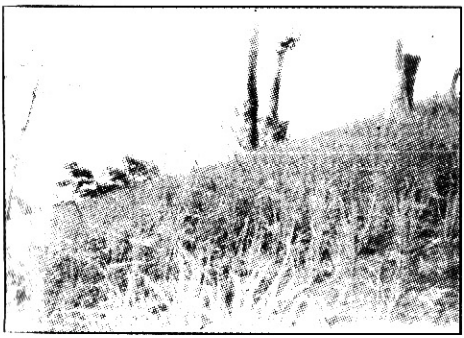

জুম ফসল

জুম ফসল

জুম ধান মাড়াই

জুম ধান ভাঙ্গার কাঠের হামানদিস্তা

[illegible] পর ঝাড়াই

▲ সারণি নং—১

ত্রিপুরার বন্যপ্রাণী

১। উল্লুক (Hylobates hoolock)
২। বানর (Mecacus aretoides) (Mecacus rhesus)
৩। জাম্বুবান (Trachypithecus phayrei)
৪। লজ্জাবতী বানর (Nycticebus bengalensis)
৫। বাঘ (Panthera tigris)
৬। চিতা বাঘ (Panthera pardus)
৭। বন বিড়াল (Felis chaus)
৮। মেচি বাঘ (Felis bengalensis)
৯। খাঁটাস (Viverricula indica)
১০। বাঘ ডাঁস (Viverra zibetha)
১১। ভোঁদর (Paradoxurus ringer)
১২। বেজী (Herpestes edwardsii)
১৩। নেকড়ে বাঘ (Canis Pallipes)
১৪। রাম কুত্তা (Cyon dukhunensis)
১৫। খেঁকশিয়াল (Canis bengalensis)
১৬। শিয়াল (Canis aureus)
১৭। উদ (Lutra lutra)
১৮। ভাল্লুক (Melursus ursinus)
১৯। ছুঁচো (Crocidura caerulea)
২০। বাদুর (Ptropus medius)
২১। কাঠবিড়াল (Sciurus indicus) (Sciurus bicolor) (Sciurus locroides)
২২। বাঁশ ইঁদুর (Rhysomys sp.) (Cannomus badius)
২৩। মাঠের ইঁদুর (Bandicota bengalensis)
২৪। বড় বেন্ডিকোট ইঁদুর (Bandicota indica)
২৫। কালচে ইঁদুর (Rattus rattus)
২৬। নেংটি ইঁদুর (Mus musculus) (Mus boodga)
২৭। সজারু (Hystrix indica)
২৮। খরগোস (Lepus ruficaudatus)
২৯। বন্যহাতি (Elephas maximus)

৩০। গব/মিথুন (Bos frontalis)
৩১। বন মহিষ (Bos bubalis)
৩২। কালেশ্বর হরিণ (Cervus = Russa unicolor)
৩৩। খাট্টা হরিণ (Muntjacus = Ceruvulus muntijac)
৩৪। বন্য শূকর (Sus cristatus)
৩৫। বন রুই (Manis pentadactyla)

▲ সারণি নং—২

ত্রিপুরার পাখি

১। দাঁড় কাক (Corvus splendens)
২। কালো জংলী কাক (Corvus macrorhynchus)
৩। বুলবুল (Pycnonotus Cafer)
৪। পাহাড়ি বুলবুল (Pycnonotus jocosus)
৫। পেঁচা (Dicrurus adsimilis) (Strix flammea) (Scops giri) (Athena brama)
৬। ইষ্টকুটুম (Oriolus xanthornus)
৭। শালিক (Acredotheris tristis)
৮। চড়াই (Passer domesticus)
৯। ভৃঙ্গরাজ (Dissemurus paradiseus)
১০। দোয়েল (Copsychus malabaricus)
১১। টুনটনি (Orthotomus sutorius)
১২। ময়না (Gracula religiosa)
১৩। বাবুই (Ploceus philippinus)
১৪। মুনিয়া (Lonchura Punctulata)
১৫। কাঠঠোকরা (Brachypternus bengalensis) (Dendrocopos mahrattensis) (Micropterus branchyurus)
১৬। মাছরাঙ্গা (Halycon smyrensis) (Alcedo atthis)
১৭। ধনেশ পাখি (Anthracoceros malabaricus)
১৮। বউ কথা কও (Cuculus micropternus)
১৯। কোকিল (Eudynamis honorata)
২০। টিয়া (Psittacula cyanocephala) (P.fasciatcus)

৪১। তোতা (Psittacula eupatria indoburmanica)
(P. krameri boralis)
৪২। ভুতুম (Ketupa Bubo zeylenensis)
৪৩। শকুন (Gyps bengalensis)
৪৪। চিল (Mylyus migrans)
৪৫। ঘুঘু (Streptopelia chinensis)
৪৬। রাজঘুঘু (Chalcophaps indica)
৪৭। বন মোরগ (Gallus gallus)
৪৮। সারস (Grus antigone)
৪৯। গো বক (Bubulcus ibis)
৫০। নল বক (Ixobrychus cinnamomeus)
৫১। কানি বক (Butorides stristus)
৫২। ডাউক (Metopidius indicus)
৫৩। পানকৌড়ি (Anhinga rufa)

▲ সারণি নং—৩

ত্রিপুরার অন্যান্য প্রাণী

১। কচ্ছপ (Morenia petersi)
২। টিকটিকি (Hemidactylus flaviviridis)
৩। তক্ষা (Gekko gecko)
৪। গিরগিটি (Calotes versicolor)
৫। আঁচিলা (Mabuya carinata)
৬। গোসাপ (Varanus monitor)
৭। আথাল কেচ্ছা (Typhlops sp.)
৮। অজগর সাপ (Python molurus)
৯। লাউডগাসাপ (Dryophis sp.)
১০। ফানক সাপ (Naja sp.)
১১। কুনো ব্যাঙ (Bufo malanosticstus)
১২। গেছো ব্যাঙ (Rhacophorus)
১৩। ব্যাঙ (Rana cyanophlyctis)
১৪। কোলা ব্যাঙ (Rana tigrina)

▲ সারণি নং—৪

ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রকার বাঁশ

১। মুলি (Melocanna bambusoides Trin)
২। বরাক (Bambusa balcooa Roxb.)
৩। কালি (B. nutans wall ex. Munro)
৪। মাকাল (B. Pallida Munro)
৫। মিতৃঙ্গা (B. tulda Roxb.)
৬। ডলু (Neobouzeaua dullooa A. Camus)
৭। পেছা (Dendrocalamos hamiltonii Nees & Arn ex Munro)
৮। রুপাই (Dedrocalamus longispathus Karz)
৯। কালাই (Oxytenanthera nigrociliata Munro)
১০। পারুয়া (Bambusa teres Ham, ex wall)

চতুর্দশ অধ্যায়

জুমিয়া পরিকল্পনা প্রণয়ন

ত্রিপুরারাজ্যে জুমিয়া পুনর্বাসন প্রকল্প শুরু হয়েছে স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার জুমিয়া পরিবারগুলিকে স্থায়ী ভাবে নির্দিষ্ট জায়গায় বসবাস করানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরণের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করলেও দেখা যায়, বাস্তবিক ক্ষেত্রে পুনর্বাসন প্রকল্প থেকে বেশির ভাগ জুমিয়া পরিবারগুলি প্রকল্পের অনুদানের কাজ বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় জুম জমির খোঁজে অন্যত্র চলে যায়। এর কারণগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, জুমিয়াদের পুনর্বাসনের জন্য প্রকল্পে বরাদ্দকৃত সাহায্য সহায়তা সুষ্ঠ ভাবে বিলি বণ্টনের মধ্যে বিবিধ অন্তরায় বিদ্যমান। জুমিয়া পরিবার-গুলিকে যে কোনো প্রকার সাহায্য স্থানীয় নেতা, সর্দার, গ্রুপলিডার ইত্যাদির মাধ্যমে সরকারি কর্মচারী বিলি বণ্টন করে। ফলে দীর্ঘ শৃঙ্খলের মাধ্যমে সুষ্ঠু বিলি বণ্টনের সমস্যা বিরাজমান। অন্যদিকে প্রত্যন্ত অঞ্চলের জুমিয়া প্রকল্পে সময়মত সহায়ক সামগ্রী পৌঁছানো কষ্টসাধ্য ব্যাপার। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অসময়ে সহায়ক সামগ্রী পেয়ে জুমিয়ারা এইগুলির অপচয় করে। তা ছাড়া নগদ অর্থ ব্যতীত অন্যান্য সহায়ক সামগ্রী গ্রহণে জুমিয়াদের অনীহা। উপরন্তু পূর্বের জুমিয়া পুনর্বাসন প্রকল্পের পরিকল্পনার মধ্যে কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়েছে। অন্যদিকে পুরাতন জুমিয়া পুনর্বাসন প্রকল্প থেকে সরে গিয়ে নতুন ভাবে জুমিয়া জীবনযাপন করলে নতুন ভাবে অন্যান্য সরকারি অনুদান, প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা পেতে কোনো প্রকার বাধা নিষেধ নেই। সর্বোপরি জুমচাষ জুমিয়া উপজাতিদের জীবনধারা, কৃষ্টি এবং সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাই জুমচাষকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে শুধুমাত্র কৃষি, উদ্যান, বাগিচা ফসল, পশুপালন, মৎস্যচাষ, ক্ষুদ্রশিল্প, কুটির শিল্পের মাধ্যমে জুমিয়া পুনর্বাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন সুষ্ঠুভাবে সম্ভবপর হয়নি।

বর্তমানে প্রয়োজন, প্রকৃত উপজাতি জুমিয়া পরিবারগুলিকে সঠিকভাবে সনাক্ত করা এবং জুমিয়া পাড়ায় অর্থাৎ জুমিয়ারা বর্তমানে যেখানে বসবাস করে, সেখানকার স্থানীয় সম্পদের সমীক্ষা করে জুমিয়াদের নিজস্ব আবাসস্থলে স্থায়ী ভাবে বসবাস করানোর উদ্দেশ্যে জুমিয়াদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাক্রমে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

ভূমি, জল এবং বন ত্রিপুরার অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদ। বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য এই প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছ এবং বেপরোয়া ব্যবহারের ফলে বহুমুখী সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। সমস্যাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

১। বেপরোয়া ভাবে লাকড়ি এবং কাঠ সংগ্রহের ফলে প্রাকৃতিক বনসম্পদের ধ্বংস এবং অধিক পরিমাণ বনভূমি আবাদ করে চাষআবাদ, রাস্তাঘাট, ইটভাটা, ঘরবাড়ি, জলাশয় খনন, ইত্যাদির জন্য ব্যবহার করা।

২। বিশাল বনভূমি বিশেষ করে বাঁশবনে চিরাচরিত পদ্ধতিতে জুমচাষের ফলে ভূমিক্ষয় এবং জল সংরক্ষণের বিপর্যয়।

৩। এলোপাথারি ভাবে গবাদি পশুর বিচরণের ফলে বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলের ক্ষতি সাধন।

৪। পরিকল্পনা মাফিক বনভূমি ব্যবহার না করায় বর্তমানে প্রায় ৬,২৮০০০ হেক্টর (প্রায় ৬০ শতাংশ) ভূমি বৃষ্টির দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। তার মধ্যে ১,০৭,৮৫১ হেক্টর (১০.৩ শতাংশ) ভূমি অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জুমচাষের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এছাড়া পতিত জমি এবং চাষআবাদের অযোগ্য সমস্যাগ্রস্ত জমির পরিমাণ প্রায় ৫৯, ৬১৮ হেক্টর (০.৭ শতাংশ)।

বেপরোয়া ভাবে নদীর অববাহিকা অঞ্চল, পাহাড়ের ঢাল এবং উঁচু পাহাড় পর্বত থেকে বনাঞ্চল ধ্বংসের ফলে গড়ানো জলের গতি বৃদ্ধি পায়, বৃষ্টির জলের সঙ্গে পাহাড় থেকে গাছপালা, বাঁশ ইত্যাদির জঞ্জাল, মাটি এবং বালি ইত্যাদি ছড়া, নদী নালার মধ্যে জমা হয় এবং নদীর বা ছড়ার গভীরতা কমে যায়। এছাড়া জলের স্রোতে বর্ষার সময়ে ছড়া এবং নদীর পাড়ের মাটি ভেঙ্গে পড়ে, ছড়া এবং নদীর দিক পরিবর্তন হয়। দুকূল ছাপিয়ে বন্যা হয়। ফলস্বরূপ, বহু আবাদি জমির ওপর বালি জমে এবং চাষবাসের অনুপযুক্ত হয়। এছাড়া লক্ষ্য করলে দেখা যায়, খরাও প্রায় প্রতিবছর ত্রিপুরা রাজ্যে কম-বেশি হয়। ফলে, বৃষ্টি নির্ভর ফসলের এবং মাছ চাষের বিরাট ক্ষতিসাধন হয়। এছাড়া ত্রিপুরারাজ্যে বৈজ্ঞানিক জলসেচ ব্যবস্থার তেমন সম্প্রসারণ না হওয়ায় প্রতি বছর ছড়া এবং নদীর মধ্যে বিশেষ করে শুখা মরসুমে মৌসুমি বাঁধ দিয়ে অবৈজ্ঞানিক প্রথায় জলসেচের প্রচেষ্টার মাধ্যমে রবি ফসল চাষ করা হয়। অস্থায়ী মৌসুমি বাঁধগুলির দ্বারা সাময়িক চাষ আবাদ করা হলেও বর্ষার বৃষ্টির সময় এই সকল মৌসুমি বাঁধ ভেঙ্গে যায়। বাঁধসংলগ্ন বেশির ভাগ মাঠের দু পাশের মাটি ভেঙ্গে বহু আবাদি জমির ক্ষয়ক্ষতি হয়। তাই অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৌসুমি বাঁধের দ্বারা জলসেচ সুদূরপ্রসারি ভূমিক্ষয়ের অন্যতম কারণ। ত্রিপুরা রাজ্যের বনাঞ্চল ধ্বংসের চিত্র লক্ষ্য করলে দেখা যায়, প্রায় ৪০ শতাংশ বন ইতিমধ্যে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে। এছাড়া রাস্তাঘাট তৈরির মাধ্যমেও পাহাড়ি এলাকায় ভূমিক্ষয় ত্বরান্বিত হয়। উপরোক্ত সমস্যাগুলি উত্তরণের জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ জল, মাটি, বন ইত্যাদির উপযুক্ত সংরক্ষণের মাধ্যমে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা।

উপজাতি জুমিয়াদের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সামগ্রিক পরিকল্পনাকে এলাকাভিত্তিক ক্ষুদ্র পরিকল্পনায় (Micro planning) বিভক্ত করা আবশ্যক। ক্ষুদ্র পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় জুমিয়া পাড়া অথবা উপজাতি অধ্যুষিত গ্রামের সম্পদের সমীক্ষা করা বিশেষ করে পাড়া অথবা গ্রামের ভৌগোলিক অবস্থান, যোগাযোগ ব্যবস্থা,

স্বাস্থ্য কেন্দ্র, স্কুল, হাট-বাজার, নদী, ছড়া, এলাকার মাটির গঠন, গ্রন্থন, প্রকার, বর্তমান ফসল বিশ্লেষণ করে উদ্যান, বাগিচা ফসল, বনায়ন, বাঁশবন, জুম ফসলের এলাকা, জুমিয়া পরিবারের পশুপাখির সংখ্যা, ইত্যাদির পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে জুমিয়া পাড়ার জুমিয়া পরিবারগুলি আগামী দিনে কী ভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে চায় তাদের মতামত যাচাই এবং প্রাধান্য দিয়ে বাস্তবসম্মত প্রকল্প প্রণয়ন করে জুমিয়াদের সঙ্গে আলাপআলোচনার মাধ্যমে স্থির করা এবং প্রকৃত জুমিয়াদের দ্বারা বাস্তবায়ন করা উচিত।

উপজাতি জুমিয়া পাড়াগুলির জন্য স্বনির্ভর প্রকল্পের পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে যে সকল ধাপগুলি পালন করা প্রয়োজন তার মধ্যে প্রথম প্রয়োজন অবগত ভ্রমণ (Awareness visit)। অবগত ভ্রমণের মাধ্যমে এলাকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং জুমিয়াদের প্রাথমিক সমস্যা সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব। তারপর প্রকৃত জুমিয়া পরিবারগুলি সনাক্ত করে পরিকল্পনা প্রণয়নে অংশ গ্রহণ বা শরিক দল (Participant group) তৈরি করে এলাকার জৈব-ভৌত নিরীক্ষণে (Bio-physical study) এবং আর্থ-সামাজিক নিরীক্ষণের (Socio-economic study) কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভব। জুমিয়া পরিবারের আর্থ-সামাজিক নিরীক্ষণের কাজ সুষ্ঠু ভাবে সম্পাদন করার জন্য বৃহৎ অংশের প্রকৃত জুমিয়া এবং স্থানীয় উপজাতি সর্দার, প্রধান, গণ্যমান্য ব্যক্তি সকলের সঙ্গে মিলিত হয়ে আলাপ-আলোচনা এবং সভা করা (Meeting with Jhumias and local leaders) প্রয়োজন। সকলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে এলাকার স্থান বিবরণ সম্বন্ধীয় মানচিত্রে (Topographic mapping) সমতল টিলা, লুঙ্গা, কম ঢালু টিলা, খাড়া টিলার ঢাল, জলজমা লুঙ্গা ইত্যাদি মোটামুটি ভাবে সনাক্ত এবং চিহ্নিত করা যায়। এছাড়া এলাকার গাছ-গাছড়া সমুদয়ের মানচিত্রে (Vegetation mapping) বাঁশ বন, জুমফসল, গভীর বন, হালকা বন, বাঁশ, ছন এবং গাছের মিশ্র বন, সংরক্ষিত বন, আনারস, কাজুবাদাম, লেবু, কলা, কাঁঠাল ইত্যাদির বাগানও চিহ্নিত করা প্রয়োজন। অনুরূপ ভাবে এলাকার মৃত্তিকার মানচিত্রে (Soil mapping) বালি মাটি, দোআঁশ মাটি, এঁটেল মাটি, বেলে-দোআঁশ মাটি ইত্যাদি সনাক্ত করা আবশ্যক। উপরোক্ত পরিসংখ্যান সংগ্রহের পর ভূমি ব্যবহার মানচিত্রে (Land use mapping) বন, কৃষিভূমি, জুমচাষের ভূমি, উদ্যান ও বাগিচা ফসল, জলাশয়, ছড়া, বাড়িঘর, রাস্তা, গোচারণভূমি ইত্যাদির অবস্থান নির্ণয় করা যায়।

এলাকার স্থান বিবরণ, গাছ-গাছড়া, মাটি এবং ভূমি ব্যবহার ইত্যাদি তথ্য সুসংহত ভাবে সমন্বিত করে এলাকার ভূমির যোগ্যতার (Land Capability Classification) শ্রেণী বিন্যাস, (করলে) পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়ক হয়।

ত্রিপুরারাজ্যে জুমিয়া অধ্যুষিত ভূমির যোগ্যতা শ্রেণীবিন্যাস নিম্নলিখিত ভবে করা যেতে পারে—

(ক) টিলার উপরতল এবং সামান্য ঢালু টিলা ঃ জ্বলানী কাঠ, সেগুন, কৃষিজ ফসল, আঁখ, আনারস, গোখাদ্য

(খ) মাঝারি থেকে খাড়া ঢালু টিলা ঃ আনারস, আঁখ, বাঁশ

(গ) লুঙ্গাজমি ঃ ধান, বাঁশ, বেত, পাটিপাতা

(ঘ) নীচু জল জমা ওথলা জমি ঃ জলাশয় তৈরী, মাছ চাষ।

অন্যদিকে আর্থ-সামাজিক সমীক্ষার মাধ্যমে উপজাতি জুমিয়া পাড়ার পুরুষ এবং মহিলার সংখ্যা, উপজাতি সম্প্রদায়ের জাতের শ্রেণী, ধর্ম, প্রধান জীবিকা, শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয়। ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি জুমিয়াদের বর্তমান আর্থ-সামাজিক সমস্যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নিরক্ষরতা, কুসংস্কার, গোঁড়ামি, পানীয় জলের অভাব, অপ্রতুল যোগাযোগ ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য পরিষেবার অভাব, সুদখোর মহাজনদের খপ্পরে পড়া, অতিরিক্ত মদ্যপান ইত্যাদি।

নীচে উপজাতি জুমিয়া পাড়ার পরিকল্পনা প্রণয়নের নক্সা দেওয়া হল ঃ

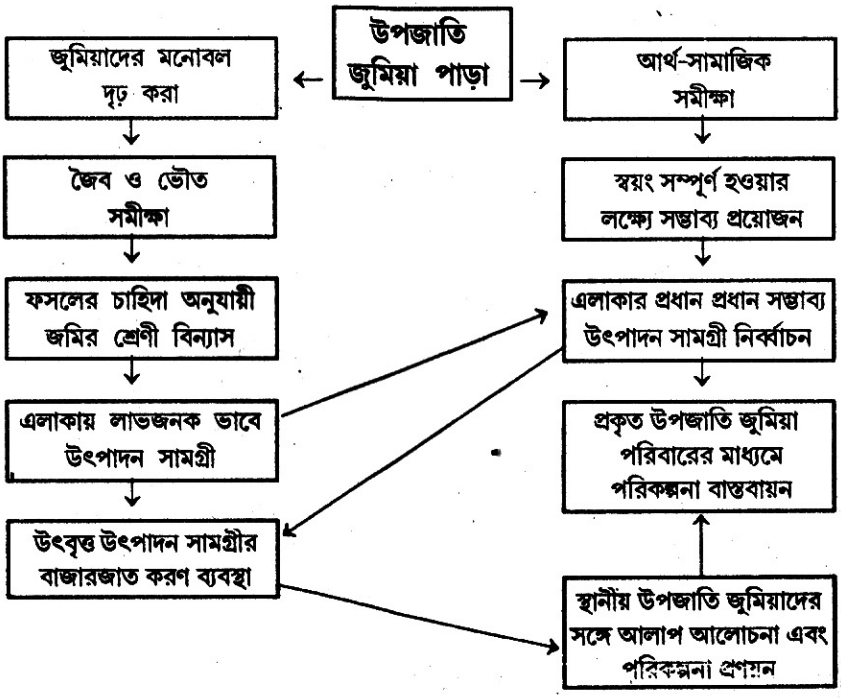

জুমিয়া উপজাতিদের প্রধান গৃহপালিত পশুর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শূকর, মহিষ, গরু, ছাগল, মুরগী ইত্যাদি। একটি গরুর জন্য বছরে ২১৬০ কিলোগ্রাম ঘন গোখাদ্য এবং একটি ছাগলের জন্য বছরে ৭৮০ কিলোগ্রাম ঘন খাদ্যের প্রয়োজন হয়। বর্তমানে জুমিয়া পরিবারের গবাদি পশুগুলি বনজঙ্গলে চড়ে বেড়ায় ফলে বহুমূল্যবান গাছ-গাছড়া ও বিনষ্ট হয় তাই পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় এলাকার গৃহপালিত পশুপাখির জন্য নির্দিষ্ট গোচারণ ভূমি সংরক্ষিত রাখা আবশ্যক।

বর্তমানে জুমিয়া পরিবারগুলি জ্বালানি কাঠ বা লাকড়ি সংগ্রহের জন্য আশপাশের বনজঙ্গলের ওপর নির্ভরশীল। মাথাপিছু প্রতি বছর এক জন লোকের রান্নার জন্য ০.৮০৬ কিউবিক মিটার লাকড়ি বা জ্বালানী কাঠ যথেষ্ট। কিন্তু, বর্তমানে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে অধিক পরিমাণ বনাঞ্চল ধ্বংস করে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করা হয়। বর্তমানে বাঁশ, বনমালা, কনক, জাগুরা ইত্যাদি গাছ লাকড়ির জন্য জুমিয়ারা অধিক পরিমাণ সংগ্রহ করে। তাই উপজাতি জুমিয়া পরিবারগুলির জন্য পরিকল্পনায় এই সকল গাছ-গাছড়ার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট এলাকা সংরক্ষণ করা আবশ্যক।

জুমিয়ারা বাড়ি ঘর তৈরি এবং কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি তৈরির জন্য কাঠ ব্যবহার করে থাকে। মাথাপিছু প্রতি বছর একজন লোকের জন্য ০.০২২ কিউবিক মিটার কাঠ প্রয়োজন হয়। কাঠের মধ্যে ত্রিপুরারাজ্যে গামার, করই, সেগুন, চামল, বানক, সুন্দী, কাইমালা, জারুল ইত্যাদি অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া কাঁঠাল, জাম, আম গাছের কাঠ ও ফল আজকাল জুমিয়াদের কাছে সমাদৃত। তাই পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় এই সকল গাছের বাগান জুমিয়া পাড়ার আশপাশে গড়ে তোলার সম্ভাব্য সংস্থান রাখা আবশ্যক।

মানুষের খাদ্যের চাহিদা নির্ধারণ করা হয় শরীরের প্রয়োজনীয় ক্যালরির হিসাবে। বিভিন্ন প্রকার খাদ্য যেমন ভাত, কন্দজাতীয় ফসল, শাকসব্জী, ডিম, মাছ, মাংস ইত্যাদি গ্রহণের পরিমাণের ওপর উপজাতি জুমিয়াদের খাদ্যশক্তি নির্ভর করে। ত্রিপুরার উপজাতি জুমিয়া পরিবারগুলি খাদ্যের জন্য প্রধানত জুমে উৎপাদিত অথবা রেশনের চাউল, বুনো শাকসবজী, বাঁশ করুল, বুনো আলু এবং গৃহপালিত শূকর, মুরগী ইত্যাদির মাংস এবং ছড়া ও নদীনালার মাছ, শামুক, কাঁকড়া, বাজারের শুকনো মাছের ওপর নির্ভরশীল। মোটামুটি ভাবে মাথাপিচু ১৮৫ কিলোগ্রাম চাউলের ভাত প্রতি বছর গড়ে হিসাব করা হয় যেহেতু উপজাতি জুমিয়ারা অধিক পরিশ্রম করে, মাথাপিছু চাউলের পরিমাণ সামান্য অধিক হিসাব করা বাঞ্ছনীয়। তাই বর্তমানে জুমিয়াদের জন্য পরিবারের জনসংখ্যা হিসাব করে প্রতি পরিবার পিছু নির্দিষ্ট জুমের এলাকা যৌথ ভাবে চিহ্নিত করে পরিকল্পনায় সংস্থান রাখা প্রয়োজন, যতদিন জুমিয়া পরিবার স্থায়ী টেকসই চাষ আবাদে অভ্যস্ত হয়, ততদিন উন্নত পদ্ধতিতে জুম চাষের ব্যবস্থা প্রকল্পে রাখা হলে উপজাতি জুমিয়া পরিবারগুলি অনাহার অথবা অর্ধাহারের হাত থেকে মুক্তি পাবে।

সম্ভাব্য জুমিয়া পাড়ার আশপাশে সমতল জমিতেও চাষ আবাদে এই সঙ্গে প্রচেষ্টা চালানো উচিত, যেন আজকের জুমিয়া কৃষক আগামীদিনে বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক চাষ আবাদের মাধ্যমে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং খাদ্যে স্বয়ংম্ভর হতে পারে।

বাঁশ উপজাতি জুমিয়াদের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। উপজাতি জুমিয়াদের হাতের টাকল এবং বাঁশ জীবন নির্বাহের প্রধান সহায়। বাঁশ করুল (বাঁশের কচি চারা) খাদ্য হিসাবে বহুল ব্যবহৃত হয়। ত্রিপুরার উপজাতি জুমিয়াদের কাছে বাঁশ অর্থকরী ফসল (Cash crop) হিসাবে সমাদৃত। বাঁশ বিক্রি করে অনেক জুমিয়া পরিবার সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করে থাকে। এছাড়া বাঁশ লাকড়ি হিসাবে, পূজা পার্বণে, ভাত তরকারি রান্না করার পাত্র হিসাবে, বাজার থেকে কেরোসিন, সরিষার তেল বাড়ি নেওয়ার পাত্র হিসাবে, দই, দুধ বাজারে বিক্রি করার জন্য বাঁশের চোঙ বহুল ব্যবহৃত হয়। বাড়ি ঘর তৈরি এবং বেড়া দেওয়ার জন্য, বাঁশের ঝুড়ি, মাছ ও বুনো পশুপাখি ধরার ফাঁদ তৈরি ইত্যাদি উপজাতি জুমিয়াদের বহুমুখী কাজে বাঁশের বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। সাধারণ হিসাবে বছরে মাথাপিছু প্রায় ৪৩টি বাঁশ প্রয়োজন হলেও উপজাতি জুমিয়াদের বাঁশের চাহিদা অনেক বেশি। বাঁশ ব্যতীত জুমিয়া পরিবার জল ছাড়া মাছের ন্যায় অবস্থার সম্মুখীন হয়। তাই জুমিয়াদের জন্য প্রকল্প পরিকল্পনা এবং প্রণয়নের সময় প্রয়োজনীয় পরিমাণ এলাকায় বাঁশ বাগান গড়ে তোলার এবং বর্তমান বাঁশ বন সংরক্ষণের ওপর অবশ্যই গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক। অন্যদিকে ত্রিপুরার উপজাতি জুমিয়া বন থেকে ছন (Sun grass) সংগ্রহ করে নিজের ঘর ছাউনি দেয় এবং বাঁশের ন্যায় অর্থকরী ফসল হিসাবে ত্রিপুরার বাজারে ছন বহুল বিক্রি হয়। এছাড়া জুমিয়া পরিবারগুলি বনজঙ্গল থেকে ঔষধি গাছ-গাছড়া, লতাপাতা, বিভিন্ন বুনো ফল (হরীতকী, বয়রা, আমলকি ইত্যাদি), বিভিন্ন বুনো গাছের বীজ, বুনো মাশরুম ইত্যাদি সংগ্রহ করে নিজেদের চাহিদা মেটায় এবং অনেক সময় স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে সংসারের অন্যান্য খরচ মেটায়। ঔষধি গাছের সংরক্ষণ এবং সম্ভাব্য নতুন বাগান তৈরি করার সংস্থানও পরিকল্পনায় রাখা উচিত।

পূর্বের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় জুমিয়া পুনর্বাসন প্রকল্পে দীর্ঘমেয়াদী ফসল বিশেষ করে উদ্যান ও বাগিচা ফসল অন্তর্ভুক্ত করা হলে গাছ রোপণের প্রায় ৬-৭ বছর সময় নেয় গাছ ফলবতী হতে। এই দীর্ঘ সময় জুমিয়া পরিবারগুলি আর্থিক অসঙ্গতির কারণে অন্যত্র চলে যায়। তাই দীর্ঘমেয়াদী উদ্যান, বাগিচা ও বনজ ফসল বিশেষ করে নারিকেল, সুপারি, আম, কাঁঠাল, লেচু, সফেদা, রাবার, সেগুন, গামার, ইত্যাদি প্রচুর চারা জুমিয়াদের মধ্যে বিতরণ করা হলেও তেমন উল্লেখযোগ্য কৃতকার্য পরিলক্ষিত হয় নি। তাই এ সকল গাছ ফলবতী বা বাজারজাত করার সময় পর্যন্ত স্বল্পমেয়াদী ফসল যেমন আনারস, কলা, পেঁপে, লেবু ইত্যাদি এবং কৃষিজ ফসল, শাকসবজী, মাশরুম চাষ, মৌমাছি পালন ইত্যাদির সংস্থানও উপজাতি জুমিয়াদের

পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় রাখা আবশ্যক যেন জুমিয়া পরিবার পুনর্বাসনের পর স্বল্প সময়ের মধ্যে নিয়মিত আয়ের পথ দেখতে পারে।

প্রণয়নে বলা প্রয়োজন, জুমিয়াদের স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার লক্ষ্যে প্রণোদিত প্রকল্পে বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক, যেন উপজাতি জুমিয়া সারা বছর কাজ করার সুযোগ পায়।

পুনর্বাসনে জুমিয়া নিজ জমিতে কাজ করার সুবাদে এবং স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে যে শ্রম প্রদান করবে তার বিনিময়ে প্রথম কয়েক বছর পারিশ্রমিক দেওয়ার ব্যবস্থা পরিকল্পনায় থাকা আবশ্যক। তারপর টেকসই এবং স্থায়ী চাষ আবাদে অভ্যস্ত হয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলে জুমিয়া স্বনির্ভর হবে এবং সরকারি অনুদান প্রয়োজনে কমিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

উপজাতি সম্প্রদায়ের নাম	পরিবারের সংখ্যা		মোট	জুমিয়া জনসংখ্যা			মোট
	গোঁড়া জুমিয়া	আংশিক জুমিয়া		পুরুষ	মহিলা	অপ্রাপ্ত বয়স্ক	
৭। মগ	৯৬৯	৮৯২	১৮৬১	৩১৭১	৩০৪০	৩৩১৬	৯৫২৭
৮। গারো	১১৮	৪০৬	৫২৪	১০১৬	৯৫১	৬৯৪	২৬৬১
৯। লুসাই	৩৯২	৯২	৪৮৪	৯৯৭	৯৬৪	৬৬৩	২৬২৪
১০। কুকি	১৬৬	১৫৭	৩৩৩	৬৭১	৬৪৬	৫৭৯	১৮৯৬
১১। মুন্ডা	১৩	১৬২	১৭৫	২৪৩	২৩৪	৪০৪	৮৮১
১২। উচই	০	৯৪	৯৪	১৩২	১৩৭	১৫৭	৪২৬
১৩। ওরাং	২৬	২৬	৫২	৭৪	৮০	১২৫	২৭৯
১৪। ভীল	৪	২৬	৩০	৩৬	৩২	৬১	১২৯
১৫। খাসিয়া	৮	২২	৩০	৩২	৩৪	৫১	১১৭
১৬। সাঁওতাল	৯	২	১১	১৬	১৬	১০	৪২
১৭। লেপচা	১	০	১	১	১	২	৪
মোট	২১৬৭৭	৩৩৩৭২	৫৫০৪৯	৯৬৬২৫	৯২৯৫৭	৯৮৮০৮	২৮৮৩৯০

ত্রিপুরারাজ্যে জুমিয়াদের মধ্যে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী কিছু জুমিয়া পরিবার আছে যারা জীবন জীবিকার জন্য এখনও শিকারি জীবন এবং জুম চাষের ওপর সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভরশীল তাদের বলা হয় গোঁড়া জুমিয়া (Hard core Jhumia)। আবার কিছু সংখ্যক জুমিয়া সমতল চাষ আবাদ, পশুপালন, মৎস্যচাষ ইত্যাদির সঙ্গে তাদের চিরাচরিত কৃষি রক্ষা করার এবং বাড়তি আয়ের জন্য জুম চাষ করে থাকে, তাদের বলা হয় আংশিক জুমিয়া। ১৯৮৭ সনের হিসাব অনুসারে ত্রিপুরারাজ্যে মোট ২৮৯০ টি উপজাতি জুমিয়া পাড়া ছিল। আবার উপজাতি পাড়ায় জুমচাষের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল এবং আংশিক নির্ভরশীল জুমিয়া পরিবারের সংখ্যা যথাক্রমে ২১৬৭৭ এবং ৩৩৩৭২, ত্রিপুরায় মোট জুমিয়া পরিবারের সংখ্যা ৫৫০৪৯ এবং সর্বমোট জুমিয়া উপজাতির জনসংখ্যা ছিল ২৮৮৩৯০।

১৯৮৭ সনের উপজাতি জুমিয়া পরিসংখ্যান লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ভুটিয়া এবং চাইমল উপজাতি জনগোষ্ঠী ত্রিপুরা রাজ্যে জুম চাষ করে না। কিন্তু বাকি ১৭টি উপজাতি সম্প্রদায় কম বেশি জুমচাষের সঙ্গে যুক্ত আছে।

ত্রিপুরারাজ্যের সমতল জমিগুলি বেশির ভাগ কৃষিজ ফসল উৎপাদনের জন্য বিশেষ উপযোগী, অন্যদিকে উঁচু পাহাড়ি এলাকাগুলি বৃষ্টিনির্ভর উদ্যান ও বাগিচা ফসল, গোখাদ্য এবং বনায়ন সৃষ্টির জন্য উপযোগী। উঁচু সমতল টিলা জমিতে বৃষ্টি নির্ভর কৃষিজ ফসলের উপযুক্ত জাত বাছাই করে চাষ করা সম্ভব। তাই জুমিয়া পরিবার গুলির উন্নতির জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের জলবায়ু, মাটি এবং ভৌগোলিক পরিবেশ অনুযায়ী কৃষিজ ফসল, গোখাদ্য, উদ্যান ও বাগিচা ফসল, শাকসব্জী, পশুপালন, বনায়ন,

❐ পঞ্চদশ অধ্যায়

জুমিয়া প্রকল্প বাস্তবায়ন

ত্রিপুরারাজ্যে বসবাসকারী জুমিয়া পরিবারগুলি বেশির ভাগ প্রত্যন্ত অঞ্চলে পাহাড়ের ওপর ছোট ছোট পাড়ায় বিক্ষিপ্ত ভাবে বসবাস করতে অভ্যস্ত এবং চিরাচরিত জুম ফসল, বনের বাঁশ, ফল, মূল এবং পশুপালন বিশেষ করে শূকর, মোরগ, মহিষ, গরু, ছাগল এবং নদী নালা ছড়া ইত্যাদির মাছ, শামুক ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীল।

এই রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থান, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং বিদ্যুৎশক্তি ইত্যাদির অভাবের কারণে বর্তমানে বড় শিল্প কারখানা স্থাপন এবং লাভজনক ভাবে পরিচালনা করা সম্ভবপর নয়।

অন্যদিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় ত্রিপুরা রাজ্যের প্রায় ৬০ শতাংশ এলাকায় পাহাড় পর্বত, যেখানে বেশির ভাগ জুমিয়া উপজাতি পরিবারগুলি বসবাস করে। পরিকল্পনা মাফিক বরাদ্দকৃত অর্থ জুমিয়া পরিবারগুলির জন্য ব্যয় করা হলেও বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় পরিকল্পনাগুলি সুষ্ঠু ভাবে প্রণয়ন করা সকল ক্ষেত্রে সম্ভবপর হয়নি। বেশীর ভাগ জুমিয়া পরিবারগুলি এখনো দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করে। তাই তাৎক্ষণিক প্রয়োজন, জুমিয়া পরিবারগুলির জীবনমান উন্নয়ন করা। পূর্বের জুমিয়া পুনর্বাসন প্রকল্প এবং উপজাতি জুমিয়া পরিবার গুলির উন্নতির জন্য অন্যান্য প্রকল্পগুলির ব্যর্থতার কারণসমূহ বিশ্লেষণে দেখা যায়, জুমচাষ জুমিয়াদের কৃষ্টি এবং সামাজিক রীতিনীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত। ফলে হঠাৎ জুম বন্ধ করে পুনর্বাসনের চেষ্টা করা হলে, জুমিয়া পরিবারগুলি পুনর্বাসন প্রকল্পের স্থান পরিত্যাগ করে জুমের জমির খোঁজে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায়।

ত্রিপুরারাজ্যে ১৯৮৭ সনের উপজাতি জুমিয়া পরিসংখ্যান।

উপজাতি সম্প্রদায়ের নাম	পরিবারের সংখ্যা		মোট	জুমিয়া জনসংখ্যা			মোট
	গোঁড়া জুমিয়া	আংশিক জুমিয়া		পুরুষ	মহিলা	অপ্রাপ্ত বয়স্ক	
১। ত্রিপুরী	৫৪০০	১০৩২১	১৫৭২১	২৮৬৩৬	২৭১০২	২৫০০৯	৮০৭৪৭
২। রিয়াং	৬৩৫৬	৭৪৪৫	১৩৮০১	২৫৩৪৪	২৪৪৯৬	২৪০৫১	৭৩৮৯১
৩। নোয়াতিয়া	৩৬৮১	৬৪১৬	১০০৯৭	১৪৮০০	১৪৩৩৭	২১০২৩	৫০১৬০
৪। চাকমা	১৮৪৯	৩১২৬	৪৯৭৫	৯৮৭১	৯৫৫৫	৮৪১১	২৭৮৩৭
৫। হালাম	১৭৫২	২১৬৯	৩৯২১	৬৬২৭	৬৩৩৭	৭৬০৭	২০৮৭১
৬। জমাতিয়া	৯৩৩	২০১৬	২৯৪৯	৪৯৫৮	৪৬৯৫	৬৬৪৫	১৬২৯৮

মৎস্যচাষ, ক্ষুদ্রশিল্প, কুটিরশিল্প ইত্যাদির সুসংহত সুষম ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা আবশ্যক।

▲ **কৃষিজ ফসল ঃ** ত্রিপুরারাজ্যে বৃষ্টিনির্ভর কৃষিজ ফসল ধান, ভুট্টা, রাগী, কাওয়ন ইত্যাদি উঁচু টিলা জমিতে চাষ করা সম্ভব। সেচ সেচিত নীচু জমিতে শীতকালীন সবজী, ভুট্টা (সর্ফেদ-২, ডেকান, বিজয়, কৃষাণ, নবজ্যোত), গম (সোনালিকা, জনক, ইউ. পি-২৬২) ধান (টি. আর. সি-২৪৬-১০, বিকাশ, জয়া) ইত্যাদির উপর জোর দিয়ে উপজাতি এলাকায় প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যায়। ডালশস্য বিশেষ করে খারিফ মরসুমে অড়হর (প্রভাত, টি-২১, ইউ. পি.এ.এস-১২০) কাউপি (সি-১৫২, পি.টি.বি-১, পুষা বৈশাখী, পুষা ফাল্গুনী, আসাম ভেলী), মুগ (কে-৮৫১), মাসকলাই (টি-৯, বি-৭৬, টি-২৭, পন্থ ইউ-৩০, ডব্লিউ. বি. ইউ-১০৮) এবং রবি মরসুমে মটর (রচনা, আরকেল, টি-১৬৩), ছোলা (বি-১০৮, জি-১৩০, সি-২৩৫), মসুর (বি-৭৭) ইত্যাদি ফসল চাষের এলাকা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। তৈলবীজের মধ্যে সরিষা (এম-২৭, টি-৯, বি-৯, বি-৫৪, টি-৪২, টি-৫৯) তিল (বি-৬৭, কৃষ্ণা), চীনাবাদাম (টি জি-৩, টি.এ.জি-২৪, জি.জি-৩, টি.জি.-২৬, আই.সি.জি.এস-৩৭, ডি.আর.জি-১২) চাষের ওপর আরো গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে। তন্তুজাতীয় ফসল মেস্তা ও তুলোর চাষ বৃদ্ধি করার সুযোগ বিদ্যমান। বিশেষ করে মেস্তার জাত (এইচ. সি-৫৮৩, এইচ এস. ৪২৮৮, এইচ. এস-৭৯১০) এবং তুলোর জাত গারো হিল, চিটাগাং হিল ইত্যাদি জুমের মধ্যে মিশ্র ফসল হিসাবে চাষ করে এলাকা বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। শর্করা জাতীয় ফসল আখ ত্রিপুরা রাজ্যের উঁচু টিলা জমিতে বৃষ্টি নির্ভর ফসল হিসাবে ভাল ভাবে চাষ করা যায়। ত্রিপুরার উপযোগী আখের উন্নত জাতগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কো-৪১৯, কো-৯৯৭, কো-৬২১৭৫ এবং কো-৯৯৭ মিউটিন্ট) এবং বছরে হেক্টর প্রতি ৪০-৫০ টন ফলন পাওয়া সম্ভব। উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে গোখাদ্য বিশেষ করে হাইব্রিড নেপিয়ার, প্যারা, দীননাথ ইত্যাদি ঘাসের চাষের উপর আরো নজর দেওয়া আবশ্যক।

▲ **উদ্যান ও বাগিচা ফসল ঃ** ত্রিপুরার জলবায়ু, মাটি এবং আবহাওয়ায় বিশেষ করে পাহাড়ি এলাকায় উদ্যান ও বাগিচা ফসল চাষের সম্ভাবনা অপরিসীম। উদ্যান ও বাগিচা ফসলের মধ্যে আনারসের জাত কিউ এবং কুইন পাহাড়ের ঢালের আড়াআড়ি রোপণ করা হলে ভূমি ও জল সংরক্ষণের সাথে সাথে হেক্টর প্রতি ৪০-৫০ টন ফল দিতে সক্ষম। কাজু বাদামের জাত বি. এল-১৩৯-১, এন. ডি. আর-২-১, বি. এল. ৩৯-৪ ত্রিপুরার পতিত টিলা জমিতে বিনা যত্নে হেক্টর প্রতি গড়ে ৯-১০ কুইন্টাল ফল দেয়। উপজাতি জুমিয়া অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে কমলার স্থানীয় জাত, লেবু, কাগজী বাতাবিলেবু ইত্যাদির ফলন ও আশাব্যঞ্জক। কাঁঠালের স্থানীয় জাত, কলা (চাঁপা, সমা আনাজী, সবরি) আম, (হিমসাগর, আম্রপালি, মল্লিকা), লিচু (বোম্বাই, মুজফ্‌রপুর), পেয়ারা (এলাহাবাদ সফেদা, এল-৪৯), সফেদা (ক্রিকেট বল), পেঁপে (হনিডিউ, রাঁচি, কো-

ইত্যাদি ফল চাষের এলাকা এবং উৎপাদন বাড়ানোর সুযোগ বিদ্যমান। নারিকেল (ওয়েস্ট কোস্ট টল, ইস্ট কোস্ট টল, কেরালা, সাক্ষীগোপাল), সুপারি বদরপুর, মঙ্গলা, মহুয়া) নীচু পাহাড়ের ঢালে এবং মাছ চাষের মিনি ব্যারেজ, পুকুর পাড় এবং বসতবাড়ির ভিতর ও আশপাশের এলাকায় ভাল ভাবে চাষ করা সম্ভব। মূলজাতীয় ফসল যেমন শিমুল আলু (থাবরচোঙ্গ) উপজাতি জুমিয়াদের প্রিয় খাদ্য। উন্নত জাত এম-৪, এইচ-১৬৮৭, এইচ-৩৬৪১ চাষ করা হলে হেক্টর প্রতি ৩০-৪০ টন এবং মিষ্টি আলুর জাত-ক্রস-৪, ডি-৩৫ হেক্টর প্রতি ২০ টন ত্রিপুরার সমতল উঁচু টিলা জমি থেকে পাওয়া সম্ভব। এ ছাড়া টিলা জমিতে গ্রীষ্মকালীন বৃষ্টি নির্ভর শাকসব্জী, ডাঁটা, কুমড়ো, মুলো, বেগুন, ট্যাঁড়স, কাঁকরোল, লাউ, শশা, চালকুমড়ো, ওল, কচু ইত্যাদি ফসল উৎপাদনের জন্য আরো জোর দেওয়া যেতে পারে। গাছ পান, বরোজ পান, আদা, হলুদ, দারুচিনি, গোলমরিচ, চা, কফি, কোকো, রাবার ইত্যাদি ফসলের ভবিষ্যৎও ত্রিপুরার উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে উজ্জ্বল।

▲ **প্রয়োজনভিত্তিক জুমিয়া প্রকল্পে জুম চাষ ঃ** ধান, ভুট্টা, তিল, ডালশস্য, মেস্টা, মশলা এবং শাকসব্জী ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ফসল জুম চাষে মিশ্র ফসল হিসাবে একই সঙ্গে চাষ করা হয়। জুমচাষে কিছু কিছু বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। যেমন, গভীর এবং অগভীর মূল যুক্ত ফসল, দীর্ঘমেয়াদী এবং স্বল্পমেয়াদী ফসল, মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে সহায়ক, এমন ফসল চাষের সুশৃঙ্খল সমন্বয় সাধন ও সারা বছর জুমিয়া পরিবারের কর্মসংস্থানের সুযোগ মোটামুটি একটি নির্দিষ্ট জমিতে বিদ্যমান। অন্যদিকে জুমচাষ ত্রিপুরার উপজাতি জুমিয়া সম্প্রদায়ের কৃষ্টি এবং সামাজিক রীতিনীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত। জুম চাষপদ্ধতি সহজ সরল, কারণ জুম চাষের জমি তৈরিতে লাঙ্গল, কোদাল, হালের বলদ, পাওয়ার টিলার ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না। জুমের ধান থেকে চাউল ও মদ উপজাতি জুমিয়াদের উপাদেয় বস্তু। জুমে উৎপাদিত তুলো থেকে সুতাপাছড়া, রিয়া, চাদর, গামছা রমণীরা ঘরে বসে কোমর তাঁতের সাহায্যে প্রস্তুত করতে অভ্যস্ত। এছাড়া জুমে উৎপাদিত অর্থকরী ফসল মেস্তা, তুলো, তিল, মশলা, শাকসব্জী ইত্যাদি বাজারে বিক্রি করে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী যেমন লবণ, কেরোসিন, শুটকি (শুকনো মাছ) ইত্যাদি ক্রয় করে থাকে। এই কারণে জুমিয়াদের উন্নতির জন্য আধুনিক ফার্মিং সিস্টেমে জুমচাষকে জুমিয়াদের মতের বিরুদ্ধে এক্ষুনি উপেক্ষা করা বা বন্ধ করা সম্ভবপর নয়। তাই প্রয়োজনে জুমিয়াদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ক্রমে প্রয়োজন চিরাচরিত জুমচাষের কুফলগুলি, যেমন বনায়ন ধ্বংসের কারণে ভূমিক্ষয়; বন্যা, খরা ইত্যাদি কারণসমূহ জুমিয়া চাষী ভাইদের পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দেওয়া একই সঙ্গে জুমের নিম্নমুখী ফলন প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে বিক্ষিপ্ত ভাবে জুম চাষ না করে যৌথভাবে বা সংঘবদ্ধ ভাবে জুমিয়া পাড়ার সকলে একটি নির্দিষ্ট স্থানে জুমের জমি নির্বাচন করা। জুমচাষের নির্ধারিত এলাকার চার পাশে অবশ্যই অগ্নিনিরোধক গণ্ডী (Fire line) তৈরি করা, জুমের জমি নির্ব্বাচনের সময় বেশি খাড়া ঢালু জমির পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত সমতল

এলাকা বাছাই করা, স্থানীয় জুম ফসলের নিম্ন ফলনশীল জাতের ব্যবহারের পরিবর্তে অধিক ফলন শীল জাত-জুমিয়াদের পছন্দ অনুযায়ী ব্যবহার করা, বীজ শোধন, সার প্রয়োগ, সময় মত বীজ বপন, আগাছা নিয়ন্ত্রণ, কৃষিশত্রু বিশেষ করে ফসলের রোগ, পোকা-মাকড়, ইঁদুর এবং বন্যপ্রাণীর হাত থেকে জুম ফসল রক্ষার সুসংহত ব্যবস্থা গ্রহণ করা, সময় মত ফসল তোলা, প্রক্রিয়াকরণ, সুষ্ঠুভাবে মজুদকরণ, বাজার জাতকরণ ইত্যাদির ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা। চিরাচরিত পদ্ধতিতে জুমচাষের জমির অবস্থান অনুসারে পাহাড়ের ঢালের আড়াআড়ি ১-২ মিটার এলাকায় মিশ্র ফসল চিরাচরিত পদ্ধতিতে রোপণ না করে সারিতে অড়হর, আঁখ, আনারস, পশুখাদ্য বিশেষ করে শিম্বীজাতীয় ফসলের একক ভাবে চাষ করা। এই ব্যবস্থা জুম চাষে গ্রহণ করা হলে ভূমি এবং জল সংরক্ষণে সহায়ক হবে।

যে-কোনো প্রকার উন্নত প্রযুক্তি জুমিয়াদের কাছে হস্তান্তরের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত প্রশিক্ষণ এবং ক্ষেত্র প্রদর্শনী চাষ ব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রে আলাপ-আলোচনা থেকে ও হাতেনাতে কাজ করিয়ে জুমিয়া উপজাতিদের জন্য প্রদর্শনী চাষের ওপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক। একই সাথে চাষের সহায়ক সামগ্রী যেমন উন্নত মানের বীজ, সার, রোগ ও কীটনাশক ঔষধ ইত্যাদি সময়মত জুমিয়া উপজাতিদের কাছে যোগান দেওয়ার সম্ভাব্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

উপজাতি জুমিয়া পরিবারগুলি প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাস করে এবং এই অঞ্চলগুলির যোগাযোগ ব্যবস্থা তেমন উন্নত নয়। তাই ফসল নির্বাচনের সময় একদিকে যেমন জুমিয়াদের নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে অন্যদিকে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত ফসল যেন সহজে বাজারজাত করে জুমিয়া উপজাতিরা লাভবান হতে পারে সে দিকে নজর রাখা আবশ্যক। অর্থাৎ এই সকল অঞ্চলে ফসল নির্বাচনের সময় দীর্ঘস্থায়ী, সহজে পচে না, ওজনে হালকা অথচ বাজারদর ভাল এমন ফসলের ওপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক।

▲ **কৃষি-উদ্যান-বনায়ন ঃ** ধীরে ধীরে জুম চাষ নিয়ন্ত্রণ এবং টেকসই চাষ আবাদে উপজাতি জুমিয়া পরিবারগুলিকে আনয়নের জন্য পাহাড়ি অথবা টিলা জমির ব্যবহার প্রত্যেক জুমিয়া পরিবার পিছু নিম্নবর্ণিত ভাবে করা যেতে পারে।

(ক) ১০-১৫% ঢালু জমি কৃষিজ ফসলের জন্য বরাদ্দ করা = ০.৪ হেক্টর।

(খ) ১৫-৩০% ঢালু জমি উদ্যান এবং বাগিচা ফসল চাষের জন্য বরাদ্দ করা = ১.২ হেক্টর।

(গ) টিলার ওপর অথবা ৩০ শতাংশের ওপরে ঢালু জমি বাসস্থান এবং বনায়নের জন্য বরাদ্দ করা = ০.৮ হেক্টর।

পরিবার পিছু বরাদ্দকৃত মোট জমির পরিমাণ = ২.৪ হেক্টর।

উপরোক্ত জমির জন্য জুমিয়া পরিবারকে কৃষি-উদ্যান-বনায়ন (Agri-Horti-Forestry) এর মাধ্যমে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা তৈরী করার সময় জমির অবস্থান, মাটির গ্রন্থন ও গঠন, যোগাযোগ ব্যবস্থা, জুমিয়া পরিবারের চাহিদা, পরিবারে কর্মক্ষম লোকসংখ্যা ইত্যাদি বিষয়গুলি বিবেচনা করা প্রয়োজন। পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় এবং ফসল নির্বাচনের সময় জুমিয়া পরিবারের পছন্দ, অপছন্দ ইত্যাদি বিষয়ের ব্যাপারও লক্ষ্য রাখা উচিত।

ত্রিপুরারাজ্যে বসবাসকারী উপজাতি সম্প্রদায়ের জুমিয়া পরিবারগুলির আবাস স্থানের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, রিয়াং এবং লুসাই সম্প্রদায় পাহাড়ের সর্বোচ্চ স্থানে ঘরবাড়ি তৈরি করতে পছন্দ করে। অন্যদিকে ত্রিপুরী, চাকমা, জমাতিয়া, মগ হালাম ইত্যাদি উপজাতিরা অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট পাহাড় অথবা পর্বতের পাদদেশে উঁচু টিলা ভূমি এবং পাহাড়ের ঢালে ঘরবাড়ি তৈরি করে বসবাস করতে পছন্দ করে। জাম্পুই এবং শাখান পাহাড়ে বসবাসকারী লুসাই সম্প্রদায় কমলা চাষে অভ্যস্ত, ডারলং কুকি সম্প্রদায় পাহাড়ে আনারস চাষে, খাসিয়ারা গাছ পান চাষে এবং জমাতিয়া ও চাকমা সম্প্রদায় সমতল জমিতে কৃষিজ ফসল এবং শাকসব্জী চাষে অভ্যস্ত হলেও সামাজিক কৃষ্টি এবং সংস্কৃতি রক্ষার কারণে এখনো আংশিক জুমচাষের ওপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে রিয়াং সম্প্রদায় অধিকসংখ্যক এখনও জুম চাষের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল এবং জুমের জমির খোঁজে পাহাড়ে পাহাড়ে অধিক ঘুরে বেড়ায় ফলে, স্থায়ী চাষআবাদে আকৃষ্ট করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। উত্তর ত্রিপুরা জেলায় লুসাই এবং রিয়াং সম্প্রদায়ের মধ্যে আজকাল দেখা যায় বিক্ষিপ্ত ভাবে জুম চাষ না করে পাড়ার সকলে মিলেমিশে একটি নির্দিষ্ট স্থানে সমবেত ভাবে জুমচাষ করে। এই পদ্ধতির মধ্যে সুবিধা হল সকলের আলাদা মালিকানা স্বত্ব থাকলেও জুমচাষের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম যৌথ ভাবে সম্পাদন করা সম্ভবপর হয়। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, যৌথ ভাবে জুমচাষের এলাকায় এক-দুই বছর জুম চাষ করার পর পরিত্যক্ত অবস্থায় কয়েক বছর পড়ে থাকে এবং পুনরায় ঐ জমিতে ঘুরে ফিরে জুম চাষ করা যায়। তাই জুমিয়া পাড়াগুলির আশপাশে বর্তমানে কিছু এলাকা জুম চাষের জন্য নির্ধারিত করে দেওয়া যেতে পারে এবং এই পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে কৃষি-উদ্যান-বনায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করে টেকসই চাষে জুমিয়া পরিবারগুলিকে আকৃষ্ট করা আবশ্যক।

গাছ পান বা খসিয়া পান এবং গোলমরিচ চাষ ও ত্রিপুরার পাহাড়ে লাভজনক ভাবে করা সম্ভব। জুমিয়া পরিবারগুলিকে গাছ পান চাষে আকৃষ্ট করা সম্ভব হলে জুমিয়া পরিবারগুলি নিয়মিত স্থানীয় বাজারে পান বিক্রি করে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করে জীবিকা নির্বাহ করতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়। অন্যদিকে জুমিয়াদের জন্য প্রকল্প প্রণয়নের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে দীর্ঘমেয়াদী উদ্যান, বাগিচা এবং বনজ ফসল যেমন নারিকেল, কাজুবাদাম, কাঁঠাল, লিচু, গামার, রাবার ইত্যাদির

আয় শুরু হওয়ার সাপেক্ষে স্বল্পমেয়াদী ফসল যেমন কৃষিজ ফসল, শাকসবজী, মাশরুম, আনারস, কলা, পেঁপে ইত্যাদির আয় থেকে জুমিয়া পরিবার প্রথম থেকে সংসারের খরচ চালিয়ে যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন উদ্যান, বাগিচা এবং বনায়নের প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় নিবিড় এলাকা (Compact area) বাছাই করা হলে কৃতকার্যতা অধিক পরিলক্ষিত হয়।

জুমিয়া পরিবারের জন্য বরাদ্দকৃত মোট ২.৪ হেক্টর জমি নিম্নবর্ণিত অনুক্রমে ব্যবহার অনুমোদন করা যেতে পারে।

(ক) ০.৪ হেক্টর সমতল অথবা টিলার ধাপে কৃষিজ ফসল ঃ

প্রথম ফসল	বপনে সময়	দ্বিতীয় ফসল	বপনের সময়	তৃতীয় ফসল	বপনের সময়
১। স্বল্পমেয়াদী ধান হীরা, কলিঙ্গ, নরেন্দ্র ৯৭	চৈত্র-বৈশাখ	চীনাবাদাম	আষাঢ়-শ্রাবণ	চীনা বাদাম মাঠে থাকবে	
২। তিল তিলোত্তমা, কৃষ্ণা	চৈত্র-বৈশাখ	কাউপি (সি-১৫২) মুগ (টি-৪৪)	আষাঢ়-শ্রাবণ	মাসকলাই (বি-৭৬) তোরিয়া সরিষা (এম-২৭, টি-৯, বি-৫৪)	ভাদ্র-আশ্বিন
৩। মুগ (কে-৮৫১)	ফাল্গুন-চৈত্র	অড়হর এবং রাগী মিশ্রচাষ	জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়	অড়হর মাঠে থাকবে	
৪। ধান, হীরা, ধলা হীরা	ফাল্গুন-বৈশাখ	মুগ অথবা কাউপি	আষাঢ় শ্রাবণ	তোরিয়া সরিষা বি-৫৪ এবং আঁখ মিশ্র চাষ কো-৯৯৭ কো-৪১৯)	ভাদ্র-আশ্বিন
৫। ধান নরেন্দ্র ৯৭	ফাল্গুন-বৈশাখ	মুগ অথবা কাউপি	আষাঢ়-শ্রাবণ	তোরিয়া সরিষা বি-৫৪ অথবা ভেইলী স্থানীয় জাত	ভাদ্র-আশ্বিন

(খ) ১.২ হেক্টর ঢালু ভূমি উদ্যান ও বাগিচা ফসল ঃ

কাজুবাদাম, কমলা, আনারস, সুপারি, পেঁপে, কলা ইত্যাদি। সুপারি গাছের গোড়ায় গাছ পান অথবা গোলমরিচ লতা রোপণ করা যেতে পারে।

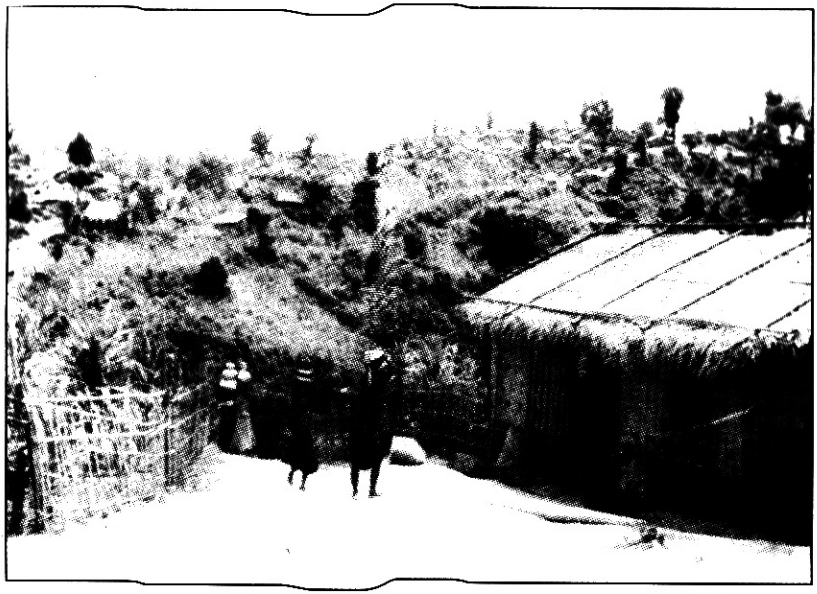

উপজাতি পাড়ায় জল পরিবহন

উপজাতি এলাকায় নদীনালা থেকে জল সংগ্রহ

উপজাতি জুমিয়া কৃষকের সাথে আলোচনায় লেখক

জুমিয়া অধ্যুসিত অঞ্চলে বাজার

পাহাড়ী ছড়ার জলে স্নান

(গ) ০.২ হেক্টর জমি জুমিয়া বাসস্থানের জন্য ব্যবহার করবে এবং ০.৬ হেক্টর জমিতে বনায়ন যেমন বাঁশ, গামার ইত্যাদি রোপণ করবে।

উপরোক্ত অনুক্রম ব্যতীত জমির অবস্থান অনুযায়ী জুমিয়া পরিবার নিম্নে দেওয়া অনুক্রমেও জমি ব্যবহার করতে পারে ঃ—

(ক) ০.২ হেক্টর জলাজমি মাছ চাষ

(খ) ০.২ হেক্টর লুঙ্গাজমি ধান চাষ

(গ) ১.২ হেক্টর টিলাজমি উদ্যান ও বাগিচা ফসল যেমন নারিকেল, সুপারি, কলা, পেঁপে, লেবু ইত্যাদি।

(ঘ) ০.২ হেক্টর, জমি জুমিয়া পরিবার বাসস্থানের জন্য ব্যবহার করবে এবং ০.৬ হেক্টর জমিতে বনায়ন যেমন বাঁশ, গামার ইত্যাদি রোপণ করবে।

পরিবার পিছু বরাদ্দকৃত মোট জমির পরিমাণ = ২.৪ হেক্টর।

▲ **সামাজিক এবং খামার বনায়ন ঃ**

সামাজিক এবং খামার বনায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ফল, জ্বালানী কাঠ এবং পশুখাদ্য উৎপাদন করে উপজাতি জুমিয়া কৃষক ভাইয়ের ভবিষ্যৎ নিজের পারিবারিক চাহিদা মেটানোর পর উদ্বৃত্ত ফসল বিক্রি করে বাড়তি আয় করতে পারে। তা ছাড়া সামাজিক বনায়ন এবং খামার বনায়ন প্রকল্প জুমিয়া চাষীভাই পতিত জমি, খামার বাড়ির চারপাশে এমন কি বসত বাড়িতেও সৃষ্টি করতে পারে। এতে জুমিয়া পরিবারগুলি সরকারি বনায়নে গিয়ে বাঁশ, ছন, লাকড়ি ইত্যাদি সংগ্রহের প্রবণতা কমবে। সামাজিক এবং খামার বনায়নের মাধ্যমে ভূমি ও জল সংরক্ষণ ব্যতীত প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করা এবং পরিবেশ দূষণ রোধ করতে সাহায্য করবে। ত্রিপুরার জলবায়ু এবং মাটিতে বসতবাড়ির চারপাশে এবং পতিত জমিতে, রাস্তার ধারে সামাজিক এবং খামার বনায়নের জন্য জুমিয়া উপজাতি কৃষক ভাইয়েরা যে সকল গাছ নির্বাচন করতে পারে সেগুলির উল্লেখযোগ্য হল—

১। বাঁশ (ঘর, বাড়ি, তৈরি, বেড়া দেওয়া, পশুখাদ্য কাগজের কলে এবং কুটির শিল্পে কাঁচা মাল হিসাবে বহুল ব্যবহৃত হয়) ২। গামার, সেগুন (কাঠ এবং লাকড়ি), ৩। আকাশমণি (লাকড়ি), ৪। গ্লাইরেসিডিয়া (সবুজ সার, পশুখাদ্য, লাকড়ী) ৫। আম, কাঁঠাল, চালতা, বাতাবীলেবু, আমলকী, বেল, তেঁতুল, আমড়া কাজুবাদাম, কামরাঙ্গা, গাব, জলপাই, জাম (ফল, লাকড়ি, কাঠ এবং পশুখাদ্য) ৬। নীচু জমিতে বেত, পাটিপাতা ইত্যাদি জুমিয়ার নিজের পারিবারিক চাহিদা এবং বিভিন্ন কুটির শিল্পে কাঁচা মাল হিসাবে সরবরাহ করা যায়।

▲ **পশুপালন ঃ** ত্রিপুরারাজ্যের বেশির ভাগ উপজাতিরা জীবিকার জন্য যদিও কৃষির উপর নির্ভরশীল কিন্তু লোকসংখ্যার অনুপাতে সমতল চাষযোগ্য জমির সীমাবদ্ধতার কারণে ত্রিপুরারাজ্যে জীবিকা নির্বাহের জন্য পাহাড়ি এলাকায় পশুপালন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বর্তমানে সমতল উপজাতি চাষীর বাড়িতে

দু চারটি শূকর, গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী, কবুতর, লালন পালন করতে দেখা যায়। এতে উপজাতি কৃষক ভাই নিজের বাড়ির দুধ, মাংস, ডিম ইত্যাদির যোগান দিয়েও সংসারের আয় বাড়াতে সক্ষম হয়। ছাগল, হাঁস, মুরগী, কবুতর ইত্যাদি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মহিলাদের নিজস্ব সম্পত্তি এবং এইগুলির আয় থেকে মহিলারা নিজেদের টুকি-টাকি খরচাপাতি মিটায়।

প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী জুমিয়া উপজাতি পরিবারগুলিতে শূকর, গরু, মহিষ, ছাগল, মুরগী ইত্যাদি সচরাচর কম বেশি দেখা যায়। উপজাতিদের বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান, পূজা পার্বণেও এই সকল গৃহপালিত পশুপাখি উৎসর্গ করে থাকে। তাই জুমিয়া উপজাতি পরিবারগুলির আর্থিক সচ্ছলতা এবং সংসারের বাড়তি আয়ের জন্য পশুপাখি পালনের ওপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক।

জুমিয়া উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে দুধ খাওয়ার অভ্যাস খুবই কম পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে মাংস, ডিম ইত্যাদি দুধ অপেক্ষা অধিক পছন্দ করে। গোঁড়া জুমিয়া (Hard core) পরিবার শূকর, মোরগ অধিক পরিমাণে পুষতে অভ্যস্ত। অন্যদিকে জুমচাষের ওপর আংশিক এবং সমতল জমি চাষের উপর আংশিক নির্ভরশীল এমন উপজাতি পরিবারগুলিতে গরু এবং মহিষ পুষে, প্রধানত জমি চাষ এবং মই দেওয়ার জন্য। আজকাল সমতল উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহে পাওয়ার টিলারের সাহায্যে জমির চাষাবাদ পরিলক্ষিত হয়। ফলে গরু মহিষ লালনপালন তেমন লাভ জনক নয়। এর প্রধান কারণ উপজাতি সম্প্রদায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেশী গরু এবং মহিষ লালন পালন করে থাকে, অন্যদিকে দেশী গরু এবং মহিষের দুধ উৎপাদন ক্ষমতা কম হওয়ায় তেমন লাভজনক নয়। তবে সমতলের উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে দুধ বিক্রি করার কোন অসুবিধা নেই। কারণ, গ্রামাঞ্চলের গোয়ালারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে দুধ সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। বর্তমান প্রয়োজন দেশী গরু মহিষগুলিকে উন্নত প্রজাতির গরু-মহিষ দ্বারা সংকরায়ণের মাধ্যমে উন্নীত করা, যাতে ত্রিপুরার উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের গরু-মহিষের রোগ সহনশীল ক্ষমতা বজায় থাকে এবং অধিক দুগ্ধ উৎপাদনের মাধ্যমে উপজাতি কৃষক ভাইয়েরা উপকৃত হতে পারেন।

উপজাতি জুমিয়া পরিবারগুলি দেশী মোরগ পালনে পারদর্শী হলেও উন্নত জাতের মোরগ উপজাতি অধ্যুষিত পাড়ায় বা গ্রামে তেমন নজরে পড়ে না। তাই মাংস উৎপাদনের জন্য ব্রয়লার এবং অধিক ডিম উৎপাদনে সক্ষম এমন জাতের মোরগ (হোয়াইট লেগ হর্ন) সরবরাহ করা এবং একই সঙ্গে বিজ্ঞানসম্মত লালনপালনের কলাকৌশল শিক্ষার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। অন্যদিকে স্থানীয় দেশী মোরগের সঙ্গে সংকরায়ণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

হাঁস এবং কবুতর পালন গোঁড়া জুমিয়া পরিবারগুলিতে দেখা যায় না। তবে সমতলে বসবাসকারী আংশিক জুমিয়া পরিবারগুলিকে হাঁস এবং কবুতর পালনে আকৃষ্ট করার সুযোগ বিদ্যমান।

উপজাতি জুমিয়া অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে সমতল জমির অভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বেশির ভাগ এলাকায় পর্যাপ্ত পরিমাণ পাহারী এলাকা বিদ্যমান। তাই উপজাতি জুমিয়া পাড়া গুলিতে ছাগল পালনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হলে উপজাতি জুমিয়া কৃষক ভাইয়েরা সহজে বাড়তি আয় করতে সক্ষম হবে। তবে এই ক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন, ছাগল চড়ানোর জন্য নির্দিষ্ট এলাকা নির্ধারণ করে দেওয়া আবশ্যক। যেন ছাগল পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘাস সারা বছর পায়। অন্যদিকে, ছাগল কৃষিজ ফসল এবং চারা গাছ খেয়ে কৃষকের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। তাই এই ব্যাপারে ছাগল পালন কর্মসূচীতে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

ছাগলের মাংস উপজাতিদের প্রিয় এবং বেশির ভাগ উপজাতি পূজা পার্বণে, সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে ছাগল উৎসর্গ করার রীতি উপজাতি সমাজে বিদ্যমান। তাছাড়া ত্রিপুরার সমতলী এবং পর্বতসন্তান অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহের বাজারগুলিতে ছাগলের মাংসের যথেষ্ট চাহিদা আছে। ছাগল লালনপালন পদ্ধতি খুবই সহজ, কম খরচ, অল্প যত্ন পরিচর্যাদি করে ত্রিপুরার জলবায়ুতে ছাগল পালন লাভজনক ব্যবসা ও বটে। ব্ল্যাকবেঙ্গল জাতের ছাগল জুমিয়াদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করা হলে দেশী জাতের সঙ্গে সংকরায়ণের মাধ্যমে উপজাতি জুমিয়া পরিবারগুলি উপকৃত হবে আশা করা যায়।

শূকর পালন উপজাতি জুমিয়া কৃষক ভাইদের কাছে গর্বের বিষয়। রিয়াং জুমিয়া পরিবারে যত অধিক সংখ্যক শূকর বিদ্যমান থাকে, সেই পরিবারের সামাজিক প্রতিপত্তি তত বেশি বলে গণ্য হয়। বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যের জুমিয়া পরিবারগুলি দেশী শূকর পালনে অভ্যস্ত। এই দেশী শূকর আকারে ছোট হওয়ায় কম পরিমাণ মাংস উৎপন্ন হয়। তাই দেশী জাতের শূকরের সঙ্গে উন্নত জাত যেমন ব্ল্যাক হ্যাম্পশিয়ার, হোয়াইট ইয়র্কসেয়ার ইত্যাদি জাতের শূকর বিতরণের ব্যবস্থা করা হলে সংকরায়ণের মাধ্যমে ত্রিপুরার দেশী জাতগুলির উন্নয়ন হবে এবং উপজাতি জুমিয়া কৃষক অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভবান হবে।

▲ **মৎস্যপালন ঃ** ত্রিপুরার উপজাতি জুমিয়াদের কাছে শুকনো মাছ খুবই প্রিয়। এছাড়া ডোবা, ছড়া ইত্যাদি থেকে মাছ শিকারেও উপজাতি জুমিয়ারা অভ্যস্ত। ত্রিপুরারাজ্যের উল্লেখযোগ্য স্থানীয় মাছের সারণি দেওয়া হল ঃ

১। কাতলা (Catla catla), ২। রুই (Labeo rohita), ৩। কালি বাউস (Labeo calabasu), ৪। ঘনিয়া (Labeo gonius), ৫। মৃগেল (Cirrihina mrigala), ৬। সরপুটি (Puntius sarana), ৭। তিত পুঁটি (P. ticti), ৮। পুঁটি (P. sophore), ৯। চন্দুলি (Aplocheilus panchax), ১০। দারকিনা (Esomus donricus), ১১। দলি পাবদা (Ompok bimaculatus), ১২। কালি পাবদা (Ompok pabda), ১৩। বোয়াল (Wallago attu), ১৪। টেংরা (Mystus vittatus), ১৫। বজরী

(Mystus tengra), ১৬। মাগুর (Clarios batrachus), ১৭। শিঙ্গী (Heteropneustes fossili), ১৭। কই (Anabas testudineus), ১৮। লাটি (Chanda punctatus), ১৯। শোল (C. striatus), ২০। গজার (C. marulius), ২১। উগল (C.smphibius), ২২। বেলে (Glossogobius giuris), ২৩। পাকাল (Mastacembalus pancalus), ২৪। কুছিয়া (Amphipnous cuchia)।

ত্রিপুরারাজ্যের উঁচু-নীচু দু পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে বাঁধ দিলে সহজে বৃষ্টির জল জমা হয় এবং জলাশয়ের সৃষ্টি হয়। তা ছাড়া সমতল অথবা অধিক নীচু এলাকায় পুকুর খনন করা হলে সংসারের যাবতীয় জলের যোগান এবং মাছ চাষ করা সম্ভবপর। ত্রিপুরা রাজ্যে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী লোঙ্গা জমিতে শুধু মাত্র এক পাশে বাঁধ দিয়ে জলাধার তৈরি করা কম ব্যয়সাপেক্ষ এবং মাছ চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই ধরনের জলাশয় 'মিনি ব্যারেজ' নামে বহুল পরিচিত। অন্যদিকে সমতল জমির অপ্রতুলতার কারণে পুকুর খনন অপেক্ষা মিনি ব্যারেজ জুমিয়াদের কাছে সমাদৃত। বর্তমানে জুমিয়া উপজাতি পরিবারগুলি তাদের প্রিয় শুকনো মাছের জন্য বাজারের ওপর নির্ভরশীল। তাই বর্তমানে জুমিয়াদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মিনি ব্যারেজ তৈরি, আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ এবং উদ্বৃত্ত মাছ শুকানোর কলাকৌশল ইত্যাদির ওপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, ত্রিপুরা রাজ্যের বেশির ভাগ মিনি ব্যারেজ প্রথম দুই তিন বছর গড়ে হেক্টর প্রতি ৫০০ কিলোগ্রাম টাটকা মাছ প্রতি বছর উৎপাদন সম্ভব পর, কারণ মিনি ব্যারেজগুলির মাটি প্রথম অবস্থায় খুবই উর্বর থাকে। জুমিয়া উপজাতি ভাইয়েরা মাছ চাষে সাধারণত সার, মাছের খাদ্য ব্যবহার করে না। তা ছাড়া মিনি ব্যারেজগুলির তলায় অতিরিক্ত বৃষ্টির সঙ্গে পাহাড়ের ওপর থেকে বালি এসে জমা হয়, ফলে মাছ উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য পায় না এবং ফলন নিম্নমুখী হয়। উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মাছের সুষম খাদ্যের প্রয়োগের ওপর গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক। অন্যদিকে বৃষ্টির সময় যেন অতিরিক্ত বালি এসে মিনি ব্যারেজের তলায় জমা হতে না পারে, তার জন্য পাহাড়ের ঢালুতে ব্যারেজের জলের ওপর তলের পাশে নালী তৈরি করে দেওয়া এবং কিছুদিন পর পর নালা সংস্কার করে বালি অপসারণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন ত্রিপুরার প্রত্যন্ত অঞ্চলের উপজাতিদের কাছে স্থানীয় শামুক, কাঁকড়া, কচ্ছপ, চিংড়ি, কুছিয়া মাছ ইত্যাদি উপাদেয় খাদ্য, কিন্তু ক্রমাগত এইগুলি শিকারের ফলে আজকাল এদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। তাই এই গুলির বৈজ্ঞানিক চাষপদ্ধতির মাধ্যমে সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ এক্ষুনি নেওয়া আবশ্যক, যাতে উপজাতি সম্প্রদায় তাদের প্রিয়খাদ্য বস্তু থেকে আগামী দিনে বঞ্চিত না হয়।

▲ **গ্রামীণ শিল্প** ঃ ত্রিপুরারাজ্যে ভৌগোলিক অবস্থান, অপ্রতুল যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ঘাটতি, শিল্প উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর বাজারজাতকরণ ইত্যাদি সমস্যার কারণে বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান লাভজনক ভাবে বর্তমানে চালানো কষ্টকর। অন্যদিকে ক্ষুদ্রশিল্প

নদীপথে বাঁশ পরিবহন

জ্বালানী বাঁশ সংগ্রহ

অর্থকরী ফসল ছন বাজারে বিক্রির উদ্দেশ্যে

এবং কুটির শিল্প ত্রিপুরারাজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কারণ ক্ষুদ্রশিল্প এবং কুটির শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এবং জনশক্তি ত্রিপুরায় বিদ্যমান। তাই জুমিয়া প্রকল্পগুলিতে জুমিয়া উপজাতিদের কৃষি, বনায়ন, পশুপালন এবং মৎস্যচাষের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্রশিল্প এবং কুটিরশিল্প তথা গ্রামীণ শিল্প বিকাশের মাধ্যমে বাড়তি আয়ের সংস্থান করার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। ক্ষুদ্র শিল্প এবং কুটির শিল্পের মাধ্যমে বাড়তি আয়ের জন্য জুমিয়াদের হাতে-কলমে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন যার মাধ্যমে জুমিয়া উপজাতি সম্প্রদায়গুলি কারিগরি কলাকৌশল সহজে লব্ধ করাতে পারে এবং নিজের সৃজনীশক্তি ও মেধাকে জীবন জীবিকা এবং দেশের উন্নতির জন্য সঠিক ভাবে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়।

এছাড়াও রেশম শিল্প জুমিয়াদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। যদি জুমিয়া পরিবার ০·৪ হেক্টর ঢালু টিলা জমিতে তুঁতে চাষ করে এবং প্রয়োজনীয় রেশম গুটি পোকার লালন পালন করে তবে সারা বছর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব। রেশম শিল্পে কৃষি এবং শিল্পের যৌথ সমন্বয় সাধিত হয়। কারণ তুঁতে চাষ এবং রেশম গুটি পোকার লালন পালন কৃষি নির্ভর কাজ আবার রেশম গুটি থেকে সূতা তৈরি এবং কাপড় বুনন শিল্প কলায় পরিপূর্ণ। রেশম শিল্পের মাধ্যমে উপজাতি জুমিয়াদের বাড়তি আয়ের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তুঁত গাছের উন্নত জাত যেমন কাভা-২, এস-১, এস-৭ এবং এস-৭৯৯ ব্যবহার করা যেতে পারে। অন্যদিকে রেশম মথের উন্নত জাত যেমন নিসটিড, নিসমো, নিসতারি এবং এফ-১ সংকর জাত ব্যবহার করা যেতে পারে। মহিলারা বাড়ি ঘরের কাজের ফাঁকে ফাঁকে রেশম পোকা লালনপালন করে সারা বছর আয় করতে পারে। জুমিয়া উপজাতিদের মধ্যে রেশম চাষ সম্প্রসারণের জন্য যে সকল বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক সেগুলি হল (১) উন্নত প্রথায় তুঁত চাষ (২) তুঁত গাছের যত্ন পরিচর্যা, রোগ-পোকার প্রতিকার (৩) উন্নত প্রথায় রেশম পলু লালনপালন (৪) পলুর রোগ ও তার প্রতিকার ব্যবস্থা (৫) গুটি থেকে সূতা কাটা ও তার ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা এবং (৬) রেশম শিল্পে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারি সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ইত্যাদি।

উপজাতি জুমিয়া পরিবারগুলি চিরাচরিত রীতিনীতি রক্ষণশীল। তাই শিল্পকলার নূতন প্রযুক্তি উপজাতি জুমিয়াদের গ্রহণ করানো খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তবে এই কথাও সত্যি প্রতিটি উপজাতি জুমিয়া পরিবারে কোমর-তাঁত বিদ্যমান। উপজাতি জুমিয়া মহিলারা জুমের তুলা থেকে বীজ আলাদা করা, সূতা তৈরি করা, রঙ করা, কাপড়ের নক্সা করা এবং নিজের পরিবারের প্রয়োজনীয় কাপড় কোমর-তাঁতের সাহায্যে বুননে পারদর্শী। তাই কোমর-তাঁতের পরিবর্তে উন্নতমানের তাঁতে কাপড় বুননের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনীয় উন্নত তাঁত সরঞ্জাম সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা

হলে ভবিষ্যৎ এ জুমিয়া রমণীরা সংসারে বাড়তি আয় সংযোজন করতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।

ত্রিপুরারাজ্যে গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মধ্যে যেগুলি উপজাতি জুমিয়া প্রকল্পে এবং স্থানীয় বাজারে চালু করা সম্ভব সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল হস্ত তাঁতশিল্প, দর্জির কাজ, বাঁশ বেতের কাজ, কাঠ মিস্ত্রীর কাজ, মৌমাছি পালন, মাশরুম চাষ, কামারের কাজ, কুমারের কাজ, রেশম শিল্প, সাইকেল রিক্সা, অটো মেরামতি, রেডিও, টি. ভি. মেরামতি, তেলের ঘানি, ধান, গম ভাঙ্গার কল, মোমবাতি তৈরি, মেছ তৈরি, পাঁপর তৈরি, ধূপকাটি তৈরি এবং ছোটখাটো কারিগরি ব্যবসা-বাণিজ্য যেমন ছাতি, টর্চ লাইট ইত্যাদি মেরামতির কাজ।

এই কথাও সত্যি স্বাধীনতা লাভের প্রায় ৫০ বছর পরও ত্রিপুরা রাজ্যে জুম চাষ সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি এবং উপজাতি জুমিয়ারা এই মুহূর্তে জুম চাষ ছাড়তে নারাজ। ফলে জুমচাষ ত্রিপুরারাজ্যে আরো কিছুদিন চলবে মনে হয়। তবে জুমিয়া প্রকল্পে গ্রামীণ শিল্পগুলি বাছাই করার সময় জুমিয়াদের পছন্দ-অপছন্দকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে, যাতে জুমচাষ, কৃষি, উদ্যান ও বাগিচা ফসল, বনায়ন, পশুপালন, মৎস্যচাষ ইত্যাদির সঙ্গে জীবনজীবিকার মান উন্নয়নের জন্য উপজাতি জুমিয়া পরিবারগুলি নিজের পছন্দসই গ্রামীণ শিল্পগুলি স্বতস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়।

জুমিয়া প্রকল্পে কৃষির অর্থনীতি

▲ জুম চাষের অর্থনীতি (এলাকা এককানি = ১৬০০ বর্গমিটার)

(ক) বীজ।

খরচের হিসাব		বীজের পরিমাণ ও মূল্য প্রতি কিলোগ্রাম (টাকা)		চিরাচরিত পদ্ধতিচাষ (টাকা)	উন্নত পদ্ধতিচাষ (টাকা)
১। জুম ধান (মাই)	=	১২ কিলোগ্রাম @ ১০	=	১২০.০০	১২০.০০
২। [illegible] (সিপিং)	=	৩০০ গ্রাম @ ৩০	=	৯.০০	৯.০০
৩। [illegible] ([illegible])	=	৫০০ গ্রাম @ ৩০	=	১৫.০০	১৫.০০
৪। [illegible] (মাসিকা)	=	১৫০ গ্রাম @ ২৫	=	৩.৭৫	৩.৭৫
৫। [illegible] ([illegible])	=	১০ কেজি @ ১০	=	১০০.০০	১০০.০০
৬। [illegible] ([illegible])	=	১ কেজি @ ১০	=	২০.০০	২০.০০
৭। [illegible] (মাসিংমা) [illegible] (মাই এ্যাও)	=	৩০০ গ্রাম @ ২৫	=	৭.৫০	৭.৫০
৮। [illegible] ([illegible])	=	২০০ গ্রাম @ ৩০	=	৬.০০	৬.০০
৯। [illegible] ([illegible])	=	২৫০ গ্রাম @ ৩০	=	৭.৫০	৭.৫০
১০। [illegible] ([illegible])	=	১০০ গ্রাম @ ৫০	=	৫.০০	৫.০০
১১। [illegible] ([illegible])	=	৩০০ গ্রাম @ ৫০	=	১৫.০০	১৫.০০
১২। [illegible] ([illegible])	=	৫০ গ্রাম @ ১০০	=	৫.০০	৫.০০
১৩। [illegible] ([illegible])	=	২০০ গ্রাম @ ২৫	=	৫.০০	৫.০০
১৪। [illegible] ([illegible])	=	১৫০ গ্রাম @ ৫০	=	৭.৫০	৭.৫০
১৫। [illegible] ([illegible])	=	১৫০ গ্রাম @ ৫০	=	৭.৫০	৭.৫০
১৬। [illegible] ([illegible])	=	১০০ গ্রাম @ ৫০	=	৫.০০	৫.০০
১৭। [illegible] ([illegible])	=	২০০ গ্রাম @ ৩০	=	৬.০০	৬.০০
১৮। [illegible] ([illegible])	=	১০০ গ্রাম @ ৫০	=	৫.০০	৫.০০
১৯। [illegible] ([illegible])	=	১০০ গ্রাম @ ২৫	=	২.৫০	২.৫০
২০। [illegible] ([illegible])	=	৭৫ গ্রাম @ ২৫	=	০.৭৫	০.৭৫
মোট বীজের মূল্য			=	৩৫৩	৩৫৩

▲ শ্রমিক ও অন্যান্য খরচ ঃ

খরচের হিসাব	চিরাচরিত পদ্ধতির জুম চাষ		উন্নতপদ্ধতির জুম চাষ	
	শ্রমিক সংখ্যা	টাকা	শ্রমিক সংখ্যা	টাকা
১। জমি নির্বাচন	২	৮০	২	৮০
২। পূজা পার্বণ/সামাজিক রীতিনীতি	১	৪০	—	—
৩। পূজার দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য	—	৬০০	—	—
৪। জঙ্গল কাটা/পরিষ্কার	৭	২৮০	৭	২৮০
৫। আগুন নিরোধক গণ্ডি	৩	১২০	৩	১২০
৬। জুম পোড়ানো	১	৪০	১	৪০
৭। পোড়া যায়নি এমন বন জঙ্গল পরিষ্কার এবং পুনঃ পোড়ানো	৪	১৬০	৪	১৬০
৮। জুম পরিকল্পনা	২	৮০	২	৮০
৯। বীজ শোধন	—	—	১	৪০
১০। বীজ বপন	৩	১২০	৩	১২০
১১। সার প্রয়োগ	—	—	৩	১২০
১২। সারের মূল্য সুফলা ১৫ ঃ ১৫ ঃ ১৫ @ ৪০ কেজি/কানি প্রতি কিলো সুফলা @ ৮·৬৭ প.	—	—	—	৩৪৭
১৩। পাহাড়ার জন্য টং ঘর তৈরি ছন, বাঁশ ইত্যাদি সংগ্রহ সহ	১০	৪০০	১০	৪০০
১৪। বেড়া দেওয়া, বাঁশ, বেত সংগ্রহ সহ	৫	২০০	৫	২০০
১৫। আগাছা বাছাই				
(ক) প্রথম দফায়	১০	৪০০	১০	৪০০
(খ) দ্বিতীয় দফায়	১২	৪৮০	১২	৪৮০
(গ) তৃতীয় দফায়	৮	৩২০	৮	৩২০
১৬। রোগ-পোকার ঔষধ প্রয়োগ	—	—	২	৮০
১৭। ছত্রাক নাশক ও কীটনাশকের মূল্য	—	—	—	২০০
১৮। ফসল তোলা, মাড়াই-ঝাড়াই শুকনো ইত্যাদি	২০	৮০০	২৫	১০০০
১৯। গোলাজাতকরণ, মজুদকরণ	২	৮০	২	৮০
২০। ফসল পরিবহণ এবং বাজারজাতকরণ	১০	৪০০	২০	৮০০
মোট	১০০	৪৬০০	১২০	৫৩৪৭

∴ চিরাচরিত জুম চাষে সর্বমোট খরচ = (৪৬০০ + ৩৫৩) = ৪৯৫৩ টাকা
উন্নত পদ্ধতির জুম চাষে সর্বমোট খরচ = (৫৩৪৭ + ৩৫৩) = ৫৭০০ টাকা

▲ শ্রমিক ও অন্যান্য খরচ ঃ

ফসলের নাম	চিরাচরিত জুম চাষ পদ্ধতি		উন্নত পদ্ধতির জুম চাষ	
	ফলন	মূল্য (টাকা)	ফলন (কিগ্রা) সংখ্যা	মূল্য (টাকা)
১। ধান	১২০ কিগ্রা @ ৮ টাকা	৯৬০	২৫০ কিগ্রা	২০০০
২। তিল	৩০ ,, @ ২০ ,,	৬০০	৪০ ,,	৮০০
৩। কার্পাস	৭ ,, @ ৩০ ,,	২১০	১২ ,,	৩৬০
৪। অড়হর	২০ ,, @ ১৫ ,,	৩০০	২৫ ,,	৩৭৫
৫। কচু	৪০ ,, @ ৪ ,,	১৬০	৪৫ ,,	১৮০
৬। ভুট্টা	২০ ,, @ ৮ ,,	১৬০	২৫ ,,	২০০
৭। বাজরা	৩০ ,, @ ৮ ,,	২৪০	৩৫ ,,	২৮০
৮। কাওয়ন	৭ ,, @ ১০ ,,	৭০	১০ ,,	১০০
৯। মেস্টা	৩০ ,, @ ৫ ,,	১৫০	৪০ ,,	২০০
১০। বেগুন	৩৫ ,, @ ৫ ,,	১৭৫	৩৮ ,,	১৯০
১১। কাঁচামরিচ	৩০ ,, @ ৮ ,,	২৪০	৩৬ ,,	২৮৮
১২। জুম ধন্যা	১৫ ,, @ ৮ ,,	১২০	১২ ,,	৯৬
১৩। সীম	৩৫ ,, @ ৬ ,,	২১০	৩৮ ,,	২২৮
১৪। মারফা	৫০ সংখ্যা @ ৪ ,,	২০০	৫৫ সংখ্যা	২২০
১৫। চিনার	৬০ ,, @ ৫ ,,	৩০০	৬৮ ,,	৩৪০
১৬। শশা	৩০ ,, @ ৩ ,,	৯০	৩৩ ,,	৯৯
১৭। কুমড়ো	৭০ ,, @ ৫ ,,	৩৫০	৮৫ ,,	৪২৫
১৮। তরমুজ	৪০ ,, @ ৫ ,,	২০০	৩৮ ,,	১৯০
১৯। চালকুমড়ো	৪৫ ,, @ ৫ ,,	২২৫	৪৮ ,,	২৪০
২০। গাঁদাফুল	৫ কিগ্রা @ ১০ ,,	৫০	৭ কিগ্রা	৭০
		৫০১০		৬৮৮১

চিরাচরিত পদ্ধতিতে জুম চাষে মোট লাভ =
(মোট আয় ৫০১০ টাকা–মোট খরচ ৪৯৫৩ টাকা) = কানি প্রতি মাত্র ৫৭ টাকা।
উন্নত পদ্ধতিতে জুম চাষে মোট লাভ =
(মোট আয় ৬৮৮১ টাকা–মোট খরচ ৫৭০০ টাকা) = কানি প্রতি মাত্র ১১৮১ টাকা।

উপরোক্ত হিসাব ব্যতীত জুম চাষে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, জুমিয়া চাষী জুম ফসল রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য জুমের মধ্যে টং ঘরে বসবাস করে। এইক্ষেত্রে পাহারার জন্য জুমিয়া চাষীর শ্রম হিসাব করা হয়নি। তাই শুধুমাত্র চিরাচরিত জুম চাষের মাধ্যমে উপজাতি জুমিয়া চাষী কোনোদিন ভবিষ্যৎ-এ স্বাবলম্বী হতে পারবে না। বড় জোর গায়ে খেটে কষ্ট করে কোনো মতে বেঁচে থাকতে সক্ষম হবে। তাই জুমিয়াদের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য প্রয়োজন জুম চাষের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য টেকসই চাষবাস এবং বাড়তি আয়ের সংস্থান করা।

▲ ধান চাষের অর্থনীতি (এলাকা এক একর)

(বীজ উৎপাদন)

খরচের হিসাব		ছিটিয়ে বপন (বৃষ্টি নির্ভর)	রোপণ	
			(বৃষ্টি নির্ভর)	(সেচ)
১। বীজ ৪০ কিগ্রা @ ১৫ টাকা	=	৬০০	২০ কিলো @ ১৫ টাকা = ৩০০	২০ কিলো @ ১৫ টাকা = ৩০০
২। জৈবসার ১০ গরুর গাড়ি	=	১০০০	১৫ গরুর গাড়ি = ১৫০০	২০ গরুর গাড়ি = ২০০০
৩। অজৈব সার (নাঃ ফঃ পঃ/হেঃ)			(নাঃ ফঃ পঃ/হেঃ)	(নাঃ ফঃ পঃ/হেঃ)
(৪০ : ২০ : ২০ কিলো)			(৫০ : ২৫ : ২৫ কিলো)	(৭৫ : ৩৭·৫ : ৩৭·৫ কিলো)
(ক) ইউরিয়া = ৩৫ কিলো	=	১৩৭	৪৪ কিলো = ১৭২	৬৫ কিলো = ২৫৪
(খ) সুপার ফসফেট = ৫০ কিলো	=	১৯৯	৬২·৫ কিলো = ২৪৮	৯৪ কিলো = ৩৭৩
(গ) মিউরিয়েট পটাশ = ১৩·৫ কিলো	=	৯০	১৬·৫ কিলো = ১১০	২৫ কিলো = ১৬৫
৪। সার প্রয়োগ	=	৮০	১৬০	১৬০
৫। জমি তৈরি	=	৪০০	৪০০	৪০০
৬। বীজতলায় চারা উৎপাদন	=	—	৩০০	৩০০
৭। বপন/রোপণ	=	৮০	১৬০০	১৬০০
৮। আগাছা নিয়ন্ত্রণ	=	৪০০	৪০০	৪০০
৯। শস্য সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা	=	৫০০	৫০০	৭০০
১০। জল	=	—	—	৪০০
১১। ফসল কাটা	=	৪০০	৬৪০	৮০০
১২। পরিবহণ	=	২০০	৪০০	৪৮০
১৩। মাড়াই, ঝাড়াই, শুকানো এবং বাজার জাতকরণ	=	৮০০	৯৬০	১২০০
মোট খরচ	=	৪৮৮৬	৭৬৯০	৯৫৩২

আয়	ছিটিয়ে বপন বৃষ্টি নির্ভর	রোপণ	
		বৃষ্টি নির্ভর	সেচ
ধানের ফলন =	৮০০ কেজি ৮০০০	১২০০ কেজি = ১২০০০	১৬০০ কেজি = ১৬০০০
খড়ের মূল =	৫০০	১০০০	১০০০
মোট আয় =	৮৫০০	১৩০০০	১৭০০০
মোট খরচ =	৪৮৮৬	৭৬৯০	৯৫৩২
মোট লাভ =	৩৬১৪	৫৩১০	৭৪৬৮

▲ বরোজ পান চাষের অর্থনীতি (এলাকা = ০·১৩ হেক্টর)

(ক) বরোজ তৈরি		টাকা
১। জঙ্গল পরিষ্কার, জমি সমতল করা ইত্যাদি	=	২০০০
২। ৪০০ বাঁশ খুঁটি এবং ছাউনির নীচে আড়াআড়ি টানা এবং বেড়ার জন্য	=	২০০০
৩। বাঁশের কাঠি ২৮০০০ (৪০০ বাঁশ প্রতি বাঁশে ৭০টি কাঠি)	=	২০০০
৪। উলু ছন, ছন, পাটকাঠি, খড় ইত্যাদি	=	৫০০
৫। নারিকেল দড়ি, সুতলি	=	১০০
৬। মজুরি বা শ্রম দিবস ১০০ @ ৪০ টাকা	=	৪০০০
মোট	=	১০,৬০০

(খ) চাষের খরচ (প্রথম বছর)		
১। জমি তৈরি এবং বরোজ বিন্যাস	=	৫০০
২। পানের কাটিং ২৮০০০	=	২৮০০
৩। সার ঃ		
(ক) সরিষার খইল ২০০ কিলোগ্রাম @ ১০ টাকা প্রতি কিলোগ্রাম	=	২০০০
(খ) উত্তম পচা গোবর ৪০০ কিলোগ্রাম	=	২০০
(গ) কৃষিশক্রর ব্যবস্থাপনা (প্রয়োজন ভিত্তিক)	=	৫০০
(ঘ) কাটিং রোপণ, সার প্রয়োগ, গোড়ায় মাটি তোলা, কাঠিতে লতা জড়িয়ে ওপরে তোলা বাবদ ৯০ শ্রম বিদস @ ৪০ টাকা	=	৩৬০০
মোট	=	৯৬০০

প্রথম বছর মোট খরচ (১০,৬০০ + ৯৬০০) = ২০,০০০

(গ) চাষের খরচ (দ্বিতীয় বছর ও পরবর্তী সময়) ঃ

(অ) বরোজের রক্ষণাবেক্ষণ ঃ

১। পুরানো ছাউনির খড়, ছন এবং বাঁশের খুঁটি প্রয়োজন-ভিত্তিক অপসারণ এবং বরোজ মেরামত বাবদ	=	১০০০
২। বাঁশের কাঠি প্রয়োজনভিত্তিক অপসারণ এবং পাল্টানো বাবদ	=	২০০
৩। মজুরি ২০ শ্রমদিবস @ ৪০ টাকা	=	৮০০
মোট	=	২০০০

(আ) অন্তর্বর্তী পরিচর্যা ও ফসল তোলা ঃ

১। বৈশাখ থেকে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত যত্ন পরিচর্যা, সরিষার খৈইল ২০০ কিলোগ্রাম @ ১০ টাকা প্রতি কিলোগ্রাম	=	২০০০
২। অন্তবর্তী অন্যান্য ফসল এবং কৃষি শত্রুর ব্যবস্থাপনা (প্রয়োজন ভিত্তিক)	=	১০০০
৩। *মজুরি ২ জন কয়েক দিন পর পর, পানের লতা বাইয়ে দেওয়া, অবনমন করা, খইল প্রয়োগ করা, গোড়ায় মাটি দেওয়া এবং ফসল তোলা বাবদ মোট ৩০০ শ্রম দিবস @ ৪০	=	১২০০০
মোট	=	১৫০০০

দ্বিতীয় বছর মোট খরচ (২০০০ + ১৫০০০) = ১৭০০০

* এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন কার্তিক থেকে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত সার প্রয়োগ করা হয় না, শীতের সময় পান কম তোলা হয় তবে প্রয়োজনে বরোজে জল সিঞ্চন করা আবশ্যক।

(ঘ) বরোজের আয় ঃ

প্রতি মাসে লতা প্রতি ৪টি পান তোলা সম্ভব, মাসে পানের ফলন হবে

(২৮০০ × ৪) = ১১২০০০ সংখ্যা পান পাতা।

বাজার দর ১০০০ সংখ্যা পাতার জন্য ৮০ টাকা হিসাবে মূল্য = ৮৯৬০ টাকা।

অর্থাৎ পান বরোজের মাসিক আয় ৮৯৬০ টাকা,

সুতরাং বছরে মোট আয় = (৮৯৬০ × ১২) = ১,০৭৫২০ টাকা।

দুই বছরের গড় খরচ = $\frac{২০২০০ + ১৭০০০}{২}$ = ১৮৬০০ টাকা।

বছরে মোট লাভ = (১০৭৫২০ − ১৮৬০০) = ৮৮৯২০ টাকা।

বাস্তবিক ক্ষেত্রে শীতের মরসুমে পানের ফলন কমে যায় তাই মোট লাভের ৩০% অগ্রিম হিসেবের তারতম্যের জন্য বাদ দিলে বছরে গড়ে লাভ দাঁড়াবে (৮৮৯২০-২৬৬৭৬) = ৬২২৪৪ টাকা অর্থাৎ মাসে গড়ে লাভ হবে ৫১৮৭ টাকা।

পানের বরোজের অর্থনীতিতে লাভ বেশি দেখা গেলেও উপজাতি চাষী ভাই বরোজ পান চাষ করার সময় আশে পাশে বাজারে চাহিদা আছে এবং বরোজ থেকে বাজারের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল এমন স্থান নির্বাচন করা আবশ্যক। বরোজ থেকে নির্দিষ্ট বাজার বারে উপজাতি পরিবার পান তুলে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে নিয়মিত আয় পেতে পারে। এছাড়া পান বরোজের মধ্যে অন্তর্বর্তী সাথী ফসল যেমন শাকসবজী জুমিয়া উপজাতি পরিবার নিজে খাওয়ার জন্য ব্যবহার করতে পারবে। এই ক্ষেত্রে উপজাতি কৃষক ভাই প্রয়োজনে অভিজ্ঞ পানচাষীর শ্রম ব্যবহার করতে পারে, তারজন্য মজুরি অর্থাৎ শ্রম দিবসের হিসাব দেখানো হয়েছে। যদি উপজাতি কৃষক পরিবার নিজে শ্রম দিতে সক্ষম হয় তবে লাভ আরো বেশি হবে এবং উপজাতি পান চাষীর নিয়মিত প্রায় সারা বছরের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে।

▲ আনারস চাষের অর্থনীতি (এলাকা = ০·২৫ হেক্টর)

		প্রথম বছর	দ্বিতীয় বছর	তৃতীয় বছর	চতুর্থ বছর
১। জঙ্গল পরিষ্কার, জমি তৈরি এবং বাগান বিন্যাস	=	১৫০০	—	—	—
২। বাগানের চারপাশে স্থানীয় গাছের খুঁটি এবং বাঁশের বেড়া	=	২০০০	—	—	—
৩। আনারসের তেউড়ের মূল্য @ ১টাকা হিসেবে (মোট তেউড়ের সংখ্যা = ১১১১০)	=	১১১১০	—	—	—
৪। তেউড় রোপণের আগে জৈবসার, রাসায়নিক সার এবং রোপণের খরচ	=	২০০০	—	—	—
৫। স্প্রেয়ার মেসিন, কোদাল, তাক্কাল ইত্যাদি কৃষি যন্ত্রপাতির মূল্য	=	২৫০০	—	—	—
৬। চাপান সার প্রয়োগ এবং ফসল রক্ষণের ব্যবস্থাপনা	=	১০০০	২০০০	২০০০	২০০০
৭। আগাছা নিয়ন্ত্রণ, গোড়ায় মাটি তোলা, ঔষধ এবং হরমোন প্রয়োগ	=	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
৮। বাগান পাহারা এবং অন্যান্য খরচ	=	২০০০	২০০০	২০০০	২০০০
৯। ফসল তোলা এবং বাজার জাতকরণ	=	—	১০০০	১০০০	১০০০
মোট খরচ	=	২৩১১০	৬০০০	৬০০০	৬০০০

চার বছরে মোট খরচ (২৩১১০ + ৬০০০ + ৬০০০ + ৬০০০) = ৪১১১০ টাকা

উৎপাদন		প্রথম বছর	দ্বিতীয় বছর	তৃতীয় বছর	চতুর্থ বছর		মোট
(ক) ফলের সংখ্যা	=	—	৮৮৮৮	৮৫০০	৮০০০	=	২৫৩৮৮
(খ) তেউড়ের সংখ্যা	=	—	১৬২৫০	১৭৫০০	১৬২৫০	=	৫০,০০০

উত্তর ত্রিপুরা এবং ধলাই জেলার উপজাতি আনারস চাষীদের অভিজ্ঞতা তেউড় রোপণের দ্বিতীয় বছরে ৮০ শতাংশ গাছে ফল ধরলেও তৃতীয় এবং চতুর্থ বছরে ফলন কম হয়। অন্যদিকে তেউড়ের সংখ্যা দ্বিতীয় বছর থেকে তৃতীয় বছরে অধিক হয়, কিন্তু চতুর্থ বছর থেকে কমতে শুরু করে।

▲ উৎপাদিত ফসলের মূল্য ঃ

		প্রথম বছর	দ্বিতীয় বছর	তৃতীয় বছর	চতুর্থ বছর		মোট
১। ফল @ ১·৫০ টাকা প্রতিটি	=	—	১৩৩৩২	১২৭৫০	১২০০০	=	৩৮০৮২
২। তেউড় @ ০·৭৫ পয়সা প্রতিটি	=	—	১২১৮৮	১৩১২৫	১২১৮৭	=	৩৭৫০০
মোট আয়	=	—	২৫৫১৯	২৫৮৭৫	২৪১৮৭	=	৭৫৫৮২

আনারস চাষে প্রথম বছর কোনো আয় পাওয়া যায় না, দ্বিতীয় বছর থেকে চতুর্থ বছর পর্যন্ত লাভ হয় (৭৫৫৮২ – ৪১১১০) = ৩৪৪৭২ টাকা

সুতরাং উপজাতি জুমিয়া চাষী ভাই ত্রিপুরার টিলা ভূমি থেকে বৃষ্টিনির্ভর স্বল্পমেয়াদী আনারস চাষ করে চার বছরে গড়ে ৮৬১৮ টাকা ০·২৫ হেক্টর আনারস বাগান থেকে লাভ করতে পারেন। উপজাতি কৃষক ভাইয়েরা এক বার আনারস বাগান করে বহু বছর বাগান রেখে দেয়। ফলে বর্তমানে ফলন কম হয়। ভাল গুণগত মানের উচ্চ ফলন পাওয়ার জন্য পঞ্চম বছর পুরাতন বাগান ভেঙ্গে নূতন বাগান করা শ্রেয়ঃ।

▲ ঝিনুক মাশরুম (মুঁইখুমু) চাষের অর্থনীতি ঃ

(ছোট আকারের মাশরুম ফার্ম (১৫০ কিউব ক্ষমতা, প্রতি বছর ৮ বার ফসল তোলা সম্ভব)

পুনঃ সংঘটিত নয় এমন খরচ ঃ		টাকা
১। মাশরুম ঘর বাঁশ ও পলিথিন, ছন ইত্যাদি দ্বারা তৈরি (৪ × ৫ × ৩ মিটার)	=	১০০০
২। স্টোর ঘর (২ × ২·৫ × ৩ মিটার)	=	৫০০
৩। বাঁশের মাচা তৈরি (ঘরের ভিতর তিন পাশে এবং দরজা বাদ দিয়ে বাকি অংশে স্তরে স্তরে মাঁচা তৈরি করা বাবদ)	=	২০০
৪। নাইলন দড়ি, পলিথিন	=	৭০০
৫। স্প্রেয়ার, বালতি, তাক্কল, কাঠের মোল্ড, খড় কাটার বটি ইত্যাদি	=	২৫০০
মোট	=	৪২০০

উদ্যানজাত ফসল আনারস নিয়ে বাজারের পথে জুমিয়া কৃষক

শূকর পালন

দেশী প্রথায় আখের রস সংগ্রহ

ক্ষয়ক্ষতি জনিত খরচ @ ৫% (ক্রমিক নং ১-৪)	=	১২০
ব্যবহার জনিত ক্ষয়ক্ষতি @ ২% (ক্রমিক নং ৫)	=	৫০
মোট	=	১৭০

পুনঃ সংঘটিত খরচ ঃ

		টাকা
১। সোনালি রঙের আমন ধানের খড় / পরিষ্কার শুকনো কলার অথবা সুপারির খোলা ১৭৫ কিলোগ্রাম @ ১ টাকা প্রতি কিলোগ্রাম (১৭৫ × ৮) = ১৪০০ কিলোগ্রাম	=	১৪০০
২। মাশরুম (মুঁইখুমু) বীজ / স্পনের মূল্য @ ৪ টাকা প্রতি প্যাকেট (২০০ গ্রাম) (১৭৫ × ৪ × ৮)	=	৫৬০০
৩। ঔষধ ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য (প্রয়োজন অনুযায়ী)	=	১০০
৪। মাশরুম ল্যাবরেটরিতে যাতায়াত খরচ	=	৮০০
৫। অন্যান্য খরচ	=	৫০০
মোট	=	৮৪০০

প্রত্যাশিত ফলন @ এক কিলোগ্রাম প্রতি কিউব,
সারা বছরে মোট (১৫০ × ৮) = ১২০০ কিউব = ১২০০ কিলো
বিক্রয় মূল্য স্থানীয় বাজারে @ ৪০ টাকা প্রতি কিলোগ্রাম = ৪৮০০০ টাকা
মোট উৎপাদন খরচ = (১৭০ + ৮৪০০) = ৮৫৭০ টাকা
এক বছরে মোট লাভ = (৪৮০০০ – ৮৫৭০) = ৩৯৪৩০ টাকা
∴ প্রতি মাসে একজন উপজাতি কৃষক মাশরুম চাষের মাধ্যমে গড়ে (৩৯৪৩০÷১২) = ৩২৮৫ টাকা আয় করতে সক্ষম হবে।

▲ কমলা চাষের অর্থনীতি (এলাকা ০·২৫ হেক্টর)

প্রথম বছর ঃ

		পরিমাণ একক / সংখ্যা	মূল্য/একক টাকা	মোট টাকা
১। কমলার চারা	=	১২৫	২·০০	২৫০·০০
২। জৈব সার (গোবর / আবর্জনাসার)	=	১২·৫ কুইন্টাল	৫০·০০	৬২৫·০০
৩। রাসায়নিক সার ঃ				
(ক) ইউরিয়া	=	১৫ কিলোগ্রাম	৩·৯০	৫৮·৫০
(খ) রকফসফেট	=	৩০ কিলোগ্রাম	২·৩৪	৭০·০০
(গ) মিউরিয়েট অব পটাশ	=	১৫ কিলোগ্রাম	৬·৬০	৯৯·০০
৪। ফসল রক্ষণের ঔষধপত্র (প্রয়োজন অনুসারে)	=	—	—	২৫০·০০
৫। মজুরি (শ্রম দিবস)	=	৭৫	৪০.০০	৩০০০·০০
মোট	=			৪০৫২·৫০

দ্বিতীয় বছর ঃ (বাগান রক্ষণাবেক্ষণের খরচ)

১। জৈব সার (গোবর/আবর্জনা সার)	=	৭·৫ কুইন্টাল	৫০·০০	৩৭৫·০০
২। ইউরিয়া	=	৩০ কিলোগ্রাম	৩·৯০	১১৭·০০
৩। রক ফসফেট	=	৫০ কিলোগ্রাম	২·৩৪	১১৭·০০
৪। মিউরিয়েট অব পটাশ	=	৩০ কিলোগ্রাম	৬·৬০	১৯৮·০০
৫। রোগ-পোকার ঔষধ	=	—		২০০·০০
৬। বাগান পরিষ্কার, শূন্যস্থানে চারা রোপণ; অন্তর্বর্তী পরিচর্যা, প্রয়োজনে ঔষধ প্রয়োগ ইত্যাদির জন্য শ্রমদিবস	=	৩৫	৪০·০০	১৪০০·০০
৭। অন্যান্য খরচ	=			১৬০·০০
মোট				**২৫৬৭·০০**

তৃতীয় বছর ঃ

১। জৈব সার (গোবর /আবর্জনা)	=	৭·৫ কুইন্টাল	৫০·০০	৩৭৫·০০
২। ইউরিয়া	=	৪৫ কিলোগ্রাম	৩·৯০	১৭৫·০০
৩। রক ফসফেট	=	৯০ কিলোগ্রাম	২·৩৪	২১০·০০
৪। মিউরিয়েট অব পটাশ	=	৪৫ কিলোগ্রাম	৬·৬০	২৯৭·০০
৫। রোগ-পোকার ঔষধ (প্রয়োজন অনুযায়ী)	=	—	—	২০০·০০
৬। বাগান পরিষ্কার, অন্তর্বর্তী পরিচর্যা প্রয়োজনে ঔষধ প্রয়োগ ইত্যাদির জন্য শ্রমদিবস	=	৩৫	৪০	১৪০০·০০
মোট	=			**২৬৫৭**

চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম বছরে ০.২৫ হেক্টর কমলা বাগান রক্ষণাবেক্ষণে খরচ হবে যথাক্রমে ৩৩০০, ৩৮০০, ৪৪০০ এবং ৫০০০

সপ্তম বছর থেকে কমলা বাগান, রক্ষণাবেক্ষণের খরচ মোটামুটি স্থির থাকে।

মিনি ব্যারেজে মাছ চাষ

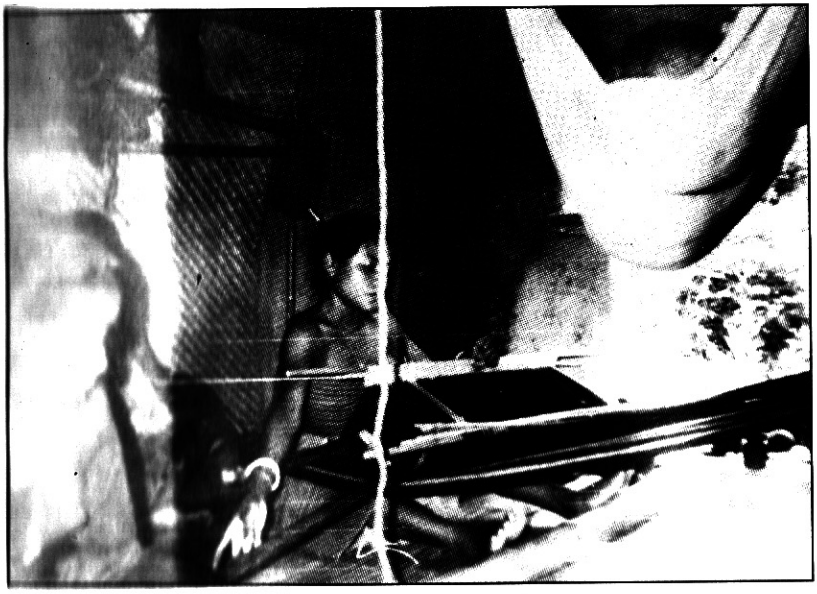

জুমিয়া পরিবারে কোমড় তাঁত

* লাভ-লোকসান হিসাব ঃ

বছর	খরচ	ফলবতী গাছের %	গাছ প্রতি ফলন	০·২৫হেক্টর এলাকার ফলন	প্রতিটি ফলের গড় মূল্য	বছরে মোট আয়	মোট লাভ টাকা
প্রথম বছর	৪৩৫২·৫০	—	—	—	—	—	—
দ্বিতীয় ,,	২৫৬৭·০০	—	—	—	—	—	—
তৃতীয় ,,	২৬৫৭·০০	—	—	—	—	—	—
চতুর্থ ,,	৩৩০০·০০	—	—	—	—	—	—
পঞ্চম ,,	৩৮০০·০০	—	—	—	—	—	—
ষষ্ঠ ,,	৪৪০০·০০	—	—	—	—	—	—
সপ্তম ,,	৫০০০·০০	৫০%	২০০	১২৪০০	১·০০	১২৪০০	৭৪০০
অষ্টম ,,	৫০০০·০০	৬০%	২০০	১৫০০০	১·০০	১৫০০০	১০০০০
নবম ,,	৫০০০·০০	৭৫%	৩০০	২৮১২৫	১·০০	২৮১২৫	২৩১২৫
দশম ,,	৫০০০·০০	৯০%	৩০০	৩৩৭৫০	১·০০	৩৩৭৫০	২৮৭৫০
একাদশ ,,	৫০০০·০০	৯০%	৩৫০	৩৯৩৭৫	১·০০	৩৯৩৭৫	৩৪৩৭৫
দ্বাদশ ,,	৫০০০·০০	৯০%	৩৫০	৩৯৩৭৫	১·০০	৩৯৩৭৫	৩৪৩৭৫
ত্রয়োদশ ,,	৫০০০·০০	৯০%	৩৫০	৩৯৩৭৫	১·০০	৩৯৩৭৫	৩৪৩৭৫
চতুর্দশ ,,	৫০০০·০০	৯০%	৩৫০	৩৯৩৭৫	১·০০	৩৯৩৭৫	৩৪৩৭৫
পঞ্চদশ ,,	৫০০০·০০	৯০%	৩৫০	৩৯৩৭৫	১·০০	৩৯৩৭৫	৩৪৩৭৫

* ত্রিপুরারাজ্যে মহাজনেরা কমলা বাগান উপজাতি কমলা চাষীর কাছ থেকে চুক্তিতে ক্রয় করে এবং ফসল রক্ষণাবেক্ষণ, যোগান থেকে ফল সংগ্রহ করা, বাজার জাত করার কাজ মহাজনেরা করে থাকে তাই এই খরচগুলি দেখানো হয় নাই।

▲ কাঁঠাল বাগান তৈরি ও চাষের অর্থনীতি (এলাকা এক হেক্টর)

(ক) জমি তৈরি ঃ

	শ্রমদিবস	মূল্য/একক টাকা	মোট টাকা
১। নির্বাচিত জমিল জঙ্গল পরিষ্কার	৩০	৪০	১২০০
২। বাগান বিন্যাস (৮মি. × ৮মি.)	৩	৪০	১২০
৩। গর্ত খনন (৫০ সেমি. × ৫০ সেমি × সেমি.) মোট ১৫৬ টি গর্ত	৭	৪০	২৮০
৪। সার প্রয়োগ, মাটি ভর্তি কারা বীজ বপন	৬	৪০	২৪০
৫। কীটনাশক ঔষধপ্রয়োগ এবং প্রতি গর্তে ২টি করে বীজ বপন	১	৪০	৪০

(খ) অন্তর্বর্তী পরিচর্য্যা ঃ

	শ্রমদিবস	মূল্য/একক	মোট টাকা
১। বর্ষাকালে এবং শরৎকালে ২ বার আগাছা নিয়ন্ত্রণে এবং শীতের মরসুমে মালচিং	৬	৪০	২৪০
২। ভাদ্র-আশ্বিন মাসে চাপান সার প্রয়োগ	২	৪০	৮০
৩। বছরে চার পাশে জঙ্গল পরিষ্কার	২০	৪০	৮০০
৪। বাগানের আগুন নিরোধক গণ্ডি এবং পরিদর্শনের রাস্তা তৈরি	৬	৪০	২৪০
৫। প্রয়োজনভিত্তিক কীটনাশক ঔষধ প্রয়োগ	১	৪০	৪০
মোট	৮২	—	৩২৮০

(গ) চাষের সহায়ক সামগ্রী খরচ ঃ

		পরিমাণ	মূল্য/একক	মোট টাকা
১। বীজ	=	৩ কিলোগ্রাম	১০ টাকা	৩০ টাকা
২। সারের মূল্য				
গোবর ২০ কিলোগ্রাম প্রতিগর্তে	=	৩৪ কুইন্টাল	৫০ টাকা	১৭০০ টাকা
ইউরিয়া ১০০ গ্রাম প্রতিগর্তে	=	১৭ কিলোগ্রাম	৩.৯০ প.	৬৭ টাকা
৩। বাঁশের বেড়া/খাঁচা তৈরি	=		৩ টাকা	৫১০ টাকা
৪। প্রয়োজন অনুসারে রোগ পোকার ঔষধ	=	—	—	১০০ টাকা
মোট	=	—	—	২৪০৭ টাকা

▲ পরবর্তী সময়ে কাঁঠাল বাগান রক্ষণাবেক্ষণের খরচ :

	২য় বছর		৩য় বছর		৪র্থ বছর		৫ম বছর		৬ষ্ঠ বছর	
	শ্রম দিবস	টাকা	শ্রমদিবস	টাকা	শ্রমদিবস	টাকা	শ্রমদিবস	টাকা	শ্রমদিবস	টাকা
১ শূন্যস্থানে বীজ বপন	১	৪০	—	—	—	—	—	—	—	—
২ আগাছা নিয়ন্ত্রণ	৮	৩২০	৮	৩২০	৬	২৪০	৬	২৪০	৬	২৪০
৩। শুখা মরসুমে মালচিং	২	৮০	২	৮০	২	৮০	—	—	—	—
৪। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ এবং ভাদ্র-আশ্বিন মাসে চাপান সার প্রয়োগ	১০	৪০০	১০	৪০০	১০	৪০০	১০	৮০০	১০	৪০০
৫। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে আগাছা পরিষ্কার করা বাবদ	২০	৮০০	১৫	৬০০	১৫	৬০০	১৫	৬০০	১৫	৬০০
৬। আশ্বিন--কার্ত্তিক মাসে দ্বিতীয় বার আগাছা বাছাই এবং মালচিং	১৫	৬০০	১২	৪৮০	১২	৪৮০	১২	৪৮০	১২	৪৮০
৭। আগুন নিরোধক গণ্ডী এবং পরিদর্শনের রাস্তা তৈরি	৩	১২০	৩	১২০	৩	১২০	৩	১২০	৩	১২০
৮। বেড়া/খাঁচা মেরামত করা	৫	২০০	৫	২০০	—	—	—	—	—	—
৯। সারের মূল্য	—	৭৮	—	৯৮	—	১১৭	—	১১৭	—	১১৭
১০। প্রয়োজনভিত্তিক রোগ পোকার ঔষধ	—	৫০	—	৫০	—	৫০	—	৫০	—	৫০
১১। সার এবং ঔষধ প্রয়োগ বাবাদ	৩	১২০	৩	১২০	৩	১২০	৩	১২০	৩	১২০
	৬৭	২৮০৮	৫৮	২৪৬৮	৫১	২২০৭	৪৯	২১২৭	৪৯	২১২৭

ত্রিপুরা রাজ্যের জলবায়ু ও মাটিতে সাধারণত সপ্তম বছর থেকে কাঁঠাল গাছের ফলন পাওয়া সম্ভব হয়। সপ্তম, অষ্টম, নবম এবং দশম বছরে গাছ প্রতি ফলন গড়ে ১৫, ২০, ২৫ এবং ৩০টি হিসাবে হেক্টর প্রতি সম্ভাব্য ফলন দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৩৪০, ৩১২০, ৩৯০০ এবং ৪৬৮০ টি কাঁঠাল প্রতিটি কাঁঠালের মূল্য গড়ে ৫ টাকা হিসাবে সপ্তম, অষ্টম, নবম এবং দশম বছরে যথাক্রমে ১১৭০০, ১৫৬০০, ১৯৫০০ এবং ২৩৪০০ টাকা আমদানি করা সম্ভব।

▲ কাজুবাদাম চাষের অর্থনীতি (এক হেক্টর এলাকা)

(ক) বাগানের প্রস্তুতি ও রোপণ ঃ

		শ্রমদিবস	মূল্য/একক	মোট টাকা
১। বনজঙ্গল পরিষ্কার করা বাবদ	=	৩০	৪০	১২০০
২। বাগান বিন্যাস (৭.৫ x ৭.৫ মি)	=	৩	৪০	১২০
৩। গর্তখনন (৫০ সেমি×৫০সেমি×৫০সেমি) মোট ১৭৫টি গর্ত	=	৭	৪০	২৮০
৪। সার পরিবহণ, প্রয়োগ এবং গর্ত ভরাটকরণ	=	৬	৪০	২৪০
৫। গর্তে কীট ও রোগনাশক ঔষধ প্রয়োগ এবং প্রতি গর্তে ৩টি বীজ বপন	=	১	৪০	৪০
৬। গাছের গোড়ার আগাছা পরিষ্কার এবং শুখা মরসুমে মালচিং করা	=	৬	৪০	২৪০
৭। চাপান সার ইউরিয়া প্রয়োগ	=	২	৪০	৮০
৮। সমস্ত বাগানের জঙ্গল পরিষ্কার (ভাদ্রমাসে এবং কার্তিক মাসে দুবার)	=	২০	৪০	৮০০
৯। রোগ পোকার ঔষধ প্রয়োগ	=	১	৪০	৪০
১০। আগুন নিরোধক গণ্ডী এবং বাগান পরিদর্শনের রাস্তা তৈরি	=	৬	৪০	২৪০
মোট	=	৮২	—	৩২৮০

কৃষি সহায়ক সামগ্রীর মূল্য ঃ

		পরিমাণ	মূল্য/একক টাকা	টাকা
১। গোবর / আবর্জনা সার প্রতি গর্তে ১০ কিলোগ্রাম হারে	=	১.৭৫ টন	০.৫০ প্রতিকিলো	৮৭৫
২। ইউরিয়া প্রতি গর্তে ৫০ গ্রাম	=	৮.৭৫ কিলোগ্রাম	৩.৯০ প.	৩৫
৩। রকফসফেট প্রতিগর্তে ৫০০ গ্রাম	=	৮৭.৫ কিলোগ্রাম	২.৩৪ প.	২০৫
৪। মিউরিয়েট অব পটাশ ৫০ গ্রাম	=	৮.৭৫ কিলোগ্রাম	৬.৬০ প.	৫৮
৫। বীজের মূল	=	৫ কিলোগ্রাম	৩০ টাকা	১৫০
৬। প্রতি গর্তের জন্য বাঁশের খাঁচার ব্যবস্থা	=	১৭৫ টি খাঁচা	৩ টাকা	৫২৫
৭। রোগ পোকার ঔষধ প্রয়োগ (প্রয়োজনভিত্তিক)	=	—	—	১৫০
মোট	=	—	—	১৯৯৮

বাগান রক্ষণাবেক্ষণ খরচ ঃ

	দ্বিতীয় বছর		তৃতীয় বছর		চতুর্থ বছর		পঞ্চম বছর	
	শ্রমদিবস	টাকা	শ্রমদিবস	টাকা	শ্রমদিবস	টাকা	শ্রমদিবস	টাকা
১। শূন্যস্থানে বীজ বপন =	১	৪০	১	৪০	—	—	—	—
২। বৈশাখ থেকে কার্তিক মাস পর্যন্ত আগাছা পরিষ্কার এবং এবং শুখা মরসুমে মালচিং =	১০	৪০০	১০	৪০০	১০	৪০০	১০	৪০০
৩। জ্যৈষ্ঠ মাসে জঙ্গল পরিষ্কার =	২০	৮০০	১৫	৬০০	১২	৪৮০	১০	৪০০
৪। ভাদ্র মাসে জঙ্গল পরিষ্কার =	১৫	৬০০	১২	৪৮০	১০	৪০০	৮	৩২০
৫। আগুন নিরোধক গণ্ডী এবং পরিদর্শন রাস্তা সংস্কার =	৩	১২০	৩	১২০	২	৮০	২	৮০
৬। সার ও রোগ পোকার ঔষধ প্রয়োগ =	৮	৩২০	১০	৪০০	১০	৪০০	১০	৪০০
৭। বাঁশের খাঁচা প্রয়োজন ভিত্তিক মেরামত =	৫	২০০	—	—	—	—	—	—
৮। সারের মূল্য =	—	৩০০	—	৪০০	—	৫০০	—	৬০০
৯। রোগ-পোকার ঔষধের মূল্য (প্রয়োজনভিত্তিক) =	১০০	—	১০০	—	১০০	—	১০০	
	৬২	২৮৮০	৫১	২৫৪০	৪৪	২৩৬০	৪০	২৩০০

ষষ্ঠ বছর থেকে কাজু বাদাম বাগানে ফলন শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়ে নবম বছর থেকে গাছ প্রতিফলন গড়ে ২ কিলোমিটার ত্রিপুরার জলবায়ু ও মাটিতে স্থির হয়। এই সময়ে পূর্বের বছরগুলির খরচের সঙ্গে অতিরিক্ত খরচ হিসাবে কাজু বাদাম সংগ্রহের খরচ সংযোগ হয় এবং সর্বমোট হেক্টর প্রতি ৩০০০ টাকা গড়ে খরচ হয়। ফলে কাজু বাদাম বাগান হেক্টর প্রতি ৩৫০ কিলোগ্রাম অপরিশোধিত কাজু বাদামের বাজার দর ৩০ টাকা প্রতি কিলোগ্রাম হিসাবে মোট (৩৫০×৩০) = ১০,৫০০ টাকা আয় হয়। মোট লাভ হয় (১০,৫০০ – ৩০০০) = ৭৫০০ টাকা।

▲ বরাক বাঁশ চাষের অর্থনীতি ঃ (এলাকা এক হেক্টর)

প্রথম বছর		শ্রমদিবস	মূল্য/একক টাকা	মোট টাকা
১। নির্বাচিত জমির জঙ্গল পরিষ্কার	=	৩০	৪০	১২০০
২। বাগান বিন্যাস (৬·০৯ মি. × ৬·০৯ মি)	=	৩	৪০	১২০
৩। গর্তখনন (৬০ সেমি.×৬০ সেমি×৬০ সেমি.)	=	১০	৪০	৪০০
৪। প্রত্যেক গর্তে বরাক বাঁশের করুল রোপণ এবং মাটি উঁচু করে দেওয়া	=	৮	৪০	৩২০

		শ্রমদিবস	মূল্য/একক টাকা	মোট টাকা
৫। বাঁশ করুল পরিবহন খরচ মোট ২৭০ টি	=	—	৫	১৩৫০
৬। বাঁশ করুল পরিবহন খরচ	=	—	—	২০০
৭। রোগ-পোকার ঔষধের মূল্য এবং প্রয়োগ খরচ	=	—	—	১০০
৮। প্রথম দফে আগাছা নিয়ন্ত্রণ	=	১২	৪০	৪৮০
৯। দ্বিতীয় দফে আগাছা নিয়ন্ত্রণ	=	৮	৪০	৩২০
১০। আগুন নিরোধক গণ্ডি এবং বাগান পরিদর্শনের রাস্তা তৈরি	=	৬	৪০	২৪০
মোট	=	৭৭	—	৪৭৩০

❐ **দ্বিতীয় বছর**

		শ্রমদিবস	মূল্য/একক টাকা	মোট টাকা
১। প্রথম দফে আগাছা পরিষ্কার এবং গোড়ায় মাটি দেওয়া	=	১৬	৪০	৬৪০
২। দ্বিতীয় দফে আগাছা পরিষ্কার এবং প্রয়োজনে গোড়ায় মাটি দেওয়া	=	১৪	৪০	৫৬০
৩। আগুন নিরোধক গণ্ডী এবং বাগান পরিদর্শনের রাস্তা সংস্কার	=	৩	৪০	১২০
৪। শূন্যস্থানে নূতন বাঁশ করুল রোপণ (প্রয়োজন অনুযায়ী)	=	—	—	১৫০
মোট	=	৩৩	—	১৪৭০

❐ **তৃতীয় বছর ঃ**

		শ্রমদিবস	মূল্য/একক টাকা	মোট টাকা
১। প্রথম দফে আগাছা পরিষ্কার এবং গোড়ায় মাটি দেওয়া	=	১৬	৪০	৬৪০
২। দ্বিতীয় দফে আগাছা পরিষ্কার এবং গোড়ায় মাটি দেওয়া	=	১৪	৪০	৫৬০
৩। আগুন নিরোধক গণ্ডী এবং বাগান পরিদর্শনের রাস্তা সংস্কার	=	৩	৪০	১২০
মোট	=	৩৩	—	১৩২০

❐ চতুর্থ বছর ঃ

		শ্রমদিবস	মূল্য/একক টাকা	মোট টাকা
১। প্রথম দফে আগাছা পরিষ্কার এবং গোড়ায় মাটি দেওয়া	=	১২	৪০	৪৮০
২। দ্বিতীয় দফে আগাছা পরিষ্কার এবং গোড়ায় মাটি দেওয়া	=	১০	৪০	৪০০
৩। আগুন নিরোধক গণ্ডী এবং বাগান পরিদর্শনের রাস্তা সংস্কার	=	২	৪০	৮০
মোট	=	২৪	—	৯৬০

❐ পঞ্চম বছর ঃ

		শ্রমদিবস	মূল্য/একক টাকা	মোট টাকা
১। একবার আগাছা পরিষ্কার এবং গোড়ায় মাটি দেওয়া	=	১০	৪০	৪০০
২। আগুন নিরোধক গণ্ডী এবং বাগান পরিদর্শনের রাস্তা সংস্কার	=	২	৪০	৮০
মোট	=	১২	—	৪৮০

এক হেক্টর বাঁশ বাগানে ২৭০ টি ঝাড় থেকে গড়ে তৃতীয় বছরে ৮১০, চতুর্থ বছরে ১৩৫০ এবং পঞ্চম বছরে ২১৬০ টি বাঁশ পাওয়া সম্ভব। প্রতিটি বাঁশের মূল্য গড়ে ১০টাকা হিসাবে তৃতীয় বছরে ৮১০০ টাকা, চতুর্থ বছরে ১৩৫০০ টাকা এবং পঞ্চম বছরে ২১৬০০ টাকা আয় পাওয়া সম্ভব হলেও লাভ হয় যথাক্রমে তৃতীয় বছরে ৬৭০০ টাকা, চতুর্থ বছরে ১২৫৪০ টাকা এবং পঞ্চম বছরে ২১১২০ টাকা।

বছর	খরচ	হেক্টর প্রতি বাঁশের সংখ্যা	বছরে মোট আয়	মোট লাভ (টাকা)
প্রথম	৪৭৩০	—	—	—
দ্বিতীয়	১৪৭০	—	—	—
তৃতীয়	১৩২০	৮১০	৮১০০	৬৭৮০
চতুর্থ	৯৬০	১৩৫০	১৩৫০০	১২৫৪০
পঞ্চম	৪৮০	২১৬০	২১৬০০	২১১২০

▲ মুরগী পালনের অর্থনীতি (২৫টি মুরগী ডিমের জন্য)

খরচ		টাকা
১। তিন মাস বয়সের ২৭* টি মুরগী @ ২০ টাকা প্রতিটির মূল্য	=	৫৪০
২। মুরগীর ঘর তৈরি বাবদ খরচ	=	৮০০
৩। আংশিক খাদ্য তিন মাসের জন্য @ ৬ কিলোগ্রাম প্রতি মুরগীর জন্য, এক কিলোগ্রাম খাদ্যের মূল্য ৫ টাকা হিসাবে ২৬* টি মুরগীর জন্য মোট খরচ	=	৭৮০
৪। আংশিক খাদ্য ১৩ মাসের জন্য @ ২০ কিলোগ্রাম প্রতি মুরগীর জন্য, মোট ২৫টি মুরগীর জন্য মোট খরচ	=	২৫০০
৫। ঔষধ ও অন্যান্য খরচ ৫ টাকা প্রতি মুরগীর জন্য, মোট ২৫টি মুরগীর জন্য মোট খরচ	=	১২৫
সর্বমোট খরচ	=	৪৭৪৫

(* একটি মুরগী প্রথম তিনমাসের মধ্যে এবং একটি ডিম দেওয়া শুরু করার পর মারা যাবে এমন হিসাবে)

আয় ঃ		টাকা
১। প্রতি বছর একটি মুরগী গড়ে ১৮০ টি ডিম পাড়বে হিসাবে মোট ডিমের সংখ্যা ৪৫০০ @ ১.৫০ পয়সা প্রতি ডিমের জন্য হিসাবে মোট আয়	=	৬৭৫০
২। এক বছর ডিম দেওয়ার পর মুরগীগুলি বাজারে বিক্রি করে দিলে প্রতিটি ৪২টাকা হিসাবে মোট আয়	=	১০৫০
সর্বমোট আয়	=	৭৮০০

মোট আয়ের ১০% অগ্রিম হিসাবের তারতম্যের জন্য বাদ দিলে
মোট আয় দাঁড়াবে (৭৮০০-৭৮০) = ৭০২০ টাকা
সুতরাং, উপজাতি জুমিয়া পরিবার ১৫ মাস পরে মুরগী পালনের মাধ্যমে মোট (৭০২০-৪৭৪৫) = ২২৭৫ টাকা লাভ করতে সক্ষম হবে।

▲ ছাগল পালনের অর্থনীত (৫টি ছাগী এবং ১টি পাঁঠা) ঃ

খরচ ঃ		টাকা
(ক) পুনঃ সংঘটিত নয় এমন খরচ ঃ		
১। এক বছর বয়স্ক ৫টি ছাগী এবং একটি পাঁঠার মূল্য (পরিবহণ খরচ সহ)	=	৬০০০
২। ছাগলের ঘর তৈরি স্থানীয় বাঁশ, ছন ইত্যাদির ব্যবহার করে	=	৮০০
পুনঃ সংঘটিত নয় এমন মোট খরচ	=	৬৮০০

(খ) পুনঃসংঘটিত খরচ (পাঁচ বছরের জন্য) ঃ

		প্রথম বছর	দ্বিতীয় বছর	তৃতীয় বছর	চতুর্থ বছর	পঞ্চম বছর		মোট
১। ঔষধ পত্রের খরচ	=	১০০	১২৫	১৫০	১৫০	১৫০	=	৬৭৫
২। জল দেওয়ার পাত্র এবং দড়ি ইত্যাদি বাবদ	=	৩০০	২০০	২০০	২০০	২০০	=	১১০০
৩। ঘর মেরামত	=	—	১০০	২০০	৩০০	৩০০	=	৯০০
মোট খরচ	=	৪০০	৪২৫	৫৫০	৬৫০	৬৫০	=	২৬৭৫
আয় ঃ								
১। বার থেকে চৌদ্দ মাস বয়সের পাঁঠা বিক্রি প্রতিটির @ ৫০০ টাকা	=	—	২০০০	৩৫০০	৫৫০০	৬০০০	=	১৭০০০
২। দশ মাস বয়সের পাঁঠা বিক্রি প্রতিটি @ ৪০০ টাকা	=	—	—	—	—	৩৬০০	=	৩৬০০
৩। বার থেকে পনের মাস বয়সের ছাগী বিক্রি প্রতিটি @ ৪০০ টাকা	=	—	—	—	—	৮০০	=	৮০০
৪। দুই বছরের অধিক বয়সের অন্যান্য ছাগী বিক্রি প্রতিটি @ ৪০০ টাকা	=	—	—	—	—	৮৫৫০	=	৮৫৫০
মোট আয়	=	—	২০০০	৩৫০০	৫৫০০	১৮৯৫০	=	২৯৯৫০

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন একটি ছাগী ৭-৮ মাস বয়সে গর্ভধারণ করতে সক্ষম এবং ১৫১ দিন গর্ভাবস্থায় থাকার পর বাচ্চা দেয়। আনুমানিক ৬০ শতাংশ ছাগী প্রতিবার ২টি ছাগল ছানা এবং ৪০ শতাংশ ছাগী গড়ে ১টি ছাগল ছানা জন্মদেবে। ছাগল ছানার মৃত্যুর হার ১২·৫ শতাংশ। প্রতি দুটি ছাগল ছানার মধ্যে একটি পাঁঠা এবং একটি ছাগী জন্মাবে আশা করে হিসাব দেখান হয়েছে।

▲ লাভ লোকসান হিসাব ঃ

		প্রথম বছর	দ্বিতীয় বছর	তৃতীয় বছর	চতুর্থ বছর	পঞ্চম বছর		মোট
মোট আয়	=	—	২০০০	৩৫০০	৫৫০০	১৮৯৫০	=	২৯৯৫০
মোট খরচ	=	৭২০০	৪২৫	৫৫০	৬৫০	৬৫০	=	৯৪৭৫
		(–)৭২০০	(-)৫৬২৫	(-)২৬৭৫(+)	২১৭৫(+)	২০৪৭৫	=	২০৪৭৫

উপরোক্ত হিসাব মতে প্রথম তিন বছর ছাগল পালনে লাভ দেখা না গেলেও চতুর্থ এবং পঞ্চম বছরে যথাক্রমে ২১৭৫ টাকা এবং ২০৪৭৫ টাকা লাভ উপজাতি জুমিয়া পরিবার করতে সক্ষম হবে।

▲ প্রজনন এবং মেদযুক্ত শূকর পালনের অর্থনীতি ঃ

পুনঃ সংঘটিত নয় এমন খরচ ঃ

১। তিন চার মাস বয়সের ২টি শূকরের মূল্য @ ২০০০ টাকা হিসাবে	=	৪০০০
২। পরিবহণ খরচ	=	২০০
৩। শূকরের খাদ্য দেওয়ার পাত্র	=	২০০
৪। শূকরের আস্তানা/ঘর তৈরি স্থানীয় বাঁশ, গাছ, ছন ইত্যাদি ব্যবহার করে (১২টি শূকরের জন্য)	=	৮০০
মোট	=	৫২০০

পুনঃ সংঘটিত খরচ ঃ

❒ প্রথম বছর

১। দুটি প্রজননক্ষম শূকরের বারো মাস সময় প্রতিদিন আংশিক ঘনীভূত খাদ্য ০.৭৫ কিলোগ্রাম হিসাবে মোট ৫৪৭ কিলোগ্রাম খাদ্য, প্রতি কিলোগ্রাম ৪·৫০ টাকা হিসাবে	=	২৪৬০
২। দশটি শূকর ছানার ৩-৪ মাস বয়স পর্য্যন্ত ০·৭৫ কিলোগ্রাম ঘনীভূত খাদ্য হিসাবে মোট ৭৫০ কিলোগ্রাম খাদ্য প্রতি কিলোগ্রাম ৪·৫০ টাকা হিসাবে	=	৩৩৬৫
মোট	=	৫৮৩৫

প্রকল্প অনুযায়ী কর্মসূচী ঃ

সময়		কার্যক্রম
প্রথম মাস	—	প্রজননক্ষম দুটি শূকর সংগ্রহ
পঞ্চম / ষষ্ঠমাস	—	প্রথম বিয়ানে ১০টি বাচ্চা
এগার / বারো মাস	—	দ্বিতীয় বিয়ানে ১০টি বাচ্চা (প্রথম বিয়ানের বাচ্চা বিক্রি)
সতের / আঠার মাস	—	তৃতীয় বিয়ানে ১০টি বাচ্চা (দ্বিতীয় বিয়ানের বাচ্চা বিক্রি)
তেইশ/চব্বিশ মাস	—	চতুর্থ বিয়ানে ১০টি বাচ্চা (তৃতীয় বিয়ানের বাচ্চা বিক্রি)

প্রথম বছরের আমদানি ঃ

প্রতিটি শূকরের বাচ্চার ওজন গড়ে ৭৫ কিলোগ্রাম, ৯ টি বাচ্চার বিক্রি মূল্য প্রতি কিলোগ্রাম ২১ টাকা হিসেবে (১০ শতাংশ অর্থাৎ একটি শূকরের বাচ্চা মারা যাবে ধরা হয়।) = ১৪১৭৫

পুনঃ সংঘটিত খরচ ঃ

❐ **দ্বিতীয় বছর**

১। দুটি প্রজননক্ষম শূকরের বারো মাস সময় প্রতিদিন আংশিক ঘনীভূত খাদ্য ০·৭৫ কিলোগ্রাম হিসেবে মোট ৫৪৭ কিলোগ্রাম খাদ্য প্রতি কিলোগ্রাম ৪·৫০ টাকা হিসেবে ।	=	২৪৬০
২। ২০টি শূকর ছানার ৫-৬ মাস বয়স পর্যন্ত প্রতিদিন ০·৭৫ কিলোগ্রাম ঘনীভূত খাদ্য প্রতি ছানা পিছু হিসাবে মোট ১৫০০ কিলোগ্রাম, প্রতি কিলোগ্রাম ৪·৫০ টাকা হিসেবে মোট	=	৬৭৫০
মোট	=	**৯২১০**

দ্বিতীয় বছরের আমদানি ঃ

প্রতিটি শূকরে ওজন গড়ে ৭৫ কিলোগ্রাম		
১৮টি বাচ্চার (১০% মৃত্যু হার হিসাবে)		
প্রতিটি কিলোগ্রাম ২১ টাকা হিসাবে	=	২৮৩৫০

তৃতীয় বছর এবং পরবর্তী বছরগুলিতে দ্বিতীয় বছরের অণুরূপ আমদানি আশা করা যায়।

লাভ-লোকসান হিসাব ঃ

	প্রথম বছর	দ্বিতীয় বছর	তৃতীয় বছর
মোট আয় =	১৪১৭৫	২৮৩৫০	২৮৩৫০
মোট খরচ =	১১০৩৫	৯২১০	৯২১০
লাভ =	৩১৪০	১৯১৪০	১৯১৪০

উপরোক্ত শূকর পালন প্রকল্পের মাধ্যমে উপজাতি জুমিয়া পরিবার নিজ শ্রম প্রয়োগ করে প্রথম বছর ৩১৪০ টাকা, দ্বিতীয় বছর ১৯১৪০ টাকা এবং তৃতীয় ও পরবর্তী বছর গুলিতে দ্বিতীয় বছরের অনুরূপ লাভবান হতে সক্ষম হবে।

▲ মিনি ব্যারেজে মাছ চাষের অর্থনীতি (এক একর জলাশয়) ঃ

পুনঃ সংঘটিত নয় এমন খরচ ঃ		**টাকা**
১। লুঙ্গাজমির সংস্কার এবং বাঁধ তৈরী	=	১০,০০০
২। ব্যারেজের তিনপাশে নালা তৈরি বাবদ	=	২.০০০
মোট	=	১২০০০

পুনঃ সংঘটিত খরচ ঃ		**টাকা**
১। কলিচুন ৪০০ কিলোগ্রাম প্রতি কিলোগ্রাম		
৫ টাকা হিসাবে	=	২০০০
২। গোবর/ছাগললেদা/শূকরের মল		
৩টন, প্রতি টন ৫০০ টাকা হিসাবে	=	১৫০০
৩। রাসায়নিক সার ঃ		
(ক) ইউরিয়া ৫০ কিলোগ্রাম @৩.৯০ টাকা প্রতি কিলোগ্রাম	=	১৯৫
(খ) সিঙ্গেল সুপার ফসফেট ৭৫ কিলোগ্রাম @ ৩.৯৭ টাকা প্রতি কিলোগ্রাম	=	২৯৮
৪। মাছের চারা পোনা ২০০০ প্রতি হাজার @ ১০০০ টাকা হিসাবে	=	২০০০

৫। মাছের খাদ্য চাউলের ভূষি, কুড়া এবং সরিষার খৈইল ১ ঃ ১ অনুপাতে মিশ্রন ১০০০ কিলোগ্রাম প্রতি কিলোগ্রাম ৫ টাকা হিসাবে	=	৫০০০
৬। আনুষঙ্গিক জনিত খরচ @৫% পুনঃ সংঘটিত নয় এমন খরচের ওপর হিসাবে	=	৬০০
৭। অন্যান্য খরচ	=	২০০
মোট	=	১১৭৯৩

উপরোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হলে এক একর জলাশয় থেকে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় গড়ে ১০০০ কিলোগ্রোম মাছ প্রতি বছর উৎপাদন করা সম্ভব। কিন্তু উৎপাদন ২০% কম ধরা হলেও এক একর জলাশয় থেকে ৮০০ কিলোগ্রাম মাছ বছরে পাওয়া যাবে। বাজারে মাছের দাম ৫০-৭০ টাকা প্রতি কিলোগ্রাম ওঠানামা করলেও জেলেরা মাছ চাষীর খামারে এসে মাছ ধরে নিয়ে যায়। তাই গড়ে প্রতিকিলোগ্রাম মাছ ৩০-৩৫ টাকা হিসাবে পাইকারী দরে বিক্রি করতে বাধ্য হয়।

সুতরাং এক একর জলাশয়ে উৎপাদিত মাছের মূল্য প্রতি বছর গড়ে হবে ৮০০× ৩০ = ২৪,০০০ টাকা।

লাভ লোকসান হিসাব ঃ

		প্রথম বছর	দ্বিতীয় বছর	তৃতীয় বছর
মোট আয়	=	২৪০০০	২৪০০০	২৪০০০
মোট খরচ	=	২৩৭৯৩	১১৭৯৩	১১৭৯৩
লাভ	=	২০৭	১২২০৭	১২২০৯

উপরোক্ত পদ্ধতিতে মিনি ব্যারেজ তৈরি করে মাছ চাষ করা হলে জুমিয়া উপজাতি পরিবারগুলি প্রথম বছরে ২০৭ টাকা, এবং দ্বিতীয় বছর থেকে ১২২০৭ টাকা আয় করে লাভবান হবে। অন্যদিকে মিনি ব্যারেজ প্রত্যন্ত অঞ্চলে লুঙ্গা জমির সদ্ ব্যবহার এবং জল সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

s **রেশম চাষের অর্থনীতি (এলাকা এক কানি = ১৬০০ বর্গমিটার)ঃ**

p **প্রথম বছর ঃ**

তুঁত চাষের খরচের হিসাব ঃ

পুনঃ সংঘটিত নয় এমন খরচ ঃ

১। বনজঙ্গল পরিষ্কার ও জমি তৈরি ৫ জন @ ৪০ টাকা	=	২০০ টাকা

২। সারের মূল্য ঃ			
(ক) গোবর / আবর্জনা সার ১২·৫ কুইন্টাল @ ৫০ টাকা কুইন্টাল	=	৬২৫	
(খ) রক ফসফেট ৬০ কিলোগ্রাম @ ২·৩৪ প./কেজি	=	১৪০	
৩। বীচন / চারার মূল্য	=	৫০০	
৪। বীচন রোপণ ৮ জন শ্রমিক @ ৪০ টাকা	=	৩২০	
মোট	=	**১৭৮৫**	**টাকা**

প্রথম বছর তুঁত চাষ করা হলে প্রায় ২০ বছর পর নূতন ভাবে চাষ করার প্রয়োজন হয়। তাই ৫% হারে প্রতি বছর খরচ হিসাব করা হলে ৮৯·২৫ প. অর্থাৎ প্রায় ৯০ টাকা।

প্রথম বছর তুঁত ক্ষেতের পরিচর্যা ঃ

১। আগাছা নিয়ন্ত্রণ, কোদাল দেওয়া, রোগ-পোকার ব্যবস্থাপনা, গাছ ছাঁটা, পাতা সংগ্রহ করা ইত্যাদি ১২ জন শ্রমিক @ ৪০ টাকা	=	৪৮০	
২। সার প্রয়োগ ৩জন শ্রমিক @ ৪০ টাকা	=	১৬০	
৩। শুখা মরসুমে মালচিং ; ফায়ার লাইন ইত্যাদি ২জন	=	৮০	
৪। **সারের মূল্য ঃ**			
(ক) ইউরিয়া ৫০ কিলোগ্রাম @ ৩·৯০ প./কেজি	=	১৯৫	
(খ) মিউরিয়েট অব পটাশ ২০ কিলোগ্রাম @ ৬.৬০ প./কেজি	=	১৩২	
মোট	=	**১০৪৭**	**টাকা**

পলুপালনের খরচ ঃ

পুনঃ সংঘটিত নয় এমন খরচ		**টাকা**
১। পলু লালনপালনের জন্য মাটির দেওয়াল ও ছনের ছাউনি দেওয়া পালন ঘর নির্মাণ (৮মি.×৩মি.×৩মি.)	=	৫০০০
২। পলু পালনের জন্য বাঁশের ডালা ৩০টি @ ১০ টাকা	=	৩০০

৩। ডালা রাখার জন্য বাঁশের তাক ৩টি @ ১৫ টাকা	=	৪৫
৪। গুটি বাঁধার ডালা বা চন্দ্রকী ১০টি @ ১০ টাকা	=	২০০
৫। হাইগ্রোমিটার ১টি	=	৮০
৬। পলু সরানোর জন্য নাইলন জাল	=	৫০
৭। তুঁত পাতা কুচানোর যন্ত্রপাতি	=	২৫০
৮। বাঁশের ঝুড়ি ২টি	=	২০
মোট	=	৬৩৫৫

পলু পালনের সরঞ্জাম ৫ বছর পর মেরামতি এবং পাল্টানো প্রয়োজন হবে এমন হিসাবে ক্ষয়ক্ষতিজনিত খরচ @ ২০% = ১২৭১ টাকা।

পুনঃ সংঘটিত খরচ ঃ

১। রেশম মথের ডিমের মূল্য, প্রথম বছর তিন বারে মোট	=	৭৫ টাকা
২। বছরে তিনবার পলু পালনের জন্য মোট ৩৬ জন শ্রমিক @ ৪০ টাকা	=	১৪৪০ টাকা
মোট	=	**১৫১৫ টাকা**

সুতরাং প্রথম বছর রেশম চাষে মোট খরচ
= (৯০ + ১০৪৭ + ১২৭১ + ১৫১৫ টাকা) = ৩৯২৩ টাকা।

প্রতি বছর তিনবার চাষে মোট ১০০ কিলোগ্রাম গুটি কানি প্রতি উৎপন্ন হয়। প্রতি কিলোগ্রাম গুটি বিভিন্ন গ্রেডে (এ = ৯০ টাকা, বি = ৬০ টাকা, সি = ২০ টাকা) বিক্রি করা সম্ভব এবং গড়ে ৫৬ টাকা হিসাবে মোট আয় = (১০০ × ৫৬) = ৫৬০০ টাকা।

সুতরাং গড়ে প্রতি বছরে রেশম চাষে মোট লাভ = (৫৬০০ - ৩৯২৩) = ১৬৭৭ টাকা।

তৃতীয় বছর ঃ

তুঁত ক্ষেতের পরিচর্যা ঃ

১। আগাছা নিয়ন্ত্রণ কোদাল দেওয়া, রোগ-পোকার ব্যবস্থাপনা, গাছ ছাঁটাই, পাতা সংগ্রহ করা ইত্যাদি ১২ জন শ্রমিক @ ৪০ টাকা।	=	৪৮০
২। **সারের মূল্য ঃ**		
(ক) গোবর/আবর্জনা সার - ১২.৫ কুইন্টাল	=	৬২৫

(খ) ইউরিয়া ৫০ কিলোগ্রাম	=	১৯৫
(গ) রক ফসফেট ৬০ কিলোগ্রাম	=	১৪০
(ঘ) মিউরিয়েট অব পটাশ ২০ কিলোগ্রাম	=	১৩২
৩। সার প্রয়োগ ৪ জন শ্রমিক	=	১৬০
৪। শুখা মরসুমে মালচিং, ফায়ার লাইন করা ৬জন শ্রমিক	=	২৪০
মোট	=	১৪৯২ টাকা

৪ পলু পালনের খরচ ঃ

১। রেশম মথের ডিমের মূল্য (পাঁচ বারের মোট খরচ)	=	১২৫
২। বছরে পাঁচ বার পলু পালনের জন্য মোট ৬০ জন শ্রমিক	=	২৪০০
৩। ফরম্যালিন ও অন্যান্য খরচ	=	২০০
মোট	=	২৭২৫ টাকা

সুতরাং রেশম চাষে দ্বিতীয় বছরে মোট খরচ = (৯০ + ১৪৯২ + ১২৫ + ২৭২৫ টাকা) = ৫৫৭৮ টাকা

দ্বিতীয় বছর গড়ে মোট ২৫০ কিলোগ্রাম গুটি কানি প্রতি ৩০ কুইন্টাল তুঁত থেকে উৎপন্ন হয়। প্রতি কিলোগ্রাম গুটির মূল্য গড়ে @ ৫৬ টাকা হিসাবে আয় = (২৫০×৫৬) টাকা = ১৪,০০০ টাকা

∴ দ্বিতীয় বছর মোট লাভ = (১৪০০০-৫৫৭৮) টাকা

= ৮৪২২ টাকা

জুমিয়া কৃষক ভাই নিজ শ্রম এবং পরিবারের মহিলাদের শ্রম ব্যবহার করলে লাভবান হবেন এবং সারাবছর কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে। এক বছর তুঁত চা হলে এবং ঠিক মত যত্ন পরিচর্যায় ২০ বছর গাছ রাখা চলে এবং রেশম লাভ জনক চাষ করা সম্ভব।